দুনিয়াজোড়া

বিস্ময়কর সফর

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

Contents

আমার দেখা পৃথিবী-৫

দুনিয়াজোড়া বিস্ময়কর সফর

[স্পেন, ব্রুনাই, তুরস্ক, রি ইউনিয়ন, দক্ষিণ আফ্রিকা, কাতার, হল্যান্ড, কানাডা, আমেরিকা,ওয়েষ্টইন্ডিজ, সৌদী আরব ও কেনিয়ার বিস্ময়কর সফরনামা]

মূল

শাইখুল ইসলাম মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন, দাঈ, বহু কালজয়ী গ্রন্থের রচয়ীতা

ভাইস প্রেসিডেন্ট : ইসলামী ফিকহ্ একাডেমী, জেদ্দা, সৌদী আরব

শাইখুল হাদীস ও নায়েবে মুহতামিম : দারুল উলূম, করাচী

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

ইমাম ও খতীব : আহালিয়া জামে মসজিদ, উত্তরা, ঢাকা

মুহাদ্দিস, টঙ্গি দারুল উলূম মাদরাসা

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন—

فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ

অর্থ ঃ তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ কর, অতঃপর দেখ যে, মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে। (নাহল ঃ ৩৬)

বর্তমান যুগের পর্যটকদের মতো কেবলমাত্র বিনোদনের উদ্দেশ্যে আল্লাহওয়ালা কোন বুযুর্গ পৃথিবী ভ্রমণ করেননি। বরং তারা ইলমে দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদান, দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও জিহাদের জন্য পৃথিবীতে সফর করে উপরোক্ত আয়াতের উপর আমল করার প্রয়াস পেয়েছেন।

ঐ একই ধারাবাহিকতায় বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ আলেম শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (দামাত বারাকাতুহুম) বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ইসলামী সেমিনার, সভা ও মাহফিলে যোগদানের উদ্দেশ্যে প্রায় অর্ধশতাধিক দেশের অসংখ্য শহরে উপস্থিত হয়ে পথহারা মানুষকে দিয়েছেন পথের দিশা। এই নব্য জাহেলী যুগ—সৃষ্ট অনেক জটিল সমস্যার ইসলামী সমাধান পেশ করে মানবতাকে সিরাতে মুস্তাকীমের রাহনুমায়ী করেছেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখেছেন—

“বিগত প্রায় বিশ বছর যাবত আমি ঠিকানাবিহীন পত্রের ন্যায় সফর করে চলছি। এ সকল সফরে অসংখ্য দেশ ও শহরের মাটি পায়ে লাগিয়েছি। তন্মধ্যে যে সকল সফরে উল্লেখযোগ্য জ্ঞানার্জন হয়েছে অথবা এ সুবাদে ইসলামী ইতিহাসের হারানো কোন অধ্যায় উল্টিয়ে দেখার সুযোগ হয়েছে, তার বিবরণ ‘সফরনামা’ রূপে লিপিবদ্ধ করেছি। যার প্রথম খণ্ড বিশটি দেশের সফরনামা "جهان ديده" নামে প্রকাশিত হয়েছে এবং আমার

ধারণাতীত পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছে। এরপরও আমার সফরের ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং এখনো সফরেই আছি। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পরও আমার অনেক দেশ সফর করা হয়েছে সেগুলোর বিবরণও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বন্ধুদের দাবী হলো جهان ديده –এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করা হোক।

বর্তমানে আপনাদের হাতে যে কিতাব دنیا میرے آگے তা মূলতঃ বন্ধুদের সে দাবীরই বাস্তবায়ন। দু'আ করি আল্লাহ পাক এই কিতাবকে পাঠকদের জন্য উপকারী বানান। আমীন।"

হযরতের বর্তমান সফরনামাটিও বিশটি দেশের সফরের কাহিনী সমন্বয়ে রচিত। বর্তমান সফরনামাটি পূর্বোক্ত সফরনামার চেয়েও আকর্ষণীয়। কারণ এ গ্রন্থে উত্তরমেরু সহ বেশ কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দেশের সফরকাহিনী এবং সেখানের বিরল, বিচিত্র ও বিস্ময়কর অবস্থা ও ঘটনার বিবরণ এসেছে যা পাঠ করে পাঠকমাত্রই পুলকিত ও বিস্মিত হয়ে আল্লাহ পাকের অপূর্ব কুদরতের স্বীকৃতি স্বরূপ বলে উঠবেন 'সুবহানাল্লাহ'। আমরা আমাদের পাঠকদের সুবিধার কথা চিন্তা করে এই কিতাবটিকেও দুই খণ্ডে প্রকাশ করছি। 'দুনিয়াজোড়া বিস্ময়কর সফর' নামক বর্তমান খণ্ডে স্পেন, ব্রুনাই, তুরস্ক, রি ইউনিয়ন, দক্ষিণ আফ্রিকা, কাতার, হল্যাণ্ড, কানাডা, আমেরিকা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, সৌদী আরব ও কেনিয়া ইত্যাদি দেশের সফরনামা বিবৃত হয়েছে।

আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী কিতাবটি ত্রুটিমুক্ত ও সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তারপরও ভুল–ত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। বিশেষতঃ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জায়গা, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। এ ধরনের ত্রুটি যদি কারো দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে তা আমাদেরকে অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দিবো ইনশাআল্লাহ।

বইটির প্রকাশনার ক্ষেত্রে যারা আমাদেরকে বিভিন্নভাবে

সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ পাক তাদের সবাইকে জাযায়ে খায়র দান করুন। আমীন।

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে দু'জনের শুকরিয়া আদায় করছি যাদের অবদান কোনভাবেই প্রতিদানযোগ্য নয়। তাদের একজন হলেন আমার শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী জনাব ইঞ্জিনিয়ার আসাদুজ্জামান ছাহেব আর অপরজন হলেন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জনাব আমানত ছাহেব। আল্লাহ পাক তাঁর দ্বীনের জন্য তাদেরকে কবুল করুন, আমীন।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করুন। আমীন।

বিনীত—
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা--১১০০

১৭ই জিলকদ ১৪২৬হিজরী
২০শে ডিসেম্বর ২০০৫ ঈসায়ী

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের মেহেরবানীতে ইতিপূর্বে শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেব (দা.বা.)এর ভ্রমণ কাহিনী সম্বলিত প্রথম গ্রন্থ 'জাহানে দিদাহ' তরজমা করার তাওফীক লাভ করি। আলহামদুলিল্লাহ, সে তরজমা খুব অল্প সময়ে পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে এবং সব মহলে ধারণাতীত সমাদৃত হয়। অনেকেই এজন্য সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং দু'আ দেন। উৎসাহ যোগান। তাদের দু'আ ও উৎসাহকে সম্বল করে পরবর্তীতে আরো কয়েকটি বই তরজমা করার তাওফীক লাভ হয়। সেই ধারাবাহিকতায় আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে এবার হযরত শাইখুল ইসলাম (দা.বা.)এর ভ্রমণ কাহিনীর দ্বিতীয় খণ্ড 'দুনিয়া মেরে আগে'–এর তরজমার প্রথম অংশ 'দুনিয়াজোড়া বিস্ময়কর সফর' নামে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ!

বিদগ্ধ লেখক এ সমস্ত ভ্রমণকালে তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি দ্বারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের উন্নতি ও প্রাচুর্যের জোয়ার যেমন অবলোকন করেন, তেমনি আখেরাত বিস্মৃতি ও বল্গাহীন বিষয়–আসক্তির ফলে তাদের বিরামহীন অস্থির জীবন, অবাধ যৌনাচারের কষাঘাতে বিধ্বস্ত মানবতার কংকালসার চেহারা, অশান্ত হৃদয়ের আর্তচিৎকার এবং এ সব থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য তার ব্যাকুলতা ও দিবালোকের ন্যায় প্রত্যক্ষ করেন এবং এর প্রতিকার স্বরূপ তিনি উম্মতের একজন একনিষ্ঠ 'মুসলিহ' হিসাবে ইসলাম প্রদত্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক সঞ্জীবনী সুধা ঐ সমস্ত পিপাসার্ত মানবতার সামনে বিভিন্ন সভা–সমাবেশ, মতবিনিময় আসর, ঘরোয়া আলোচনা ও ব্যক্তিগত সাক্ষাতে উদারভাবে পরিবেশন করেন, তুলে ধরেন তাদের সামনে সুস্থ ও সুখময় জীবনের সঠিক দিক নির্দেশনা।

লেখক ভ্রমণ কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে সে সব বৃত্তান্ত তুলে ধরেছেন। সাথে সাথে সে সমস্ত দেশের শিক্ষা–সংস্কৃতি ও নৈসর্গিক বিবরণ এবং ভ্রমণকালীন তাঁর বিচিত্র ও ব্যতিক্রমধর্মী

অভিজ্ঞতা—যেমন, সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ, সাগরের তলদেশ ও উত্তর মেরু ভ্রমণ, উত্তরে পৃথিবীর সর্বশেষ স্থলভাগে আযান দিয়ে দুপুর রাতে সূর্য সামনে নিয়ে নামায আদায় করা ইত্যাদি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার বিবরণ এবং শিকড় সন্ধানী ঐতিহাসিকের ন্যায় ইতিহাস-ঐতিহ্যের মণিমুক্তা দ্বারা তাঁর এ ভ্রমণ কাহিনীকে অধিকতর সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

ভ্রমণে আনন্দ আছে, শিক্ষা আছে। হযরতের ভ্রমণ কাহিনীতে আনন্দ ও শিক্ষা যুগপৎভাবে চিত্রিত হয়েছে। ফলে পাঠক লিখনীর বাহনে সওয়ার হয়ে ভ্রমণে তাঁর সহযাত্রী হয়ে একই সঙ্গে শিক্ষা ও আনন্দের সরোবরে অবগাহন করে। পুলক অনুভব করে। শিক্ষা লাভ করে। এ বই পাঠে একজন মর্দে মুমিনের 'বাসিরাত' ও 'ফেরাসাত'-এর নজরে পৃথিবীর বসন্তের মাঝে হেমন্তের সম্যক উপস্থিতি পাঠক নিজেও উপলব্ধি করে। নশ্বর পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী সুখ-দুঃখের অন্তরালে স্থায়ী জীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান সুস্পষ্ট শুনতে পায়।

একটি বই প্রকাশ হয়ে পাঠকের হাত পর্যন্ত পৌছতে জানা-অজানা বহু লোকের দু'আ ও সহযোগিতা কার্যকর থাকে। এ বইয়ের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয়। আমি তাদের সকলের শুকরিয়া আদায় করছি। বইয়ে ব্যবহৃত স্থান ও ব্যক্তিসমূহের নাম উর্দূ থেকে সঠিক উচ্চারণসহ নেওয়া কষ্টসাধ্য ছিল। প্রকৌশলী আসাদুজ্জামান সাহেব সেগুলো যথাসম্ভব ঠিক করে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। সর্বোপরি মনোরম প্রচ্ছদ ও আকর্ষণীয় অঙ্গসজ্জায় বইটি প্রকাশ করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আদর্শ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল আশরাফ-এর স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান সাহেব (দা.বা.)এর। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আফিয়াতের সাথে নেক আমলের দীর্ঘ জীবন, উম্মতে মুসলিমার অধিকতর খেদমত করার তাওফীক এবং ইহ-পরকালীন সুখ-শান্তি, সফলতা ও তাঁর রেযামন্দি নসীব করুন। আমীন।

সঠিক ও সুন্দরভাবে অনুবাদ করার আন্তরিক চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও আমার দুর্বলতার কারণে ভুল থেকে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। সুহৃদ পাঠক ভুলগুলো অবহিত করলে দু'আ দিব এবং পরবর্তীতে সংশোধন করে নিব, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা মূল বইয়ের মত অনুবাদটিকেও কবুল করুন। তাঁর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম এবং নাজাতের উসীলা বানিয়ে দিন। আমীন।

মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন
বেজগাঁতী, ফুলকোচা, সিরাজগঞ্জ
৬ই জিলকদ, ১৪২৬ হিজরী

লেখকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى اله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين-امابعد-

বিগত প্রায় বিশ বছর যাবত আমি একটি বৃন্তচ্যুত পত্রের ন্যায় বিরামহীনভাবে সফর করে চলছি। সেই সুবাদে আমি কত দেশ আর কত নগরী যে চষে বেড়িয়েছি তার হিসেব নেই। তার মধ্যকার বিভিন্ন সফরের উল্লেখযোগ্য তথ্য–বৃত্তান্ত এবং তদসংশ্লিষ্ট ইসলামের হারানো ইতিহাস–ঐতিহ্যের নানা অধ্যায় আমি 'সফরনামা' রূপে লিখে আসছি। যার প্রথমাংশ 'জাহানে দীদাহ' [১] নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে এবং আশাতীত সমাদৃত হয়েছে। 'জাহানে দীদাহ' ছেপে বের হওয়ার পরও অব্যাহত গতিতে আমার সফর চলতে থাকে এবং এখনও তা' অব্যাহত রয়েছে। এখন এই ভূমিকা লেখার সময়েও আমি দীর্ঘ এক সফরের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে আছি। সুতরাং ইতোমধ্যে আরো কিছু 'সফরনামা' লেখা সম্পন্ন হয়েছে। হিতাকাংখী বন্ধুমহলের পক্ষ থেকে 'জাহানে দীদাহ'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করার জন্যও তাড়া আসতে থাকে। বক্ষমান গ্রন্থ তাদের সেই বাসনারই প্রতিফলন। তবে বিভিন্ন কারণে আমি একে 'জাহানে দীদাহ'র দ্বিতীয় খণ্ড না বানিয়ে এর নাম দেই 'দুনিয়া মেরে আগে'।

পাঠককে উভয় পুস্তক একত্রে ক্রয় করতে বা পাঠ করতে বাধ্য না করা এই নাম পরিবর্তন করার অন্যতম কারণ। আর এটিও একটি কারণ যে, আমার প্রথম পুস্তকের নামের সঠিক উচ্চারণ হলো 'জাহানে দীদাহ' [جهان ديده যের বিশিষ্ট নূন দিয়ে] কিন্তু অনেক পাঠকই এত

১. 'জাহানে দীদাহ' আমরা বাংলায় ৪ খণ্ডে প্রকাশ করেছি—১ম খণ্ড ফুরাত নদীর তীরে। ২য় খণ্ড উহুদ থেকে কাসিয়ূন। ৩য় খণ্ড হারানো ঐতিহ্যের দেশে। ৪র্থ খণ্ড অমুসলিম দেশে মুসলিম পর্যটক। বাংলা অনুবাদ আশাতীত সমাদৃত হয়েছে। —প্রকাশক

অধিকহারে এর উচ্চারণ 'জাহাঁ দীদাহ' [جهاں ديده নুনে গুন্না সহযোগে] করেছে যে, আমি এই দ্বিতীয় পুস্তকের সঙ্গে এমন অবিচার করার আর দুঃসাহস করি না। আমার সম্মুখে মানুষ যতবার এই পুস্তকের নাম 'জাহাঁ দীদাহ' [جهاں ديده নূনে গুন্না সহযোগে] উচ্চারণ করে, ততবারই আমার অন্তরে গ্লানি অনুভব করি। বিধায় দ্বিতীয় পুস্তকের নাম পরিবর্তন করার মধ্যেই নিরাপত্তা দেখতে পাই।

যাই হোক, পুস্তকটি এখন আপনাদের সামনে। আল্লাহ তাআলা পুস্তকটিকে পাঠককুলের মনোরঞ্জনের উপকরণ এবং কল্যাণকর করেন, এটিই আমার আন্তরিক দু'আ।

মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
দারুল উলূম করাচী–১৪
৫ই রবিউস সানী, ১৪২৩ হিজরী

সূচীপত্র

Contents

॥ ॥ ॥

স্পেন ভ্রমণ

জেদ্দাস্থ 'ইসলামী ফেকাহ একাডেমী' এবং 'ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের' যৌথ উদ্যোগে মরক্কোর রাজধানী 'রাবা'তে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল 'শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রচলিত অর্থব্যবস্থা'। উক্ত আলোচনা সভায় আমাকেও অংশগ্রহণ করতে হয়।

১৯শে রবিউস সানী ১৪১০ হিজরীর ভোরবেলা করাচী থেকে আমি পি.আই.এ এর বিমানে যাত্রা করি। রাবাত পর্যন্ত সরাসরি কোন বিমান ছিল না বিধায় প্যারিস হয়ে সফর করতে হয়। পথিমধ্যে কিছু সময়ের জন্য কায়রোতেও বিমান যাত্রা বিরতি করে। একটানা এগারো ঘন্টা পথ চলার পর বিকাল তিনটায় প্যারিসের 'ওরলি বিমান বন্দরে' অবতরণ করি। বিমানবন্দরে প্রায় চার ঘন্টা অপেক্ষা করার পর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এয়ার ফ্রান্সের অপর একটি ফ্লাইট ধরতে সক্ষম হই। তিন ঘন্টা আকাশে উড়ার পর বিমানটি মরক্কোর স্থানীয় সময় রাত সাড়ে নয়টায় রাবাতে পৌঁছায়।

'হায়াত রিজেন্সী হোটেলে' আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই হোটেলেরই একটি হলরুমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় পাঁচদিন পর্যন্ত আলোচনা সভার বিভিন্ন অধিবেশন এবং আলোচিত বিষয়সমূহের খসড়া প্রণয়নে আমি ব্যস্ত থাকি। এর ফাঁকে ফাঁকে কয়েকবার রাবাত নগরীর বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখারও সুযোগ হয়। তবে ধারাবাহিক অধিবেশন চলায় এবং বাইরে অবিরাম বৃষ্টি থাকায় বেশির ভাগ সময় হোটেলেই কাটাতে হয়।

মরক্কো স্পেনের সবচে' নিকটবর্তী একটি মুসলিম দেশ। স্পেনভূমিতে মুসলমানদের দীর্ঘ আটশ' বছরের দীপ্তিময় ইতিহাস–ঐতিহ্য জড়িয়ে আছে, বিধায় বাল্যকাল থেকে এ ভূখণ্ডকে দেখার এক তীব্র বাসনা হৃদয়ে

লালন করে আসছিলাম। মরক্কো থেকে স্পেন নিকটবর্তী হওয়ার এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এ সফরেই সে মনোবাসনা পূর্ণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। কিন্তু বহুবিধ ব্যস্ততার কারণে বেশি সময় ব্যয় করার মত অবকাশও হাতে ছিল না। তদুপরি একজন সফরসঙ্গীরও তীব্র প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানীতে উভয় সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়। প্রথমত, রাবাতের আলোচনা সভা নির্দিষ্ট সময়ের দু'দিন পূর্বেই সমাপ্ত হয়ে যায় এবং এ দু'দিনে করাচী যাওয়ার মত উপযুক্ত কোন ফ্লাইটও ছিল না। অপরদিকে বাহরাইনের ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংকের এ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর জেনারেল বন্ধুবর সাঈদ আহমাদ সাহেব এ সফরে অধমের সঙ্গী হন, সফরের সমস্ত ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেন এবং অতি উত্তমভাবে তা সম্পাদন করেন। ফলে আমাকে কিছুই করতে হয়নি।

প্রথমে ভেবেছিলাম যে, আমরা রাবাত থেকে রেলগাড়ীযোগে টাংগের যাবো এবং সেখান থেকে ষ্টিমারে ভূমধ্য সাগর অতিক্রম করে 'আলজাযিরাতুল খাযরা' বন্দরে অবতরণ করবো। কিন্তু আমাদের হাতে সময় ছিল খুবই কম, আর এ পথে 'আল জাযিরাতুল খাযরা' পৌছতে পুরো একদিন ব্যয় হয়ে যাবে। তাই আমরা স্পেনের উপকূলীয় শহর 'মালাগা' পর্যন্ত বিমানে সফর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। ১৪১০ হিজরীর ২৩শে রবিউস সানী সন্ধ্যাবেলা আলোচনা অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। ২৪শে রবিউস সানী ভোর সাতটায় আমরা কারযোগে 'কাসাব্লাঙ্কার' উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। সড়ক পথে এটি ছিল দু' ঘন্টার সফর। সড়কের ডান দিক ধরে ভূমধ্য সাগরের উপকূল ধেয়ে চলেছে। বামদিকে আদিগন্ত বিস্তৃত সবুজ–শ্যামল প্রান্তর। মাঝে মাঝে ছোট ছোট জনবসতি। এসব অতিক্রম করে প্রায় ন'টার দিকে আমরা 'কাসাব্লাঙ্কার' 'পঞ্চম মুহাম্মাদ বিমান বন্দরে' পৌছি।

বেলা সাড়ে এগারোটার সময় স্পেনের আইবেরিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান 'মালাগা' অভিমুখে উড়াল দেয়। বিমানটি কাসাব্লাঙ্কা ছেড়ে আসার আনুমানিক পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে। তার অল্পক্ষণের মধ্যেই স্পেন–উপকূল এবং তৎসংলগ্ন বিস্তৃত মালাগার

ভবনসমূহ দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। স্থানীয় সময় বেলা দেড়টার দিকে বিমান মালাগার (Malaga) সুবিশাল বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

আমি এ ভ্রমণ বৃত্তান্তের শেষের দিকে মালাগার পূর্ণ পরিচিতি তুলে ধরবো ইনশাআল্লাহ। তবে এখানে এতটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, মুসলিম শাসনকালেও এটি ছিল স্পেনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী এবং স্পেনের ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এর সাথে জড়িত রয়েছে। আমরা বিমান থেকে অবতরণ করার পর যখন ইমিগ্রেশন ইত্যাদির কাজ শেষ করি, তখন প্রায় আড়াইটা বেজে গেছে। এখান থেকে গ্রানাডার সফর আনুমানিক আড়াই–তিন ঘন্টার পথ। তাই মালাগা বিমানবন্দরেই যোহর নামায পড়ে নেই। দীর্ঘ আটশ' বছর এ ভূখণ্ডের বাতাসে বাতাসে আযানের ধ্বনি ভেসে বেড়িয়েছে। এ ভূখণ্ডের এমন একটি জায়গাও হয়তো পাওয়া যাবে না, যেখানে মুসলমানদের সেজদার চিহ্ন অঙ্কিত হয়নি। আর আজ সেই ভূখণ্ডে কেবলার সঠিক দিক বলে দেওয়ার মতও একজন লোক ছিল না। দিকদর্শনযন্ত্র দিয়ে আমি কেবলার দিক নির্ধারণ করি। তারপর বিমানবন্দরেরই একটি কোণায় আমরা দু'জন জামাআতের সাথে যোহর নামায আদায় করি। একসময় যে ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণকারী প্রতিটি শিশু সর্বপ্রথম তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ) ও রিসালাতের স্বীকৃতিদান শিক্ষালাভ করতো এবং নামাযের পদ্ধতি দেখতে পেতো, আজ সেই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের জন্য আমাদের দু'জনের নামাযের এই আমল এতই অপরিচিত ও বিস্ময়কর ছিল যে, আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রমকারীরা বড় বিস্ময়ের সাথে আমাদেরকে দেখছিল। আমার ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক স্থানে—কোন কোন সময় সাধারণ উন্মুক্ত স্থানেও—বহুবারই নামায পড়ার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু নামাযের ব্যাপারে মানুষের এমন অপরিচিতি ও বিস্ময় অন্য কোথাও দেখতে পাইনি।

মোটকথা, শিক্ষা ও অনুতাপের এক সাগর আবেগ হৃদয়ে ধারণ করে স্পেনভূমিতে প্রথম নামায পড়ি। অন্যান্য পশ্চিমা দেশসমূহের মত এখানেও ড্রাইভার ছাড়া শুধু কার ভাড়ায় পাওয়া যায়। আমরা দু'দিনের জন্য একটি 'ফিয়েট' কার ভাড়া করি। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে দ্বিধান্বিত ছিলাম, কারণ এখানকার পথ–ঘাটও আমাদের অচেনা এবং

এখানকার ভাষাও আমাদের অজানা তাই নিজেরা গাড়ী চালাতে পথে সমস্যা হতে পারে। কিন্তু আমার বিশিষ্ট বন্ধু ও সফরসঙ্গী সাঈদ সাহেব হিম্মত করলেন এবং নিজে গাড়ী চালানোর দায়িত্ব নিলেন। এখানেই আমরা গ্রানাডা পৌঁছার পথসমূহের একটি মানচিত্রও পেয়ে যাই। সাঈদ সাহেব সেই মানচিত্রের সাহায্যে পথ চলতে আরম্ভ করেন।

গ্রানাডাগামী মহাসড়ক পর্যন্ত পৌঁছতে আমাদেরকে কিছুটা কষ্ট করতে হয়। তবে একটু পরই মালাগার অভ্যন্তরের সড়কসমূহের উপর গ্রানাডার সড়কের দিকনির্দেশক তীর বসানো চোখে পড়তে থাকে। গ্রানাডা–সড়কগামী এই তীর একটু পরপর এত ধারাবাহিক এবং এমন উপযুক্ত স্থানে বসানো ছিল যে, কাউকে আর জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হয় না। সেই তীরসমূহের অনুসরণ করে আমরা মালাগার ঘনবসতির বাইরে চলে এসে গ্রানাডাগামী পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন মহাসড়ক দেখতে পাই। ক্রমান্বয়ে শহরের ভবনসমূহ শেষ হয়ে আসে। সড়কের উভয় দিকে সবুজ–শ্যামল বৃক্ষাবৃত ছোট ছোট পাহাড়সারি আরম্ভ হয়। পাহাড়সারির উপরে এবং মধ্যবর্তী ময়দানসমূহে সুদৃশ্য যয়তুন বৃক্ষ ছিল দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। ইতিহাস ও সাহিত্যের পুস্তকসমূহে স্পেনের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের যে বিবরণ একসময় পাঠ করেছিলাম, চোখে দেখা দৃশ্য তার পরিপূর্ণ সত্যায়ন করছিল।

এটি ছিল স্পেনের সেই ভূখণ্ড, যার উপর সংঘটিত মুসলমানদের উত্থান–পতনের আটশ' বছরের ইতিহাস এবং তার ঘটনাবলী শিশুকাল থেকে আমার মনোসংযোগ ও মনোরঞ্জনের কেন্দ্র ছিল। কল্পনার চোখে এর কত কাঠামোই না তৈরী করেছি। কল্পজগতের সেই সুন্দর উপত্যকাসমূহ এবং সৌন্দর্যের সেই প্রান্তরসমূহ আজ আমার বাস্তব চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত। আজ আমার চোখের সম্মুখে আটশ' বছরের ঘটনাবলী যেন চলচ্চিত্রের রূপধারণ করেছে। একসময় যে জাতি তরবারীর ছায়াতলে এ ভূমিতে তাকবীরধ্বনির ফোয়ারা উৎসারিত করেছিল, সে জাতিই দীর্ঘ আটশ' বছর পর্যন্ত বিশ্ববাসীর নিকট থেকে নিজেদের দোর্দণ্ডপ্রতাপের স্বীকৃতি আদায় করার পর বাদ্য ও সঙ্গীতের তানে বিভোর হয়ে এমন চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছে যে, আজ তাদের

অস্তিত্বের কোন চিহ্ন পর্যন্ত এখানে অক্ষত নেই।

'উন্দোলুস' [১]—যাকে 'হিস্পানিয়া' এবং 'স্পেন'ও বলা হয়—ইউরোপের দক্ষিণ–পশ্চিমে অবস্থিত। তার সীমান্ত উত্তরে ফ্রান্সের সঙ্গে এবং পশ্চিমে পর্তুগালের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এর পূর্ব ও দক্ষিণ দিয়ে ভূমধ্যসাগর প্রবাহিত, যার আরেক নাম 'রোম সাগর'।

স্পেনের দক্ষিণ উপকূলে এসে রোম সাগর সংকীর্ণ হয়ে ছোট একটি প্রণালীর রূপ ধারণ করেছে। এই প্রণালীর পথ ধরে রোম সাগর আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়ে পতিত হয়েছে। এই প্রণালীটিকে এখন 'জাবালে তারেক প্রণালী' (Strait of Gibraltor) বলা হয়। এর অপর পার থেকে আফ্রিকা মহাদেশ আরম্ভ হয়েছে। যার সর্বশেষ পশ্চিমের দেশ মরক্কো।

আমি আমার আলজিরিয়ার সফরনামায় সাহাবী হযরত ওকবা বিন নাফে' (রাযিঃ)–এর হাতে মরক্কো বিজয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছি। হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষ নাগাদ মুসলমানগণ আফ্রিকার উত্তরাংশ জয় করতে করতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত পৌঁছে যান। প্রাথমিক যুগের ইসলামী শক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে, তাদের লক্ষ্য দেশ জয়ের লালসা কিংবা ক্ষমতাধীন রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধি করা ছিল না। তাঁরা যে মিশন নিয়ে বের হয়েছিলেন, তা ছিল আল্লাহর বান্দাদেরকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বের অধীনে নিয়ে আসা। তাই যেখানেই তাঁদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়েছে, সেখানেই ন্যায়–নিষ্ঠা, শান্তি ও শৃংখলার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হয়েছে যে, বিজিত জাতিসমূহ তাঁদেরকে ঘৃণা না করে বরং ভালবেসেছে। পৃথিবীর যে সমস্ত ভূখণ্ড তখনো তাঁদের শাসনাধীন হওয়া থেকে বঞ্চিত ছিল, সে সমস্ত

১. কথিত আছে যে, হযরত নূহ (আঃ)এর মহাপ্লাবনের পর সর্বপ্রথম যে জাতি এ ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করে তার নাম ছিল 'উন্দুলুশ'। আরবরা তার নামের 'শীন'কে 'সীন' দ্বারা পরিবর্তন করে এ পুরা অঞ্চলের নাম 'উন্দোলুস' রাখে। পরবর্তীতে এখানে 'ইশবান' নামক এক রোমান বাদশার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সে–ই এখানকার 'ইশবীলিয়া' নগরী প্রতিষ্ঠা করে। যে কারণে 'ইশবীলিয়া' পরবর্তীতে 'ইশবীনিয়া' নাম ধারণ করে এবং ক্রমে এ নামেই সমগ্র দেশের নামকরণ করা হয়। আর তারই বিকৃত রূপ 'হিসপানিয়া' বা 'স্পেন'। —নাফহুততীব লিল মুকরী।

ভূখণ্ডের নিপীড়িত ও নির্যাতিত অধিবাসীরা বাসনা করত যে, মুসলমানগণ যেন তাদের এলাকাতেও আক্রমণ করে সেখানেও নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

সে সময় স্পেনে একজন খৃষ্টান রাজার শাসন চলছিল। ইংরেজী ভাষার ইতিহাসসমূহে তার নাম 'রডারিক' এবং আরবী ভাষার ইতিহাসসমূহে 'লাযরীক' উল্লেখ রয়েছে। এদিকে মরক্কোর উপকূলীয় 'সাবতা' এলাকায় কাউন্ট জুলিয়ন নামের এক বর্বর সরদারের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেও ছিল একজন খৃষ্টান। কিন্তু রডারিক তাকে করদ রাজা বানিয়ে রেখেছিল। রডারিক ছিল একজন অত্যাচারী শাসক। তার বহুবিধ অপকর্মের অন্যতম ছিল, সে তার প্রজাদের উঠতি বয়সের তরুণ-তরুণীদেরকে 'রাজ প্রশিক্ষণ'-এর নাম দিয়ে তার অধীন করে রেখে তাদের সাথে কামচাহিদা পূর্ণ করতো। জুলিয়নের এক যুবতী কন্যাও একইভাবে তার 'পরিচর্যাধীন' ছিল। পরিশেষে রডারিক তার সাথেও কামচাহিদা চরিতার্থ করে। কন্যা পিতা জুলিয়নকে তার নির্যাতিতা হওয়ার বিষয় অবহিত করে। ফলে জুলিয়নের অন্তরে রডারিক ও তার শাসন ক্ষমতার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা তরঙ্গায়িত হতে থাকে।

এটি সে সময়ের ঘটনা, যখন মূসা বিন নুসাইরের নেতৃত্বে মুসলমানগণ উত্তর আফ্রিকার সিংহভাগ এলাকা নিজেদের দখলে এনেছিল। জুলিয়ন একটি প্রতিনিধিদল সহ মূসা বিন নুসাইরের খেদমতে হাজির হয়ে তাঁকে স্পেনের উপর আক্রমণ করে সেখানকার লোকদেরকে রডারিকের জুলুম-নির্যাতনের হাত থেকে মুক্ত করার আবেদন জানান। মূসা বিন নুসাইর (রহঃ) জুলিয়নের আবেদনের ভিত্তিতে খলীফা ওলীদ ইবনে আবদুল মালেকের নিকট স্পেন আক্রমণ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। খলীফা সাবধান ও সজাগ থাকার প্রতি গুরুত্ব সহকারে তাকিদ করে তাঁকে আক্রমণ করার অনুমতি প্রদান করেন। তখন মূসা বিন নুসাইর (রহঃ) প্রথমে টাংগের থেকে স্পেনে ছোট ছোট অভিযান পরিচালনা করেন। এ সমস্ত অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা। এ সমস্ত অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হলে মূসা বিন নুসাইর (রহঃ) তারেক বিন যিয়াদ (রহঃ)এর

নেতৃত্বে বড় একটি সেনাবাহিনীকে স্পেনের উপর আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেন। তারেক বিন যিয়াদ (রহঃ)এর সেনাবাহিনী সাত হাজার মুসলমানের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। তাদেরকে টাংগের থেকে স্পেনে পৌছানোর জন্য বড় বড় চারটি জাহাজ ব্যবহার করা হয়। জাহাজগুলো কয়েকদিন পর্যন্ত সৈন্যদের পারাপারের কাজে লিপ্ত থাকে। অবশেষে সমস্ত সৈন্য স্পেনের সেই উপকূলে গিয়ে অবতরণ করে, যা আজো জাবালুত তারিক বা জিব্রাল্টার নামে প্রসিদ্ধ।

বর্ণিত আছে যে, জাহাজে আরোহণ করার কিছুক্ষণ পর তারেক বিন যিয়াদ ঘুমিয়ে পড়েন এবং স্বপ্নে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত লাভ করেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খুলাফায়ে রাশিদীন (রাযিঃ) এবং আরো কিছু সাহাবী তীর ও তরবারী দ্বারা রণসাজে সজ্জিত হয়ে সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে আসছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারেক বিন যিয়াদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন ঃ 'তারেক! সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকো।' তারপর তারেক দেখতে পেলেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সম্মানিত সহচরগণ তাকে অতিক্রম করে স্পেনভূমির অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন।

তারেকের নিদ্রা ভঙ্গ হলো। তিনি তখন সীমাহীন আনন্দে আত্মহারা। তিনি স্বপ্নযোগে স্পেন বিজয়ের সুসংবাদলাভ করেছেন। সঙ্গী মুজাহিদদেরকে তিনি উক্ত সুসংবাদ অবহিত করেন। এই সুসংবাদের ফলে মুজাহিদদের সাহস বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। (নাফহুত তীব, খণ্ড–১, পৃঃ ২৩৯)

প্রসিদ্ধ আছে যে, সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী স্পেনম উপকূলে পৌছে গেলে তারেক তাঁর নৌবহরকে জ্বালিয়ে দেন, যেন সৈন্যদের সম্মুখে বিজয়লাভ করা বা মৃত্যুবরণ করা ছাড়া তৃতীয় কোন পথ অবশিষ্ট না থাকে। এ ঘটনাটিকেই ইকবাল এভাবে কাব্যের রূপ দিয়েছেন—

طارق چو برکنارہ اندلس سفینہ سوخت
گفتند کار تو بہ نگاہ خرد خطاست
دوریم از سواد وطن باز چوں رسیم؟
ترک سبب ز روئے شریعت کجا رواست؟

خندید و دست خویش به شمشیر برد و گفت
هر ملک ملک ماست که ملک خدائے ماست

"স্পেনের উপকূলে পৌঁছে তারেক তাঁর নৌবহর জ্বালিয়ে ফেললেন।
উপস্থিত লোকেরা বলল ঃ 'বুদ্ধির বিচারে তুমি বড় ভুল কাজ করলে। আমরা স্বদেশভূমি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছি, এখন আমরা কিভাবে দেশে ফিরবো?'
উপকরণ পরিত্যাগ করা তো শরীয়তের আলোকেও অবৈধ।"
উত্তরে তারেক স্মিত হাসলেন আর স্বহস্তে তরবারী উত্তোলন করে বললেন ঃ সব দেশই আমাদের দেশ, কারণ এ সবই আমাদের আল্লাহর দেশ।" [১]

তারেক বিন যিয়াদ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে 'জাবালে ফাতাহ' বা জাবালে তারেক (জিব্রাল্টার)এর উপকূলে অবতরণ করেছিলেন। সেখান থেকে 'আল জাযিরাতুল খাযরা' (সবুজ উপদ্বীপ) পর্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ তিনি উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিরোধের মুখোমুখী না হয়ে জয় করেন। কিন্তু তারপর রডারিক তার বিখ্যাত সেনাপতি থিওডমীরকে (Theodomir) বিশাল এক সেনাবাহিনী সহ তারেক বিন যিয়াদের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য প্রেরণ করে। মুসলিম সেনাবাহিনীর সঙ্গে থিওডমীরের পরপর অনেকগুলো লড়াই হয়। যার প্রতিটি লড়াইয়ে সে শোচনীয় পরাজয়ে পর্যুদস্ত হয়। এমনকি একাধারে পরাজয় বরণ করতে করতে সে সাহসহারা হয়ে পড়ে। তখন সে রডারিককে পত্রযোগে জানায় যে, 'এমন এক জাতির আমি মুখোমুখী হয়েছি, যারা বড় বিস্ময়কর এক জাতি। তারা আসমান থেকে নেমে এসেছে, নাকি জমিন ফুঁড়ে উঠে

১. বর্তমান যুগের ইতিহাসসমূহে জাহাজ জ্বালানোর ঘটনাটি খুব প্রসিদ্ধ হলেও স্পেন বিজয়ের প্রাথমিক প্রামাণ্যগ্রন্থসমূহে আমি এর উল্লেখ পাইনি। স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক 'মুকরী' স্পেন বিজয়ের ঘটনা খুব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন, কিন্তু তাতে জাহাজ জ্বালানোর কথা উল্লেখ নেই। ইবনে খালদূন ও তাবারী প্রমুখও এর উল্লেখ করেননি। এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে যে, তারেক বিন যিয়াদের যে ভাষণ সম্মুখে আসছে, তার প্রথমাংশ থেকে ঐতিহাসিকগণ একথা উদ্ধার করেছেন যে, তারেক তাঁর জাহাজগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

এসেছে তা' আল্লাহই ভাল জানেন। এখন আপনি নিজে অকুতোভয় সেনাদের সমন্বয়ে গঠিত বিশাল এক সেনাবাহিনী নিয়ে তাদেরকে প্রতিরোধ না করলে তাদের সাথে মোকাবেলা করা কোনভাবেই সম্ভবপর নয়।'

রডারিক তার প্রেরিত সেনাপতির পত্র পেয়ে সত্তর হাজার সৈন্যের সমন্বয়ে বিশাল এক সেনাবাহিনী তৈরী করে তারেকের সঙ্গে মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

অপরদিকে মূসা বিন নুসাইরও তারেক বিন যিয়াদের সাহায্যে আরো পাঁচ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। এ সৈন্য এসে পৌছলে তারেক বিন যিয়াদের বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা বারো হাজারে উপনীত হয়। জুলিয়নের বাহিনী ছিল এর অতিরিক্ত।

লাক্কা নামক প্রান্তরে উভয় বাহিনী লড়াইয়ের জন্য মুখোমুখী হলে তারেক বিন যিয়াদ তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন, যা আজো আরবী সাহিত্য ও ইতিহাস-গ্রন্থসমূহে ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়ে আসছে। সে ভাষণের প্রতিটি শব্দ থেকে তারেক বিন যিয়াদের অবিচল সংকল্প, উচ্চ সাহসিকতা এবং আত্মনিবেদনের সুতীব্র আবেগ অনুমিত হয়। সে ভাষণের অংশবিশেষ নিম্নে প্রদত্ত হলো—

"মুজাহিদ সেনাদল! তোমাদের পালানোর সমস্ত পথ রুদ্ধ। তোমাদের পশ্চাতে উত্তাল সাগর, আর সম্মুখে উন্মত্ত শত্রুসেনা। আর তাই আল্লাহর শপথ! আল্লাহর সঙ্গে কৃত তোমাদের প্রতিশ্রুতি সর্বান্তকরণে পূর্ণ করা এবং ধৈর্যের সাথে অবিচল থাকা ভিন্ন তোমাদের সম্মুখে দ্বিতীয় কোন পথই উন্মুক্ত নেই। মনে রেখো! তোমরা কৃপণের দস্তরখানে উপবিষ্ট ইয়াতিমের চেয়ে অধিক অসহায়। শত্রুপক্ষ তোমাদের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য তাদের সমস্ত সৈন্য-সামন্ত এবং অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ময়দানে এসেছে। তাদের নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী মওজুদ রয়েছে। পক্ষান্তরে তোমাদের জন্য তোমাদের তরবারী ছাড়া অন্য কোন আশ্রয়স্থল নেই। তোমাদের নিকট কোন খাদ্যসামগ্রীও নেই। কেবলমাত্র দুশমন থেকে ছিনিয়ে আনা খাদ্যই তোমাদের জীবন রক্ষার উপকরণ হবে। তোমাদের এই অভাব-অনটনের মধ্যে যদি দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, আর

তোমরা এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন সাফল্য লাভ করতে না পারো, তাহলে তোমরা হীনবল হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে শত্রুসেনার অন্তরে তোমাদের সম্পর্কে যে ভীতি আচ্ছন্ন হয়ে আছে তা দূর হয়ে তদস্থলে তোমাদের বিপক্ষে দুঃসাহস ও নির্ভীকতা জন্ম নিবে। তাই এই করুণ পরিণতিকে নিজেদের থেকে দূরে রাখতে চাইলে তার একমাত্র পন্থা হলো তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে এই উদ্ধত রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, যাকে তার নিরাপদ দেশ তোমাদের মুখোমুখী করেছে। তোমরা নিজেদেরকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করতে পারলেই কেবল এই দুর্লভ সুযোগ থেকে ফায়দা লুটতে পারবে। আমি তোমাদেরকে এমন কোন পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করছি না, যা থেকে আমি নিজে মুক্ত। আমি তোমাদেরকে এমন কোন কাজের প্রতিও উদ্বুদ্ধ করছি না, যার মধ্যে সবচে' স্বল্পমূল্যের পুঁজি হয়ে থাকে মানব–প্রাণ এবং যার সূচনা আমি সর্বপ্রথম খোদ আমাকে দ্বারা করছি না। মনে রেখো! আজকের এই কষ্টে যদি তোমরা ধৈর্যের সাথে অবিচল থাকতে পারো, তাহলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সুখ–শান্তি উপভোগ করতে পারবে।"

"মহান আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতা তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। তোমাদের এ মহান কীর্তি ইহ–পরকালে তোমাদের অম্লান স্মৃতি হয়ে থাকবে। মনে রেখো! যার প্রতি আমি তোমাদেরকে আহবান করছি, তাতে আমিই সর্বপ্রথম 'লাব্বাইক' বলবো। আমার সংকল্প এই যে, উভয় বাহিনী যখন সংঘর্ষে লিপ্ত হবে, তখন আমি এই জাতির সর্বাধিক ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যক্তি রডারিকের উপর আক্রমণ করবো। ইনশাআল্লাহ আমি নিজ হাতে তাকে হত্যা করবো। তোমরাও আমার সঙ্গে আক্রমণ কোরো। রডারিককে হত্যা করার পর আমিও যদি নিহত হই, তাহলে রডারিকের দায়িত্ব থেকে আমি তোমাদেরকে মুক্ত করে দিলাম। আর তোমাদের মধ্যে এমন বাহাদুর জ্ঞানী ব্যক্তির কমতি নেই, যাকে তোমরা তোমাদের নেতৃত্ব অর্পণ করতে পারো। আর যদি রডারিক পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই আমি নিহত হই, তাহলে আমার এই সংকল্পের পূর্ণতা সাধনে আমার প্রতিনিধিত্ব করা তোমাদের জন্য অবশ্য করণীয় হবে। তোমরা সম্মিলিতভাবে তার উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখবে। তখন সমগ্র উপদ্বীপ বিজয়ের চিন্তা পরিহার করে

শুধুমাত্র ঐ একটি ব্যক্তিকে হত্যা করার দায়িত্ব গ্রহণ করাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। কারণ, সে মারা পড়লে দুশমন সাহসহারা হয়ে পড়বে।”

তারেক বিন যিয়াদের মুজাহিদ সঙ্গীরা পূর্ব থেকেই জিহাদী চেতনায় এবং শাহাদাতের বাসনায় উন্মত্ত ছিলেন। তারেকের জ্বালাময়ী এ ভাষণ তাঁদের অন্তরে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে। তাঁরা লাক্কার লড়াইয়ে দেহ–মনের কথা বিস্মৃত হয়ে লড়াই করেন। একাধারে আটদিন পর্যন্ত সে লড়াই অব্যাহত থাকে।

পরিশেষে মুসলমানগণ আল্লাহর সাহায্য লাভ করেন এবং বিজয় তাঁদের পদচুম্বন করে। রডারিকের বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করে পালিয়ে যায়। রডারিক নিজেও ঐতিহাসিক এ লড়াইয়ে নিহত হয়। কোন কোন বর্ণনায় জানা যায় যে, তারেক বিন যিয়াদ নিজেই তাকে হত্যা করেন, আর কোন কোন বর্ণনামতে তার শূন্য ঘোড়া সাগরতীরে পাওয়া যায়, যে কারণে অনুমান করা হয় যে, সে সাগরে ডুবে মারা গেছে।

লাক্কা প্রান্তরের দীর্ঘ এক সপ্তাহব্যাপী বড় ধৈর্যসংকুল এই লড়াইয়ে মুসলমানদের অর্জিত বিজয় ইউরোপে মুসলমানদের অনুপ্রবেশের ভূমিকা ছিল। এ বিজয় মুসলমানদের জন্য সমগ্র স্পেনের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। এরপর মুসলমানগণ স্পেনের সমস্ত শহর পদানত করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। এমনকি তারা স্পেনের তৎকালীন রাজধানী Tollido–কেও জয় করে। তারপরও তাদের অগ্রাভিযান অব্যাহত থাকে, এমনকি তারা ফ্রান্সের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পিরীনিজ পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

স্পেন বিজয়ের পর মুসলমানগণ এখানে আটশ’ বছর পর্যন্ত শাসনকার্য চালায়। এ সময়ে তারা এখানে জ্ঞান–বিজ্ঞান ও সভ্যতা–সংস্কৃতির অতুলনীয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে। তারা এ ভূখণ্ডকে পৃথিবীর সর্বাধিক উন্নত ভূখণ্ডে পরিণত করে।

কল্পনার জগতে এ সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার অপরূপ আসর সাজিয়ে আমরা গ্রানাডাগামী সড়কে আমাদের যাত্রা অব্যাহত রাখি।

নীলিমায় শুভ্র মেঘের ছোট ছোট ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছে। সড়কটি ছোট ছোট সবুজ-শ্যামল পাহাড়ের মাঝ দিয়ে এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলছে। পাহাড়চূড়ায় এবং মধ্যবর্তী প্রান্তরসমূহে সুদর্শন যাইতুন বৃক্ষের সুবিন্যস্ত সারি দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। কল্পনার চক্ষু পাহাড় ও প্রান্তরের চড়াই-উৎরাইয়ের মাঝে ইসলামের দৃঢ়সংকল্পী মুজাহিদ কাফেলাসমূহকে ওঠা-নামা করতে দেখছিল। আজ আমাদের কারটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি সড়কের উপর দিয়ে ধেয়ে চলছিল। যার সম্মুখে কোন পাহাড় পথ আগলে দাঁড়ালে সে তার বুক চিরে সুড়ঙ্গপথ তৈরী করে নিয়েছে। কিন্তু তেরো শ' বছর পূর্বে মরুবাসীদের এ সমস্ত কাফেলা বন্ধুর গিরিপথসমূহকে নিজেদের সাহস ও সংকল্প দ্বারা অতিক্রম করে পিরীনিজ পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কবি ইকবাল তারেক বিন যিয়াদের ভাষায় সে সমস্ত আল্লাহ-পাগল মুজাহিদদের সম্পর্কেই বলেছেন—

یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے
جنہیں تونے بخشا ہے ذوق خدائی
دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا
سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی

দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা এসব
তোমার আজব বান্দা এঁরা,
হৃদয়ে যাঁদের দিয়েছো তুমি
তোমার প্রেমের অকূলধারা।
ময়দানে যাঁরা আঘাত হানে
দরিয়ায় তোলে ঝড়-তুফান,
শৌর্যে যাঁদের পর্বতমালা
ভেঙ্গে চুরে হয় খান খান।

চলার পথে কিছুদূর পরপর ছোট ছোট জনবসতি এবং মাঝারি ধরণের শহরসমূহও অতিক্রম হতে থাকে। এ সমস্ত জনবসতির নাম দ্বারা অনুমিত হচ্ছিল যে, এগুলো কোন আরবী নামেরই বিকৃত রূপ। যেমন

সর্বপ্রথম তুলনামূলক যে বড় শহরটি আমাদের সামনে আসে তার নাম ছিল—'কাসা বারমাজা' (Casa Bermaja)। 'কাসা' মূলতঃ আরবী 'কস্‌র' শব্দের বিকৃত রূপ। তাই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এ জনবসতির নাম 'কসরে বারমাজা' ছিল। এ এলাকা সম্পূর্ণটাই পাহাড়ী অঞ্চল, তাই প্রত্যেক জনবসতিতেই কোন না কোন পাহাড় ছিল। আর প্রত্যেকটি পাহাড়ের চূড়ায় একটি করে বিশিষ্ট গির্জা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। যেগুলোর মিনারা স্পেনের মসজিদসমূহের মিনারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। স্পেনে মুসলমানদের পরাজয়বরণের কিছুদিন পর যেহেতু দেশের সমস্ত মসজিদকে গির্জায় পরিণত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল, তাই প্রবল ধারণা এই যে, পাহাড়চূড়ায় নির্মিত এ সমস্ত গির্জা—যেগুলোতে সব জায়গায় একই ধরনের মিনারা দেখা যায়—এক সময় মসজিদ ছিল। যেগুলো থেকে একসময় পাঁচ ওয়াক্ত আযান ধ্বনি ঘোষিত হত। অথচ আজ এ সমস্ত মিনারা যেন নীরব ভাষায় পথিকদের ডেকে বলছে—

زمزموں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے
کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لئے خاموش ہے

'যে তাকবীরধ্বনির সুর মূর্ছনায় আজও কর্ণ বিমোহিত।
সেই তাকবীরধ্বনি কি আজি চিরতরে তিরোহিত?'

লোজাতে

সূর্যাস্তের পূর্বে আমরা গ্রানাডায় পৌঁছতে চাচ্ছিলাম। তাই সাঈদ সাহেব বেশ দ্রুতগতিতে গাড়ী চালাচ্ছিলেন। আর সাথে সাথে আমি স্পেনের ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা তাঁকে শুনিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি সে সমস্ত ঘটনা অত্যন্ত মনোযোগ, শিক্ষাগ্রহণ ও আক্ষেপের সাথে শুনে চলছিলেন। প্রায় দু' ঘন্টা পথ চলার পর একটি বড় শহরের আলামত শুরু হলো। আমি ধারণা করলাম যে, এটি গ্রানাডার শহরতলী এলাকা হবে। কিন্তু একটু পরেই একটি মাইল ফলকে এ শহরের নাম 'লোজা' (Loja) অঙ্কিত দেখতে পাই। লেখা দেখে তো আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে যাই। কারণ, আমার ধারণা হলো যে, এটি স্পেনের প্রসিদ্ধ শহর

'লোশা'–এর বিকৃত রূপ। পরবর্তীতে যাচাই করার পর আমার এ ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়। এটিই সেই 'লোশা' শহর, যার আলোচনা আমি কতবার যে বিভিন্ন গ্রন্থে পড়েছি, তার ইয়ত্তা নেই। স্পেনের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও মন্ত্রী 'লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব' (মৃত্যু ঃ ৭৭৬ হিজরী) এখানকারই অধিবাসী ছিলেন। এই সেই লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব, যাঁর রচিত গ্রন্থ—'আল ইহাতা ফী আখবারি গারনাতা'–কে গ্রানাডার প্রামাণ্য ইতিহাসগ্রন্থ মনে করা হয়। যার আলোচনায় 'মুকরী' তাঁর দশ ভলিউমের অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'নাফহুত তীব' রচনা করেন। যা পরবর্তীতে সমগ্র স্পেনের রাজনীতি, জ্ঞান–বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সভ্যতার উৎকৃষ্টতম ইতিহাস হিসেবে পরিগণিত হয়।

এই সেই লোশা, যাকে মুসলমানদের শাসনকালে গ্রানাডা প্রদেশের অত্যন্ত উন্নত ও সুপ্রসিদ্ধ শহর মনে করা হতো। এ শহর থেকে জ্ঞান ও সাহিত্যের অনেক মহিরুহ জন্ম নিয়েছে। মুসলমানদের পতনকালে ঈসায়ীদের সঙ্গের লড়াইসমূহে বীরত্ব ও প্রাণদানের কত উপাখ্যান যে এখানে রচিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ক্যাষ্টলের ক্যাথলিক রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড ৮৮৭ হিজরীতে (১৪৮২ ঈসায়ী) এই শহর আক্রমণ করলে শায়েখ আলী আল আত্তারের নেতৃত্বে মাত্র তিন হাজার স্বেচ্ছাসেবক মুজাহিদ রাজা ফার্ডিন্যাণ্ডের সম্মুখে দৃঢ়তার ও অবিচলতার অপ্রতিরোধ্য প্রাচীর খাড়া করে। নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবক মুজাহিদদল ফার্ডিন্যাণ্ডের পঙ্গপালের ন্যায় বিশাল সেনাবাহিনীকে পিছপা হতে বাধ্য করে। তাঁরা মাথার ঘাম এবং দেহের তপ্ত খুন ঢেলে দিয়ে এ শহর রক্ষা করে। কিন্তু এ ঘটনার মাত্র চার বছর পর ফার্ডিন্যাণ্ড পুনরায় এই শহর আক্রমণ করে। এবার ফার্ডিন্যাণ্ডের সঙ্গে তীর–তরবারীর চে' অধিক ছিল ধোকা–প্রতারণা এবং অভ্যন্তরীণ গাদ্দারদের ষড়যন্ত্রের হাতিয়ার। যার পরিণতিতে শহরটি গ্রানাডারও আগে মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। এমনকি তার নাম জানার জন্যও আজ পুস্তকের পাতা উল্টাতে হয়।

গ্রানাডা লোজা থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে অবস্থিত। লোজা থেকে রওয়ানা হওয়ার পর আধা ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে আমরা গ্রানাডার শহরতলী এলাকায় প্রবেশ করি। শহরে প্রবেশ করলাম ঠিকই, কিন্তু

আমাদের সেখানকার না কোন পথঘাটও জানা ছিল এবং না কোন হোটেলের ঠিকানা জানা ছিল। এক চৌরাস্তায় গাড়ী খাড়া করে নিকটবর্তী একটি দোকান থেকে কোন একটি হোটেলের ঠিকানা জানতে গিয়ে তাদের ভাষা জানা না থাকার কারণে বিফল হই। ইংরেজী বোঝে এমন লোক এখানে খুব কমই দেখা যায়। সমগ্র ইউরোপেই প্রায় এ অবস্থা যে, বৃটেন ছাড়া আপনি ইউরোপের যে কোন দেশেই যান না কেন, সেখানকার অধিবাসীরা শুধু যে ইংরেজী জানে না তাই নয়, বরং ইংরেজী বলা তারা পছন্দও করে না। প্রত্যেক দেশের লোক তাদের নিজেদের ভাষায় কথা বলে এবং এজন্য গর্ববোধ করে। পরাধীনতার এই হীন মানসিকতা তো কেবল আমাদের এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহে পাওয়া যায় যে, এসব দেশে ইংরেজীকে জ্ঞান ও উৎকর্ষতার মানদণ্ড মনে করা হয়। ইংরেজী বলতে ও লিখতে পারাকে গর্বের বিষয় মনে করা হয়। এমনকি এর খাতিরে নিজেদের উৎকৃষ্টতর ভাষার রূপ পর্যন্ত বিকৃত করে ফেলেছে। কোন যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়াই তাতে ইংরেজী শব্দ ঢুকিয়ে নিজ মাতৃভাষাকে ভুলে বসেছে।

যা হোক, নিকটবর্তী কোন দোকানে ইংরেজী ভাষায় কথা বলতে পারে এমন কোন লোক পেলাম না। তখন সাঈদ সাহেব বললেন ঃ কিছু দূরে আমি একটি পর্যটন কেন্দ্র দেখেছি, সেখানে ইংরেজী জানা কোন লোক অবশ্যই থাকবে। তাই তিনি গাড়ী থেকে নেমে তথ্য সংগ্রহের জন্য সেখানে চলে গেলেন। গাড়ী অনুপযুক্ত স্থানে দাঁড় করানো হয়েছিল বিধায় আমি গাড়ীতেই বসে চারপাশ দেখতে থাকি। তখন যে সড়কটিতে আমাদের গাড়ী দাঁড় করানো ছিল তার নাম Alpojara Road লেখা দেখতে পাই। এটি নিশ্চয়ই 'আলফাজারা' এর বিকৃত রূপ। যা ছিল গ্রানাডার একটি প্রাচীন এলাকা।

স্পেনের বর্তমান কালের নামসমূহের মধ্যে যতগুলো নাম 'আল' দিয়ে শুরু হয়েছে, তার সব কয়টির মূলই আরবী এবং একটু চিন্তা করলেই তার আসল আরবী নাম সহজেই বোঝা যায়।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সায়ীদ সাহেব হোটেলের তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে এলে জানতে পারি যে, গ্রানাডার সবচে' বড় হোটেল, 'হোটেল লুজ' (Luz

Hotel)। হোটেলটি এখান থেকে বেশী দূরে নয়। সামান্য অনুসন্ধানেই আমরা সেটি পেয়ে যাই। হোটেলের ভূগর্ভে পার্কিংয়ের যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। সেখানে গাড়ী রেখে আমরা হোটেলে চলে আসি। একাদশতম তলায় আমরা অবস্থান করি। আমরা আমাদের কক্ষের বেলকুনি দিয়ে বাইরে তাকালে গ্রানাডা শহরের বড় একটি অংশ দেখতে পাই। সেখানে পুরাতন ধাঁচের কিছু ভবনও দেখা যাচ্ছিল। এ সমস্ত ভবনের পশ্চাতে 'সেরানুভিদা' পর্বতের তুষারাচ্ছাদিত চূড়াসমূহ আমাদের নজর কাড়ছিল। গ্রানাডা শহর সেরানুভিদা পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত। বরফাচ্ছাদিত এ সমস্ত পাহাড় সম্মুখের বিস্তৃত এ উপত্যকায় জগতের শিক্ষণীয় কত পরিবর্তনই যে অবলোকন করেছে তার ইয়াত্তা নেই। কত বিজয়ীর আনন্দ মিছিল, কত পরাজিতের শবাধার এবং কত সভ্যতার আনন্দবাদ্য সহকারে আগমন এবং পরিশেষে শোক ও বিলাপের গর্ভে তার বিলুপ্তি সেরানুভিদা'র এ সমস্ত চূড়া বহু শতাব্দী ধরে দেখে আসছে। তার মধ্যে বাকশক্তি থাকলে সে বলত ঃ

بازیچہ اطفال ہے دنیا مرے آگے
ہوتا ہے شب روز تماشا مرے آگے

'আমার দৃষ্টিতে এ পৃথিবী ছেলেখেলা মাত্র।
দিবস-রজনী আমার সম্মুখে কৌতুক চলছে মাত্র।'

রোমান ভাষায় গ্রানাডা বলা হত আনারকে। কোন অজানা সম্পর্কের কারণে এ শহরের নাম গ্রানাডা রাখা হয়েছিল। মুসলমানগণ প্রথম যখন স্পেন জয় করে, তখন এ নামের কোন শহর এখানে ছিল না। বর্তমানে যেখানে গ্রানাডা শহর অবস্থিত, তখন একে 'আলবীরা' বলা হত। আনুমানিক হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রানাডা শহর আবাদ করা হয়। তখন 'আলবীরা' শহর গ্রানাডার মধ্যে একীভূত হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ শহরই গ্রানাডা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তখন থেকে এ শহর স্পেনের সর্বাধিক উন্নত, সুন্দর ও আধুনিক শহর বলে বিবেচিত হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জলবায়ু, খনিজ ও মানব সম্পদ মোটকথা সর্বদিক থেকে একে ভূ-স্বর্গ মনে করা হতো। এ শহরের একপ্রান্তে ছিল সেরানুভিদা'র চূড়াসমূহ, যা

'জাবাল আশশিলয়া'রের পর্বতসারির একাংশ। আর অপরপ্রান্তে প্রবাহিত ছিল এক মনোরম নদী, যাকে 'শানিল' নদী বলা হত। বর্তমানে তাকে Xenil বলা হয়। এই সেই নদী, যার সম্পর্কে লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব সেই সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যপূর্ণ বাক্যটি বলেছিলেন—

و ما لمصر تفخر بنيلها ، والف منه فى شنيلها

'মিসর তার 'নীল' নদ নিয়ে কি করে গর্ব করতে পারে? কারণ, গ্রানাডার 'শানীল' নদীর মধ্যে এমন এক হাজার নীল নদ নিহিত রয়েছে।'

এ বাক্যে মজার ব্যাপার এই যে, পশ্চিমাদের নিকট 'শীন' অক্ষরের বর্ণ মান এক হাজার। আর 'নীল' শব্দের উপর 'শীন' অক্ষর বাড়ালে 'শানীল' হয়। এ থেকে লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীব এই রহস্য উদঘাটন করেছেন যে, তাহলে 'শানীলের' মর্যাদা নীলের উপর এক হাজার গুণ বেশী।

পাহাড় ও নদী ছাড়াও এ শহর সুদর্শন পুষ্প–কানন, সবুজ–শ্যামল উপত্যকা এবং নজরকাড়া জলপ্রপাতসমূহের সমন্বয়ে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের এক লীলাভূমি ছিল। লিসানুদ্দীন ইবনুল খতীবই এ শহরের প্রশস্তি গেয়ে বলেছিলেন—

بلد تحف به الرياض كانه
وجه جميل والرياض عذاره
وكانما واديه معصم غادة
ومن الجسور المحكمات سواره

"শহরটিকে চতুর্দিক থেকে পুষ্পোদ্যানসমূহ ঘিরে রেখেছে। ফলে এমন মনে হয় যে, শহরটি একটি সুদর্শন মুখমণ্ডল, আর পুষ্পোদ্যানসমূহ তার কান্তিময় গণ্ডদেশ। তার নদীসমূহ কোন লাবণ্যময়ীর হাতের বাহু। আর নদীর পুলসমূহ যেন সেই বাহুর চুড়ি।"

প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকেও অঞ্চলটি বড় সম্পদশালী ছিল। এখানে স্বর্ণ, চাঁদি, সীসা ও লোহার খনি ছিল। তুত এবং রেশমও উৎপন্ন

হতো। বনে-জঙ্গলে নানা রকমের সুগন্ধিযুক্ত কাঠও পাওয়া যেত। মোটকথা, আল্লাহ পাক এ ভূখণ্ডকে সর্বপ্রকার প্রাচুর্য দ্বারা সমৃদ্ধশালী করেছিলেন। আর এ কারণেই এ শহরটি বহুদিন পর্যন্ত স্পেনে মুসলমানদের রাজধানী ছিল। যখন স্পেনের অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানদের পতাকা ভূলুণ্ঠিত হয়, তখন সমগ্র স্পেনের মুসলমানগণ এটিকে নিজেদের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল বানায়। এভাবে তার বসতি এলাকা অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং এটি স্পেনের সর্বাধিক উন্নত শহরে পরিণত হয়। এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন উন্নত চর্চা হয় যে, এখানকার শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ফলে খৃষ্টান ইউরোপের রাজ পরিবারের লোকেরা পর্যন্ত এখানে শিক্ষালাভ করাকে নিজেদের জন্য গর্বের বিষয় বলে মনে করত।

মুসলমানগণ আটশ' বছরের অধিককাল ধরে এখানে শাসনকার্য চালায়। এখানে তারা সভ্যতা ও সংস্কৃতির এমন প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে, যা তৎকালীন পৃথিবীতে ছিল অতুলনীয়। কিন্তু পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্য যখন তাদেরকে ভোগ-বিলাসের পথ দেখালো এবং তাদের জীবনের উপর থেকে দ্বীন ও আখেরাতের ফিকিরের বন্ধন শিথিল হতে আরম্ভ করল, তখন সভ্যতা-সংস্কৃতির এ উত্থান তাদেরকে অধঃপতনের খাদে নিপতিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারলো না। যে গ্রানাডায় পৌঁছে একসময় অমুসলিম রাষ্ট্রদূতদের দৃষ্টিসমূহ ঝলসে উঠতো, সেই গ্রানাডাতেই আবু আবদুল্লাহ নগরীর চাবিসমূহ ফার্ডিন্যাণ্ড ও ইসাবেলার হাতে তুলে দিয়ে প্রাণ রক্ষা পাওয়াকেই নিজের সর্ববৃহৎ সফলতা মনে করল। এই সেই গ্রানাডা, যার চৌরাস্তাসমূহে আরবী গ্রন্থাবলীর আকৃতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্তূপসমূহ বহু সপ্তাহ ধরে জ্বলতে থাকে। যার মসজিদসমূহকে গীর্জায় পরিণত করা হয়। যেখানকার মুসলমানদেরকে তরবারীর জোরে খৃষ্টান বানানো হয়। যেখানকার নারীদের সম্ভ্রম লুণ্ঠন করা হয়। যেখানকার মুসলমানদের উপর এ ভূখণ্ডকে এত সংকীর্ণ করে দেওয়া হয় যে, কিছুকাল পর এখানে কালিমার সাক্ষ্যদাতা কোন মুসলমানের নাম-গন্ধও অবশিষ্ট থাকেনি। মুসলমানদের উত্থান ও পতনের এমন বেদনাবিধূর ঘটনা সম্ভবতঃ পৃথিবীর অন্য কোন ভূখণ্ডে ঘটেনি। আমি আর সাঈদ

সাহেব হোটেলের বেলকুনীতে দাঁড়িয়ে 'সেরানুভিদা' এবং তার পাদদেশে বিস্তৃত শহরকে দেখছিলাম, আর কল্পনার চোখে এ সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিচ্ছবি তরঙ্গায়িত হচ্ছিল। অবশেষে আমাদের সম্মুখে সূর্য অস্তমিত হল।

আমাদের দুপুরবেলা যথারীতি খাবার খাওয়া হয়নি, তাই কিছুটা ক্ষুধা অনুভূত হচ্ছিল। নীচে নেমে কোন হালাল খাদ্য সন্ধান করার ইচ্ছা করলাম। আমাদের হোটেলের রেস্তোরাঁ তখনো খোলেনি। তাই চিন্তা করলাম যে, পার্শ্ববর্তী কোন রেস্তোরাঁয় কিছু খুঁজে দেখি। এ উসিলায় শহরও কিছুটা ঘুরে দেখা যাবে। তাই আমরা হোটেল থেকে বের হয়ে আসি। এটি ছিল শহরের মধ্যভাগের উজ্জ্বল, ফ্যাশনেবল ও ব্যস্ততম এলাকা। নিকটবর্তী যে রেস্তোরাঁতেই যাই, সেখানেই জানতে পারি যে, রাত আটটার পূর্বে তা খাওয়ার জন্য খোলা হবে না। যে মেইন রোডের উপর আমাদের হোটেল অবস্থিত, আমরা সেই রোড ধরেই চলতে থাকি, সম্মুখে কিছুদূর গিয়ে একটি বোর্ড দেখতে পাই। তাতে 'আলহামরা' (Al-Hamra) লেখা ছিল। তার সঙ্গে একটি তীর চিহ্ন দিয়ে আলহামরা যাওয়ার পথ নির্দেশ করা হয়েছে। আমরা সেই তীর চিহ্ন ধরে চলতে থাকি। আরো একটু অগ্রসর হওয়ার পর সম্মুখে একটি চৌরাস্তা আসে। সেখান থেকে আলহামরার দিকনির্দেশকারী বোর্ডটি ডানদিকে দিকনির্দেশ করছিল। আমরা সেদিকেই ঘুরে যাই। এ সড়কটি তুলনামূলক ছোট। সড়কের উভয়দিকে দোকানের দীর্ঘ সারি। তার ডানে বামে প্রাচীন ধাঁচের বহুসংখ্যক ছোট ছোট গলি রয়েছে। যেগুলোর নির্মাণশৈলী প্রাচীনতার সাক্ষ্য দিচ্ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল যে, এটি গ্রানাডার প্রাচীন এলাকা। এ সড়কেরই একটি কফি হাউসে আমরা চা পান করি। তারপর আমরা প্রাচীনকালের কোন স্মারকের সন্ধানে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকি।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর প্রাচীন ধাঁচের একটি চৌরাস্তার একপাশে প্রস্তর নির্মিত বিশাল একটি পুরাতন ভবন দৃষ্টিগোচর হয়। ভবনটি আশপাশের সমস্ত ভবনের মধ্যে সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ছিল। তার চূড়ায় সে রকমেরই একটি তিন কোণ বিশিষ্ট সুউচ্চ মিনার ছিল, মালাগা থেকে আসার পথে যে রকম মিনার আমরা বহু স্থানে

দেখেছিলাম। নির্মাণ পদ্ধতি থেকেই অনুমিত হচ্ছিল যে, এটি বিশাল কোন মসজিদ হবে। আমরা অবর্ণনীয় আবেগ ও আগ্রহ নিয়ে ভবনটির দিকে অগ্রসর হই। ভবনটির দরজায় দু' তিনজন ভিক্ষুক বসে ভিক্ষা মাগছিল। খয়েরী রংয়ের মজবুত কাঠের তৈরী ভবনের প্রধান ফটকটি বন্ধ দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ফটকের পাল্লার মাঝে এমন একটি খিড়কি দরজা খোলা ছিল, যার মধ্যে দিয়ে মাথা নীচু করে ভিতরে প্রবেশ করা যায়। আমরা ভিতরে প্রবেশ করে একটি অন্ধকার বারান্দা দেখতে পাই। বারান্দার ডান ও বাম দিক দিয়ে ভবনের ভিতরে প্রবেশ করার বড় দরজা রয়েছে। বামদিকের দরজাটি বন্ধ থাকলেও ডানদিকের দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল। আমরা সেই দরজা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখি, সেটি একটি গির্জা। একদল খৃষ্টান সেখানে তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করছে।

আমরা ভবনের বাইরে চলে আসি, কিন্তু আমাদের অন্তর সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, এটি পূর্বে কোন মসজিদ ভবন ছিল, পরে তা গির্জায় পরিণত করা হয়েছে। অনুসন্ধান করার পর আমাদের ধারণাই সঠিক প্রমাণিত হয়। ভবনটি মূলতঃ গ্রানাডার জামে মসজিদ ছিল। এক সময় এটি ছিল গ্রানাডা শহরের সর্ববৃহৎ জামে' মসজিদ। অন্তরে বেদনার তীব্র আঘাত পেলাম। যে মহান মসজিদে তাউহীদের অনুরক্তগণ বহু শতাব্দীকাল আপন রবের দরবারে ভক্তির সেজদা নিবেদন করত, যেখান থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান ধ্বনি ঘোষিত হয়ে আকাশকে আলোয় উদ্ভাসিত করত, আজ সেখানে কুফর ও শিরকের অন্ধকার ছায়া তরঙ্গায়িত হচ্ছে।

پوشیدہ تری خاک میں سجدوں کے نشاں ہیں
خاموش اذانیں ہیں تری باد سحر میں

"তোমার মাটিতে সেজদার চিহ্ন লুকিয়ে আছে।
তোমার প্রভাত-বায়ুতে আযান ধ্বনি লুকিয়ে আছে।"

যে সমস্ত খৃষ্টান মুসলমানদের হাত থেকে স্পেনের রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছিল, তারা চরম পর্যায়ের সাম্প্রদায়িক, সংকীর্ণমনা ও কলুষিত

চিন্তা-চেতনার অধিকারী খৃষ্টান ছিল। তারা এখানে ক্ষমতায় আসার অল্পদিন পরেই দেশের প্রতিটি মসজিদকে গীর্জায় পরিণত করার নির্দেশ জারি করে। যার ফলে স্পেনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বড় জামে' মসজিদকে গীর্জায় পরিণত করা হয়। সেই সূত্রে মহান এ মসজিদটিও সেই অন্যায় নির্দেশের শিকার হয়। শুধু এতটুকুতেই শেষ নয়, বরং গ্রানাডা বিজয়ী খৃষ্টান ফার্ডিন্যাণ্ড ও ইসাবেলার কবর পর্যন্ত এই মসজিদের মধ্যেই বানানো হয়েছে। এমন হীন সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনার আগ্রাসনে আজ এ ভূমিতে একটি মসজিদও অবশিষ্ট নেই।

কতিপয় পশ্চিমা লেখক মসজিদসমূহকে গীর্জায় পরিণত করার খৃষ্টানদের এ হীনকর্মের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছে যে, এটি মূলতঃ খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধমূলক তৎপরতা ছিল। কারণ, মুসলমানরা তাদের অনেক বিজিত এলাকাতে গীর্জাসমূহকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে, যার প্রতিউত্তরে খৃষ্টানরা স্পেনে সেই একই কাজ করে মসজিদসমূহকে গীর্জায় পরিণত করেছে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে এমনতর উত্তর দেওয়া সত্য ও ন্যায়ের সঙ্গে চরম অবিচার করা মাত্র। তার কারণ—

প্রথমতঃ, মুসলমানদের পক্ষ থেকে গীর্জাসমূহকে মসজিদে পরিণত করার ঘটনা ইতিহাসে খুব কমই ঘটেছে। স্পেনে মসজিদসমূহের সঙ্গে যে নির্দয় আচরণ করা হয়েছে যে, সমগ্র স্পেনে কোন একটি মসজিদেরও নাম-গন্ধ বাকি রাখা হয়নি—এর কোন দৃষ্টান্ত মুসলমানদের হাতে বিজিত কোন দেশে পাওয়া যায় না। ইসলামী শরীয়তের বিধান এই যে, যে এলাকা মুসলমানগণ সন্ধির মাধ্যমে নয়, বরং লড়াই করে তরবারীর জোরে জয় করবে, শরীয়তের আলোকে সেখানকার ভূমি ও ভবনসমূহের উপর তাদের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সে অধিকারের মধ্যে এটিও একটি যে, প্রয়োজনবশতঃ তারা অমুসলিমদের কোন উপাসনালয় ধ্বংস করতে পারবে বা মসজিদে পরিণত করতে পারবে। এতদসত্ত্বেও মুসলমান বিজয়ীগণ শরীয়তপ্রদত্ত এ অধিকার খুব কমই প্রয়োগ করেছেন। কতক স্থানে প্রয়োজনের খাতিরে কিংবা কোন কল্যাণের নিমিত্তে গীর্জাকে মসজিদে পরিণত করা হলেও অমুসলিমদের

অনেক উপাসনালয়কেই অক্ষত রাখা হয়েছে।

তবে যে সমস্ত এলাকা সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, বিশেষতঃ যেখানে অমুসলিমদের সঙ্গে তাদের উপাসনালয়সমূহ অক্ষত রাখার অঙ্গিকার করা হয়েছে, সে সমস্ত এলাকার উপাসনালয়সমূহকে জোর–জবরদস্তি ধ্বংস করার কিংবা মসজিদে পরিণত করার কোন একটি ঘটনাও ইতিহাসে আমি পাইনি।

পক্ষান্তরে গ্রানাডাকে খৃষ্টানরা লড়াইয়ের মাধ্যমে নয়, বরং একটি লিখিত চুক্তির ভিত্তিতে সন্ধির মাধ্যমে জয় করে। ফার্ডিন্যাণ্ড ও ঈসাবেলা আবু আবদুল্লাহর নিকট থেকে আলহামরা দখল করার পূর্বে একটি লিখিত চুক্তিপত্রের উপর তারা স্বাক্ষর করেছিল। চুক্তিপত্রটিতে সাতষট্টি দফা উল্লেখিত ছিল। সেই চুক্তিপত্রের শর্তাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত ছিল—

১. প্রত্যেক মুসলমান—চাই সে ধনী হোক বা গরীব হোক—তাদের জানমালের কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা হবে না এবং তারা যেখানে ইচ্ছা বসবাস করার ব্যাপারে স্বাধীন থাকবে।

২. মুসলমানদের ধর্মীয় বিষয়সমূহে খৃষ্টানরা হস্তক্ষেপ করবে না এবং ধর্মীয় অনুশাসন পালনে কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করবে না।

৩. মসজিদ এবং ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তিসমূহ যথাপূর্ব বহাল থাকবে। কোন খৃষ্টান মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না।

৪. মুসলমানদের ব্যাপারগুলোতে শরীয়তের বিধানসমূহ মেনে চলা হবে।

৫. যে সমস্ত খৃষ্টান মুসলমান হয়েছে, তাদেরকে পুনরায় খৃষ্টান হওয়ার জন্য বাধ্য করা হবে না। আর যদি কোন মুসলমান খৃষ্টান হতে চায় তাহলে একজন মুসলমান এবং একজন খৃষ্টান বিচারক তার সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখবে যে, এ ব্যাপারে তার উপর কোনরূপ চাপ তো প্রয়োগ করা হয়নি।[১]

---

১. চুক্তিপত্রের শর্তাবলীর এ তালিকা অতি দীর্ঘ। এখানে কয়েকটি মাত্র শর্ত উল্লেখ করা হলো। বিস্তারিত জানার জন্য 'নাফহুত তীব' খণ্ড–৬, পৃঃ ২৭৭ এবং উর্দূতে নবাব যুলকদর জং কৃত 'খেলাফতে উন্দুলুস' পৃঃ ২৯৯ দ্রষ্টব্য।

এ সমস্ত শর্তের উপর স্বাক্ষর করার পর এ চুক্তিপত্রকে নিষ্প্রাণ একটি কাগজ–টুকরার অধিক মর্যাদা প্রদান করা হয়নি। চুক্তিপত্রের একটি শর্তও এমন ছিল না, সম্পূর্ণ নির্লজ্জ ও খোলামেলাভাবে যার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়নি। ফার্ডিন্যাণ্ড, ঈসাবেলা এবং সে সময়ের খৃষ্টান পাদ্রীদের চোখে সাম্প্রদায়িকতার দুর্গন্ধময় পট্টি বাঁধা ছিল। কিন্তু বড় বিস্ময় জাগে ঐ সমস্ত তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' ঐতিহাসিকদের উপর, যারা সত্য, ন্যায় ও মানবতা বিধ্বংসী এই পদদলনের মধ্যেও যুক্তি বা ন্যায়বিচারের কোন চিহ্ন সন্ধান করার ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। এ সমস্ত ঘটনার সঠিক কোন ব্যাখ্যা হতে পারলে তা' কেবলমাত্র এই যে, এটি মুসলমানদের পাপের ফল, তা ছাড়া আর কিছু নয়।

যাই হোক, বেদনা ও শিক্ষার এক জগত অন্তরে ধারণ করে আমরা ভবনটি অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হই এবং পুনরায় আলহামরার দিক–নির্দেশকারী তীরচিহ্নের অনুসরণ করে পথ চলতে থাকি। এভাবে একের পর এক অনেকগুলো সড়ক ও গলিপথ অতিক্রম করি। এ এলাকার সম্পূর্ণটি গ্রানাডার প্রাচীন এলাকা। এক জায়গায় আরো একটি বিশাল প্রাচীন ভবন দেখতে পাই। এখানে কিছু তরুণ ভিড় করেছিল। তথ্য নিয়ে জানতে পারলাম যে, এটি একটি ইউনিভার্সিটি, যার নাম Al-Madraza। যা 'আল–মাদরাসা'–এর বিকৃত রূপ। মুসলমানদের শাসনকালে এটি গ্রানাডার সর্ববৃহৎ মাদরাসা ছিল। যেখানে শুধু গ্রানাডারই নয়, বরং দূর দূরান্তের পশ্চিমা দেশসমূহের ছাত্ররাও শিক্ষা লাভ করত। আল্লাহই ভাল জানেন, আমাদের ইতিহাসের কত বড় বড় আলেম এখানে জ্ঞান–গরিমার সাগর প্রবাহিত করেছেন। এখন যাঁদের সংখ্যা ও নাম সম্পর্কেও অবগত হওয়া সম্ভবপর নয়। কল্পনার চোখে আল্লামা শাতিবী (রহঃ), ইবনুল খতীব (রহঃ) ও আবুল হাসান ইবনুল ইমাম (রহঃ)এর ন্যায় মহান পণ্ডিত ও সাহিত্যিক আলেমগণকে এখানে আনাগোনা করতে দেখতে পাই।

পরবর্তীতে গ্রানাডার পরিচিতিমূলক একটি পুস্তিকায় জানতে পারি যে, ইসলামী যুগে এ ভবনটি গ্রানাডার সুন্দরতম ভবনসমূহের মধ্যে গণ্য হতো। এর প্রধান ফটক ছিল মর্মর পাথরের তৈরী। তাতে খুরের আকৃতির

একটি মেহরাব ছিল। ছাদ ছিল বড় মনোহরী কারুকার্য খচিত। খিড়কীসমূহে আরবী লিপি উৎকীর্ণ ছিল। সেই পুস্তিকায় এ কথাও লেখা হয়েছে যে, এটি মুসলমানদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশাল একটি ইউনিভার্সিটি ছিল। যেখানে ইবনুল ফাজ্জার, ইবনে মারযুক, আবুল বারাকাত, বালকিনী, ইবনুত তাউসী ও ইবনু ফিফার ন্যায় ব্যক্তিত্ব শিক্ষার্জন করেন। প্রথম সুলতান ইউসুফ এ মাদরাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে খৃষ্টানদের শাসনকালে প্রথম চার্লস ১৫২৬ ঈসায়ীতে একে একটি আধুনিক ইউনিভার্সিটির রূপ দান করেন এবং এর ভবনসমূহেও পরিবর্তন সাধন করেন।

'আল মাদরাসা' থেকে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আঁকাবাঁকা বহু গলিপথ অতিক্রম করে আমরা পুনরায় সেই মহাসড়কে চলে আসি, যেটি আমাদের হোটেলের দিক থেকে এসেছে। বড় একটি চত্বরের মাথায় এসে সড়কটি শেষ হয়েছে। চত্বরটির ঠিক মাঝ বরাবর একটি ভাস্কর্য দাঁড়িয়ে আছে এবং একটি ফোয়ারা প্রবাহিত হচ্ছে। চত্বরটির নাম Bibrambla। অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম যে, মুসলমানদের যুগে এটি গ্রানাডার সর্ববৃহৎ চত্বর ছিল। একে 'ময়দানু বাবির রামলা' বলা হতো। Bibrambla তারই বিকৃত রূপ। এই চত্বর থেকে বেশ কয়েকটি সড়ক বিভিন্ন দিকে চলে গেছে। ঐ সমস্ত সড়কের নামও প্রাচীন। যেমন একটি সড়কের নাম Zacatin, যার মূল নাম 'শারে' আস সাকাতীন' ছিল। অপর একটি সড়কের নাম Boabdil, যাকে 'শারে' আবু আবদুল্লাহ' বলা হতো।

এখান থেকে আলহামরার দিকনির্দেশকারী তীর বামদিকে দিকনির্দেশ করছিল। আমরা সে দিকেই ঘুরে যাই। সড়কটি বেশ প্রশস্ত, কিন্তু কিছু দূর সম্মুখে যাওয়ার পর সড়কের মাঝখানে নির্মিত একটি ভবনের বাম দিয়ে অতিক্রম করে সড়কটি সংকীর্ণ হয়ে সম্মুখে চলে গেছে। সেই সংকীর্ণ সড়কের মুখে একটি বোর্ড বসানো ছিল। তাতে জানতে পারি যে, সড়কটি Albaicin যাচ্ছে।

Albaicin মূলতঃ গ্রানাডার প্রাচীন মহল্লা 'হাই আল বায়াযীন' এর বিকৃত রূপ। এটি গ্রানাডার প্রসিদ্ধ ও ঐতিহাসিক একটি মহল্লা ছিল। বলা হয় যে, মুসলিম শাসনকালের বহু নিদর্শন এই মহল্লায় এখনো

পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে এসে সড়কটি কিছুটা অন্ধকার হয়ে গিয়েছে, তাছাড়া 'হাই আল বায়াযীন' এখান থেকে কত দূরে তাও আমাদের জানা ছিল না, তাই আমরা আর সম্মুখে অগ্রসর না হয়ে সেখান থেকেই ফিরে আসি। এখান থেকে বাম দিকে 'আলহামরার' দিকে সংকীর্ণ একটি গলিপথ চলে গেছে। সেই গলির দিকে মোড় নিয়ে দেখতে পাই যে, তা একটি পাহাড়ের উপর উঠে যাচ্ছে। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, 'আলহামরা' এখান থেকে প্রায় এক-দেড় মাইল দূরে। বিকাল পাঁচটায় তা' বন্ধ হয়ে যায় এবং সকাল সাড়ে নয়টায় পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এ সময় আলহামরা যাওয়া আমাদের লক্ষ্য ছিল না। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, এর সময় ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহ করা এবং শহরের এই প্রাচীন এলাকাটি ঘুরে দেখা। বিধায় আমরা ঐ গলিরই একটি দোকান থেকে গ্রানাডার পরিচিতি সংক্রান্ত সেই পুস্তিকাটি ক্রয় করি, যার উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। তারপর হোটেলে ফিরে আসি।

আলহামরায়

পরদিন সকালে নাস্তার পর আমরা অবিলম্বে একটি ট্যাক্সি ক্যাব যোগে 'আলহামরা' ভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। রাতে আমরা পায়ে হেঁটে যে সড়ক পর্যন্ত এসেছিলাম, সেখান থেকে সড়কটি ক্রমান্বয়ে পাহাড়ের উপর উঠে গেছে। ট্যাক্সিক্যাবটি সেই সড়ক ধরে পাহাড় চূড়ায় আরোহণ করে আমাদেরকে আলহামরার ফটকের সম্মুখে নামিয়ে দেয়।

জমকালো বিশাল এই ঐতিহাসিক দূর্গটি চতুর্থ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। তারপর থেকে গ্রানাডার বিভিন্ন শাসক তাতে সংযোগ ও বিয়োগ করতে থাকে। অবশেষে মুহাম্মাদ বিন আল আহমার আননাসরী ৬৩৫ হিজরীতে তাতে অনেক কিছু সংযোগ করে তাকে রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ভবনের রূপ দান করেন। তারপর হিজরী সপ্তম শতাব্দীর শেষের দিকে তদীয় পুত্র মুহাম্মাদ বিন আহমার—যিনি 'গালিব বিল্লাহ' উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন—এখানে 'আলহামরা' নামে প্রসিদ্ধ শাহী মহলটি নির্মাণ করেন। তাঁর সন্তানগণ মহলটিতে নানাপ্রকারের নতুনত্ব সৃষ্টি করে একে সে যুগের প্রকৌশল শিল্পের এক রাজকর্মে পরিনত করেন।

আলহামরার সম্পূর্ণ এলাকাটি—যার মধ্যে কেল্লা, শাহী মহল ও উদ্যান ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে—দৈর্ঘ্যে ৭৩৬ মিটার এবং প্রস্থে প্রায় দু'শ মিটার। তার চতুর্দিকে একটি মজবুত প্রাচীর রয়েছে, যার কিছু অংশে এখনো অক্ষত রয়েছে। ট্যাক্সিটি সেই প্রাচীরাভ্যন্তরের বিভিন্ন মনোরম উদ্যানসমূহ অতিক্রম করে আমাদেরকে সেই জায়গায় নিয়ে এসেছিল, যেখান থেকে কেল্লা ও শাহী মহলের মূল ভবনসমূহ আরম্ভ হয়েছে। আমরা সেখানে পৌঁছে জানতে পারলাম যে, এখনো কেল্লার ফটক বন্ধ রয়েছে। পনের মিনিট পর তা' খোলা হবে। আলহামরার আলোচনা ছোটকাল থেকে ইতিহাস গ্রন্থসমূহে পাঠ করে আসছিলাম—তা' আজ শিক্ষার মূর্তপ্রতীকরূপে আমাদের চোখের সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিল। আলহামরা ছিল وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ 'যাকে ইচ্ছা তুমি সম্মানিত কর এবং যাকে ইচ্ছা তুমি লাঞ্ছিত কর।' (আলে ইমরান ঃ ২৬) –এর ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য এক জীবন্ত তাফসীর।

এই ভবনটির ভিতর ও বাহিরকে ঔদ্ধত্য ও অহংকারের কত মূর্ত প্রতীক 'কে আছে আমি ছাড়া?' শ্লোগানে প্রকম্পিত করেছে! কত অহংকারীর অহংকার তার চৌকাঠের উপর ধূলায় মিশে গেছে! এখানে কত মস্তকে রাজমুকুট স্থাপন করা হয়েছে! কত মুকুটধারীর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে! ইতিহাসের কত রহস্য যে এ ভবন তার পরতে পরতে লুকিয়ে রেখে আজো দাঁড়িয়ে আছে এবং প্রত্যেক দর্শনার্থীকে শিক্ষা ও দিব্যদৃষ্টির পাঠদান করছে, তার ইয়ত্তা নেই।

কিছু সময় পর কেল্লার ফটক উন্মুক্ত করা হয়। আমরাই সর্বপ্রথম তাতে প্রবেশ করি। ভগ্ন ভবনসমূহ পদে পদে অতীতকালের দাস্তান শুনাচ্ছিল। ফটকের অদূরেই ঐতিহাসিক 'বুরুজ আল হেরাসা' অবস্থিত। এটি আলহামরার সর্বোচ্চ বুরুজ। একে 'আল কাসবা'ও বলা হয়। এ বুরুজের চূড়াতেই এক সময় মুসলমানদের পতাকা সগৌরবে পতপত করে উড়ত। কিন্তু যখন গ্রানাডার সর্বশেষ শাসক আবু আবদুল্লাহ রূপার খাঞ্চায় করে আলহামরার চাবির 'উপঢৌকন' ফার্ডিন্যাণ্ডের সম্মুখে পেশ করে, তখন ফার্ডিন্যাণ্ড সর্বপ্রথম বিজয়ী পদক্ষেপ এই নেয় যে, বুরুজ আল হেরাসা থেকে মুসলমানদের পতাকা নামিয়ে পাদ্রীদের হাতে এখানে

একটি কাঠের ক্রুশ স্থাপন করে। সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এই ক্রুশ এখানে বসানো রয়েছে। যা আলহামরায় প্রবেশকারী একজন মুসলমান পর্যটকের অন্তরকে ছিদ্র করে করে চালনী বানিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

'বুরুজ আলহেরাসা'র এ অংশটি আলহামরার সামরিক ও প্রতিরক্ষার অংশ ছিল। তার আশেপাশেও সামরিক ধাঁচের ভবনসমূহের অনেক নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। 'আলহামরার' শাহী মহল এখান থেকে পূর্বদিকে কিছুটা দূরে অবস্থিত। সেখানে পৌঁছতে পথে অনেকগুলো পুরাতন ভবন ও ধ্বংসাবশেষের নিকট দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। কোথাও ছোট ছোট কক্ষের ভগ্ন প্রাচীর, কোথাও মোটা মোটা শিকের পিছনে নির্মিত অনেকগুলো কুঠুরি—যা হয়তো কয়েদখানা রূপে ব্যবহৃত হতো, কোথাও গভীর গভীর কূপ, কোথাও সুড়ঙ্গ এবং গুপ্ত পথ, কোথাও ওঠানামার সিঁড়ি, কোথাও প্রাচীরের উপরে নির্মিত প্রতিরক্ষা চৌকি, মোটকথা, একটি প্রতিরক্ষা দূর্গের পরিপূর্ণ চিত্র তার পূর্ণ প্রতাপের উপকরণ সহ বিদ্যমান রয়েছে। একসময় এখানে জনসাধারণের প্রবেশ করারও অনুমতি ছিল না, অথচ আজ এমন অনুভূত হয় যে, কিছু শিশু যেন গৃহস্থালীর খেলা খেলতে খেলতে হঠাৎ নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত হয়ে ঘরগুলোকে এলোমেলো করে ফেলে রেখে কোথাও চলে গিয়েছে।

সেনা দূর্গ এবং শাহীকেল্লার মধ্যবর্তী দূরত্ব অতিক্রম করার পর মহলের ভিতরে প্রবেশ করার জন্য আরো একটি ফটক রয়েছে। এই ফটক থেকে সেই জমকালো মহলসমূহ আরম্ভ হয়, যার রূপ-সৌন্দর্যের কারণে আলহামরা সমগ্র পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সর্বপ্রথম মহলের সেই অংশ সম্মুখে আসে, ইতিহাসে যাকে 'মা'সাদাহ' বা 'মারবাযুল আসওয়াদ' বলা হয়েছে। এটি সুদর্শন মেহরাব বিশিষ্ট চারটি বারান্দা দ্বারা বেষ্টিত একটি আঙ্গিনা, যার মাঝখানে একটি হাউজ রয়েছে। হাউজের নীচে চতুর্দিকে সিংহের ন্যায় ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে। যেগুলোর চোখ, নাক ও মুখমণ্ডলের প্রতিকৃতি সম্ভবতঃ ইচ্ছা করেই বানানো হয়নি, যেন তা মূর্তির রূপ ধারণ না করে। সেগুলোর মুখ থেকে ফোয়ারা রূপে পানি বের হয়ে থাকে। এটিকে মহলের অত্যন্ত সুদৃশ্য অংশ মনে করা হয়। তারই সংলগ্ন মহলের সেই অংশও রয়েছে, যাকে 'কাআতুস

সুফারা’ বলা হয়। সেখানে বাদশাহ্ বিদেশী দূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। এর প্রাচীরসমূহে সুন্দর হস্তলিপিতে ‘সূরায়ে মুল্‌ক’ সম্পূর্ণটি লেখা রয়েছে। এখানেই বেগমদের কক্ষসমূহ ও রাজকীয় বাথরুম রয়েছে। এখানকার সমস্ত ভবনেই অতি সুন্দর মর্মর প্রস্তর ব্যবহৃত হয়েছে। এতে পাথরের এত সুন্দর কারুকার্য করা হয়েছে যে, বর্তমানের যান্ত্রিক যুগেও পাথরকে এমন মোমে পরিণত করার কথা কল্পনা করাও কঠিন। প্রাচীর ও ছাদের সর্বত্র সুন্দর আরবী লিপিতে لا غالب الا الله (আল্লাহ ছাড়া কোন বিজয়ী নেই) লেখা রয়েছে। এটি বনী আহমরের প্রতীক ছিল, যা আলহামরার শেষ পরিণতি সম্পর্কে চূড়ান্ত মন্তব্যের মর্যাদা রাখে। কক্ষসমূহে পাথর কেটে স্পেনিশলিপিতে আরবী কবিতাও লেখা রয়েছে। যার পুরাটা পাঠ করার জন্যও দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। এখানেই সেই ‘কাআতুল উখতাইন’ (Two sisters Hall)ও রয়েছে। যা হুবহু একই রকম দু’টি মর্মর পাথর দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে। আর এজন্যই একে ‘কাআতুল উখতাইন’ বা ‘দু’ বোন হল’ বলা হয়।

গ্রানাডার শেষ মুকুটধারী আবু আবদুল্লাহর বেদনাক্লিষ্ট মাতা—যিনি আবুল হাসানের ন্যায় মুজাহিদ বাদশার বিবি ছিলেন এবং যিনি খৃষ্টানদের সঙ্গে আবু আবদুল্লাহর সুসম্পর্ক মোটেও সইতে পারতেন না—এ কক্ষেই থাকতেন। এখানকার বেশির ভাগ ভবনের উত্তর দিকের জানালাসমূহ গ্রানাডা শহরের দিকে উন্মুক্ত। এখান থেকে পাহাড়ের পাদদেশে বিস্তৃত গ্রানাডার প্রসিদ্ধ মহল্লা ‘হাই আল বায়াযীন’ সম্পূর্ণটা দেখা যেত। এখান থেকে মহলের অধিবাসীরা সবসময় শহরের সার্বিক পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করতে পারত।

শাহী মহলের এ সমস্ত ভবন সংলগ্ন বড় চমৎকার উদ্যানসমূহ তৈরী করা হয়েছিল। যার থেকে একদিকে সিরানুভিদার মনোহারী চূড়াসমূহ এবং অপরদিকে আলহামরার সুদর্শন ভবনসমূহের মনোরম দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হত। আজ যখন কিনা এ সমস্ত উদ্যান বিরান হয়ে পড়ে রয়েছে—এখনও একজন পর্যটক এর সৌন্দর্য দ্বারা পরিতৃপ্ত না হয়ে পারে না। আল্লাহই ভাল জানেন, এ সমস্ত উদ্যান যৌবনকালে কেমন অপূর্ব সৌন্দর্যের লীলাভূমিই না ছিল!

আলহামরার উত্তর-পূর্ব দিকে পৃথক একটি টিলার উপর আরেক সারি ভবন ও উদ্যান রয়েছে, যাকে 'জান্নাতুল আরীফ' (Generalife) বলা হয়। গ্রানাডার জনৈক শাসক এ অপূর্ব উদ্যানটি একটি শাহী বিনোদন কেন্দ্ররূপে বানিয়েছিলেন। সিরানুভিদার ঢালে মহলসদৃশ কয়েকটি ভবনের সমন্বয়ে এটি নির্মিত। ভবনসমূহের সম্মুখে নানা প্রকারের ও বিচিত্র ধরণের বৃক্ষ, চারা ও লতাগুল্মের সমন্বয়ে বড় অপরূপ সবুজ উদ্যান তৈরী করা হয়েছে। এই ভবনের প্রধান ফটক থেকে মহলের ভবন পর্যন্ত দীর্ঘ একটি পথ সম্পূর্ণটাই সবুজ লতার সমন্বয়ে নির্মিত হয়েছে। তার দেওয়াল, ছাদ এবং মাঝের মেহরাবসমূহ সবকিছুই সবুজ লতাগুল্মকে এমন নিপুণভাবে কেটে-ছেঁটে বানানো হয়েছে যে, মানুষ এর নির্মাতাদের সুরুচির প্রশংসা না করে পারবে না।

সুদৃশ্য এই মহল এবং তার সাথে স্পেনের আট শ' বছরের ইতিহাসকে খৃষ্টানদের করুণার উপর ছেড়ে যেতে মুসলমানদের অন্তরে কী অবর্ণনীয় বেদনাই না হয়েছে, তা' কল্পনা করতেও কলিজা ছিঁড়ে বের হয়ে আসতে চায়। আবু আবদুল্লাহ—যার নির্বুদ্ধিতা ও অযোগ্যতা গ্রানাডার পতনের সর্ববৃহৎ বাহ্যিক কারণ ছিল—যখন আলহামরা ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, তখন একটি টিলার উপর দাঁড়িয়ে যখন শেষ বারের মত আলহামরার দিকে তাকায়, তখন সে চোখের পানি ধরে রাখতে পারেনি। সে তখন অবুঝ শিশুর মত কাঁদতে আরম্ভ করে। তার মাতা সম্রাজ্ঞী আয়েশা—যিনি দীর্ঘদিন ধরে নিজের সন্তানের অযোগ্যতা দেখে আসছিলেন—তাকে কাঁদতে দেখে বলেন ঃ 'বেটা! যখন তুমি বীরপুরুষদের মত লড়াইয়ের ময়দানে বীরত্ব প্রদর্শন করতে পারনি, তখন শিশুদের মত কেঁদে লাভ কি?'

বেলা এগারোটার দিকে আমরা আলহামরা থেকে বের হয়ে হোটেলের দিকে ফিরতি পথ ধরি। হোটেল থেকে সামানাপত্র নিয়ে ভূগর্ভস্থ তলায় দাঁড়ানো কারে আরোহণ করি। এখন আমাদের গন্তব্য কর্ডোভা। কর্ডোভা এখান থেকে প্রায় দুইশ' কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

আধুনিক উন্নত দেশসমূহে সড়ক ব্যবস্থা এত সহজ করা হয়েছে যে, একজন অতি অপরিচিত ভিনদেশী ব্যক্তিকেও পথ খুঁজে নিতে কোন বেগ

পেতে হয় না। সুতরাং গ্রানাডার জনবসতি এলাকা থেকেই আমরা কর্ডোভাগামী মহাসড়কের দিকনির্দেশকারী তীরসমূহ দেখতে আরম্ভ করি এবং পরিশেষে আমরা কর্ডোভাগামী সড়কে গিয়ে পৌঁছি।

গ্রানাডা ছেড়ে বের হওয়ার কিছুক্ষণ পর এমন সবুজ শ্যামল পাহাড়ী অঞ্চল আরম্ভ হয়, যেখানে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছোট ছোট পাহাড় এবং সেগুলোর মধ্যকার উপত্যকাসমূহকে সবুজপত্রপল্লব ও পুষ্প পরিচ্ছদে আবৃত দেখা যাচ্ছিল। সড়কটি একটি পাহাড়কে চক্কর কেটে তার চূড়ায় উঠে যেত, তারপর ঠিক একইভাবে নিচের কোন উপত্যকায় নেমে যেত। আবার সেখান থেকে অন্য কোন পাহাড় দৃষ্টিগোচর হতো। আল্লাহ পাক কুদরতীভাবে গ্রানাডার প্রবেশ পথে এ সমস্ত পাহাড়কে পাহারাদাররূপে খাড়া করে দিয়েছেন। গ্রানাডার পতনের পূর্বে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুজাহিদগণ এ সমস্ত পাহাড়ের উপর দুশমনের পথ রোধ করে রাখেন।

পাহাড়ী এলাকা শেষ হলে পথে একের পর এক অনেকগুলো জনবসতি আসতে থাকে। প্রত্যেক জনবসতিতে পাহাড়–চূড়ায় একটি বিশেষ আকৃতির গীর্জা অবশ্যই পাওয়া যেত। সেগুলোর মিনার ঠিক সে রকমেরই ছিল, যেমনটি আমরা মালাগা থেকে আসার পথে দেখতে পেয়েছিলাম। আমাদের প্রবল ধারণা এই যে, মুসলিম শাসনকালে এগুলো মসজিদ ছিল, যেগুলোকে পরবর্তীতে খৃষ্টানরা গীর্জায় রূপান্তরিত করেছে।

প্রায় তিন ঘন্টা সময় সফর করার পর আমরা দিকচক্রবালে কর্ডোভা শহরের নিদর্শনসমূহ দেখতে পাই।

কর্ডোভা

কর্ডোভা স্পেনের অন্যতম প্রাচীন নগরী। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর ইতিহাসেও একটি জনবহুল নগরীরূপে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। সে সময় তাকে 'কোরদোবা' (Cordoba) বলা হত। প্রথম হিজরী শতাব্দীতে যখন মুসলমানগণ স্পেন জয় করেন, তখন এখানে 'গোথিকদের' শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারেক বিন যিয়াদ (রহঃ) ৯২ হিজরী (মোতাবেক ৭২১ ঈসায়ীতে) এটি জয় করেন। মুসলিম সৈনিকগণ শহরের অধিবাসীদের

সঙ্গে বড় উদার ও সম্মানজনক আচরণ করেন। মুসলমানগণ স্পেন জয় করার পর প্রথম দিকে ইশবিলিয়া (সেভিল)কে রাজধানী বানায়। তারপর সুলাইমান বিন আবদুল মালিকের শাসনকালে স্পেনের গভর্নর সামাহ বিন মালেক খাউলানী রাজধানী ইশবিলিয়া (সেভিল) থেকে কর্ডোভায় স্থানান্তর করেন। তারপর থেকে কর্ডোভা শত শত বছর স্পেনের রাজধানী ছিল। ১৩৮ হিজরীতে যখন আবদুর রহমান আদ্‌দাখেল এখানে উমভী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, তারপর থেকে এ শহরে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়।

উমভী বংশ কর্ডোভায় তিনশ' বছরের অধিককাল শাসনকার্য চালায়। তারপর এখানে বনী হামুদ, বনী জহুর, বনী উব্বাদ, মোরাবেতীন ও মুওয়াহিদীনগণ একের পর এক হুকুমত কায়েম করে। অবশেষে ৬৩৪ হিজরীতে ক্যাস্টলের খৃষ্টান রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড এটি দখল করে। এভাবে এ শহরে মুসলমানদের ৫৩৪ বছর শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকে।

মুসলমানদের শাসনকালে কর্ডোভা বিশ্বের সর্বাধিক উন্নত নগরীসমূহের মধ্যে গণ্য হতো। বড় বড় একুশটি মহল্লার সমন্বয়ে গঠিত ছিল এ নগরী। খলীফা হিশাম আলমুআইয়্যাদ এর যুগে (৩৬৬ হিজরী থেকে ৩৯৯ হিজরী) শহরের সার্ভে করানো হয়। তখন শহরে আড়াই লক্ষাধিক বাড়ী ছিল। দোকানের সংখ্যা ছিল আশি হাজার চার শ'। আবদুর রহমান আদদাখেলের যুগে (১৩৮ হিজরী থেকে ১৭২ হিজরী) শহরের মসজিদের সংখ্যা ছিল ৪৯টি। পরবর্তীতে ১৬০০ মসজিদের উল্লেখ ইতিহাস গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায়। (নাফহুত তীব, খণ্ড-২, পৃঃ ৭৯)

মুসলমানগণ তাদের উত্থানকালে যে সমস্ত বিশাল বিশাল ভবন, উন্নত সড়ক, মজবুত পুল, সে যুগ অনুপাতে বিরাট বিরাট কারখানা এবং আধুনিক উন্নত নাগরিক সুবিধাদি কর্ডোভাকে প্রদান করেছিল, সেগুলোর আলোচনা করার জন্য ঐতিহাসিক ও লেখক-সাহিত্যিকগণ স্বতন্ত্র বহু পুস্তক লিপিবদ্ধ করেছেন। স্পেনের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক 'মুকরী' তদীয় কৃত 'নাফহুত তীব' গ্রন্থের সম্পূর্ণ একটি ভলিউমে শুধুমাত্র কর্ডোভারই আলোচনা করেছেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক থেকেও কর্ডোভাকে

স্পেনের বৃহত্তম শহর মনে করা হতো। স্পেনভূমি থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক অঙ্গনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে সমস্ত মহিরূহ জন্ম নিয়েছেন, তাঁদের সিংহভাগই কর্ডোভার অধিবাসী ছিলেন। প্রখ্যাত মুফাসসির এবং সহীহ মুসলিম শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা কুরতুবী, ফিকাহ ও দর্শন শাস্ত্রের ইমাম আল্লামা ইবনে রুশ্দ, যাহেরী সম্প্রদায়ের পুরোধা আল্লামা ইবনে হযম এবং চিকিৎসা ও সার্জারীর সর্বসম্মত দার্শনিক আবুল কাসিম যাহরাভী সকলেই এ শহরেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ডঙ্কা বাজাতে থাকেন।

কর্ডোভার গ্রন্থাগারসমূহ সমগ্র বিশ্বের জন্য আদর্শ ও দৃষ্টান্ত ছিল। এখানে শিক্ষা ও সাহিত্যের রুচি ও অনুরাগ এবং এর সর্বমুখী চর্চা ও অনুশীলন এত ব্যাপক ও উঁচু পর্যায়ের ছিল যে, এখানকার কোন গৃহ উন্নতমানের গ্রন্থাগার থেকে শূন্য ছিল না। এখানকার সমাজে কারো নিকট কোন কিতাবের এমন দুর্লভ কপি থাকাকে—যা অন্য কারো নিকট নেই—সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয় মনে করা হয়। যাদের প্রকৃতির মধ্যে গ্রন্থের প্রতি আগ্রহ ও ঝোঁক ছিল না, তাদেরকে সমাজে ভাল চোখে দেখা হত না। তাই অনেক মানুষ শুধুমাত্র ফ্যাশন হিসাবে নিজেদের বাড়ীতে কিতাবের সারি সারি আলমারী সাজিয়ে রাখত। নানা প্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিচিত্র শাস্ত্রসমূহের গ্রন্থ দিয়ে সেগুলোকে সমৃদ্ধশালী করতো।

এ প্রসঙ্গে মুকরী (রহঃ) এক হাযরমী ব্যক্তির মনোমুগ্ধকর একটি ঘটনা তারই ভাষ্যে উদ্ধৃত করেছেন। সে লোকটি বলে যে, একবার আমার একটি দুস্প্রাপ্য গ্রন্থের প্রয়োজন পড়ে। আমি সেই বইয়ের সন্ধানে কর্ডোভা আসি। সেখানে এসে আমি সমস্ত বইয়ের বাজার চষে ফিরি। অবশেষে এক জায়গায় এসে দেখি, নিলামে বই বিক্রি হচ্ছে। সেখানে আমি আমার প্রয়োজনীয় বইটি পেয়ে যাই। বইটি দেখে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ি। বইটি পাওয়ার জন্য আমি সর্বাধিক দাম বলতে থাকি। কিন্তু আমি দাম বলার সাথে সাথে অপর এক ব্যক্তি তার চে' অধিক দাম বলতে থাকে। অবশেষে সেই লোকটি সীমাতিরিক্ত দাম বলে ফেলে। তখন আমি নিলামকারীকে বলি যে, যে লোকটি এমন সীমাতিরিক্ত দাম বলছে আমাকে তার সঙ্গে একটু সাক্ষাৎ করিয়ে দাও।

সে তখন এক ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করল, যাকে পোশাক–আশাকে ধনাঢ্য ব্যক্তি মনে হচ্ছিল। আমি তার নিকট গিয়ে বললাম, আপনাকে একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত মনে হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা আপনার সম্মান আরো বৃদ্ধি করুন। বাস্তবিকই আপনার এ কিতাবের প্রয়োজন থেকে থাকলে আপনার জন্য আমি এ কিতাব ছেড়ে দিচ্ছি।'

উত্তরে লোকটি বলল ঃ 'আমি কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত নই। আমি তো একথাও জানি না যে, এ কিতাবটিতে কি লেখা আছে। তবে আমি অনেক পরিশ্রম করে আমার বাড়িতে একটি গ্রন্থাগার বানিয়েছি, যা শহরের অভিজাত লোকদের মধ্যে বিশেষ স্থান লাভ করেছে। আমার গ্রন্থাগারের একটি আলমারীতে সামান্য জায়গা খালি রয়েছে, সেখানে এ কিতাবটির স্থান সংকুলান হবে। কিতাবটির মলাটও খুব সুন্দর, লেখাও বড় চমৎকার তাই সেই খালি জায়গা পূর্ণ করার জন্য আমি কিতাবটি ক্রয় করতে চাচ্ছি।'

তখন আমি তাকে বললাম ঃ 'এমন লোকের হাতে বাদাম যাচ্ছে, যার মুখে দাঁত নেই।'

একবার কর্ডোভার বিখ্যাত আলিম আল্লামা ইবনে রুশ্‌দ (রহঃ) এবং ইশবীলিয়ার রঈস আবুবকর বিন যুহরের মধ্যে এই বিতর্ক আরম্ভ হয় যে, কর্ডোভা উত্তম নাকি ইশবীলিয়া? আবুবকর বিন যুহর ইশবীলিয়ার অনেক গুণ–গরিমা তুলে ধরলে আল্লামা ইবনে রুশ্‌দ (রহঃ) উত্তরে বলেন ঃ

'আপনি যে সমস্ত গুণ ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলছেন, সে সব সম্পর্কে আমি অবগত নই, আমি শুধু এতটুকু অবগত আছি যে, যখন ইশবীলিয়ায় কোন আলিমের ইন্তেকাল হয়, তখন তার গ্রন্থাগার বিক্রির জন্য কর্ডোভায় আসে, আর যখন কর্ডোভায় কোন খেলোয়াড়ের মৃত্যু হয়, তখন তার খেলার সাজ–সরঞ্জাম বিক্রির জন্য ইশবীলিয়ায় যায়।'

(নাফহুত তীব, খণ্ড–২, পৃঃ ১১)

যে শহরের জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারসমূহের প্রতি এমন উচ্চতর ভালবাসা বিদ্যমান, সে শহরের জ্ঞান আর সাহিত্যের বিরাজমান পরিবেশ সহজেই অনুমেয়। আর তাই কর্ডোভার নারী ও শিশুদের পর্যন্ত বিদ্যানুরাগের যেই মত্ততা ছিল, তার বিবরণ ঐতিহাসিকগণ বড়

বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

সমগ্র শহরের উপর আচ্ছন্ন এই জ্ঞানের প্রতি এই ব্যাকুলতার পরিণতিতে কর্ডোভার অধিবাসীদেরকে তাদের আভিজাত্য, মাহাত্ম্য, সদাচার, মার্জিত স্বভাব, শিষ্টাচার ও ভদ্রতার দিক থেকে বিশিষ্ট মর্যাদামণ্ডিত মনে করা হতো। বিলাসোপকরণের প্রাচুর্য, নৈসর্গিক সৌন্দর্য, মনোমুগ্ধকর জলবায়ু এবং বিনোদন কেন্দ্রের আধিক্য সত্ত্বেও অশালীন আচরণ, অভদ্রতা, অশ্লীল ও অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে তারা বহু দূরে অবস্থান করতো। স্পেনের এক অধিবাসী কর্ডোভার লোকদের অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন ঃ

"তাদের গুণাবলী এই যে, তারা পরিস্কার–পরিচ্ছন্ন ও উন্নত বস্ত্র পরিধান করেন। ধর্মীয় বিধি–বিধানের পূর্ণ অনুসরণ করেন। নিয়মিত নামায আদায় করেন। সমস্ত কর্ডোভাবাসী শহরের জামে' মসজিদের অত্যন্ত সম্মান করেন। যে কোন ব্যক্তি যে কোন স্থানে মদের কোন পাত্র দেখতে পেলে নির্দ্বিধায় তা' ভেঙ্গে ফেলে। তারা সর্বপ্রকার নিষিদ্ধ কাজকে ঘৃণা করেন। তাদের আভিজাত্য আর গর্বের বস্তু তিনটি—এক. বংশীয় আভিজাত্য, দুই. সমর কৌশল, তিন. বিদ্যা।" (নাফহুত তীব, ২/১০)

যে কর্ডোভার বিবরণ বিভিন্ন বই–পুস্তকে পড়েছিলাম, এবং যার নান্দনিক পরিবেশে লিখিত গ্রন্থসমূহ আজো আমার মত জ্ঞানান্বেষীদের জন্য দিক নির্দেশনার বিশাল ভাণ্ডার, সেই কর্ডোভাই আজ আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সে জগত পাল্টে গেছে। সেই দ্বীন–ঈমান, জ্ঞান–গুণ, মসজিদ–মাদরাসা, গ্রন্থ–গ্রন্থাগার, ভদ্রতা–শালীনতা, আজ আর কোনটিই আর এখানে বিদ্যমান নেই। সে সমস্ত অভাবনীয় মেধা ও প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বও এখন আর এ ভূখণ্ডে নেই, যাঁরা এ ভূখণ্ডকে সমগ্র বিশ্বে বিশিষ্ট মর্যাদার সোপানে সমাসীন করেছিলেন। এখন তো আমার সম্মুখে বিংশ শতাব্দীর ইউরোপের একটি শহর দাঁড়িয়ে আছে। যার প্রশস্ত সড়কের বুকে বস্তু পূঁজার প্রতিযোগিতা চলছে। যার উভয় দিকের ভবনসমূহের মধ্যে কুফর ও শির্কের বসবাস চলছে। যেখানে বসবাসকারী মানুষেরা ভদ্রতা ও শালীনতাকে অসির শক্তিতে অবনত করে সাতশ' বছরের পথ অতিক্রম করে সেই স্তরে এসে উপনীত হয়েছে, যেখানে

মূর্তিপূজা ভদ্রতাকে বিদ্রূপ করে তাকে অতীতকালের অজ্ঞতা ও অন্ধকার আখ্যা দিয়ে থাকে।

কর্ডোভা নগরীর উপকণ্ঠের জনবসতী অতিক্রম করে আমরা আরো কিছুদূর সম্মুখে অগ্রসর হলে একটি নদী এবং তার উপর নির্মিত একটি পুল দেখতে পাই। এটি কর্ডোভার প্রসিদ্ধ নদী 'ওয়াদিউল কাবীর' (গুইডালকুইভার)।

তারই সংলগ্ন একটি ভঙ্গুর প্রাচীর দেখতে পাই। নিশ্চয়ই তা' একসময় কর্ডোভার নগর রক্ষা প্রাচীর ছিল। পুল অতিক্রম করে আমরা যথারীতি শহরে প্রবেশ করি। আমরা গ্রানাডা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় 'লুয' হোটেলের অভ্যর্থনা কক্ষ থেকে কর্ডোভার ভাল একটি হোটেলের ঠিকানা জেনে নিয়েছিলাম। সেই ঠিকানা মত আমরা কোনরূপ বেগ পাওয়া ছাড়াই 'হোটেল মিল' নামের বারো তলা বিশিষ্ট হোটেলের গেটে পৌঁছে যাই। এটি কর্ডোভার প্রসিদ্ধতম একটি হোটেল। আমরা হোটেল কক্ষে পৌঁছে বুঝতে পারি যে, এটি গ্রানাডার 'হোটেল লুয' থেকে অনেক উন্নতমানের হোটেল।

আমরা যখন হোটেলে পৌঁছি, তখন প্রায় পৌনে দু'টা বেজে গেছে। হোটেলের অভ্যর্থনা কক্ষে অনুসন্ধান করে জানতে পারি যে, কর্ডোভার জামে' মসজিদ পর্যটকদের জন্য বিকাল চারটায় উন্মুক্ত করা হয়। তাই আমরা যোহরের নামায আদায় করি। হোটেলে খাবার খেয়ে নেই। যে সমস্ত পশ্চিমা দেশে হালাল গোশত পাওয়া যায় না, সেখানে ভুনা মাছ সবচে' উপাদেয় খাদ্য। সুতরাং পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন টাটকা মাছ আমাদের রসনা ও উদরকে খুব করে পরিতৃপ্ত করে।

আহারান্তে আমরা একটি ট্যাক্সি ক্যাব নিয়ে কর্ডোভার জামে' মসজিদ অভিমুখে যাত্রা করি। ট্যাক্সিটি আঁকাবাঁকা ও পেঁচানো বহু সড়ক এবং অনেক মহল্লা অতিক্রম করে একটি সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত দূর্গ সদৃশ ভবনের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে যায়। ড্রাইভার বলল ঃ এটিই 'কর্ডোভা মসজিদ।' আমাদের সম্মুখে শক্ত প্রস্তর নির্মিত জমকালো সুউচ্চ ও সুদীর্ঘ একটি ভবন দাঁড়িয়ে আছে। মাটি থেকে উপরে উঠে আসা বড় বড় স্তম্ভসমূহ সেই ভবনের প্রাচীরকে ধরে রেখেছে।

কর্ডোভার জামে' মসজিদ

বর্তমানে যে জায়গায় কর্ডোভার জামে' মসজিদ অবস্থিত, রোমান মূর্তিপূজারীদের শাসনকালে সেখানে তাদের একটি উপাসনালয় ছিল। স্পেনে যখন খৃষ্টধর্ম–মত বিস্তার লাভ করে, তখন তারা উপাসনালয়টিকে ভেঙ্গে ফেলে এ স্থলে একটি গীর্জা নির্মাণ করে, যা Vincent নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মুসলমানগণ যখন কর্ডোভা জয় করে, তখন এখানে প্রায় ঐ পরিস্থিতিই সৃষ্টি হয়, যা দিমাশ্‌ক বিজয়কালে সেখানে সৃষ্টি হয়েছিল।[১] দিমাশ্‌কের গীর্জা যেমন অর্ধাধি করে ভাগ করা হয়েছিল ঠিক একইভাবে কর্ডোভার গীর্জাটিকেও সন্ধির শর্তানুপাতে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। গীর্জার একাংশকে যথারীতি গীর্জারূপেই থাকতে দেওয়া হয়, আর অপরাংশকে মসজিদ বানানো হয়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এখানে মসজিদ ও গীর্জা পাশাপাশি অবস্থান করতে থাকে।

কিন্তু কর্ডোভাকে যখন মুসলমানদের রাজধানী বানানো হয় এবং এখানকার অধিবাসী দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়, তখন মসজিদে নামাযীদের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। অবশেষে আবদুর রহমান আদদাখেলের শাসনকালে কর্ডোভার জামে' মসজিদকে সম্প্রসারণ করার বিষয়টি তাঁর সম্মুখে আসে। গীর্জাকে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা ভিন্ন মসজিদকে সম্প্রসারণ করার অন্য কোন উপায় ছিল না। কিন্তু এর অর্ধাংশকে গীর্জারূপে বহাল রাখার বিষয়ে খৃষ্টানদের সঙ্গে সন্ধি হয়েছিল বিধায় মুসলমানদের ঐতিহ্য এবং ইসলামী শরীয়তের বিধান মোতাবেক খৃষ্টানদের সম্মতি ছাড়া এ অর্ধেককে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব ছিল না। তখন আবদুর রহমান আদদাখেল বড় বড় খৃষ্টান নেতা ও রয়িসদেরকে ডেকে তাদের নিকট গীর্জার জায়গা ক্রয়ের প্রস্তাব পেশ করেন এবং এর যত মূল্য দাবী করা হবে তাই পরিশোধ করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেন। খৃষ্টধর্মে গীর্জা বিক্রি করা জায়েয আছে, তাই তাদের জন্য এ প্রস্তাব গ্রহণ করতে কোনরূপ ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা ছিল না। এতদসত্ত্বেও

১. বিস্তারিত ঘটনা জানার জন্য 'জাহানে দীদাহ' (উহুদ থেকে কাসিয়ূন) দ্রষ্টব্য।

খৃষ্টানরা গীর্জা স্থানান্তর করতে সম্মত হল না। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদেরকে সম্মত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। অবশেষে তারা অনেক বেশি মূল্যের দাবী ছাড়াও এ শর্তে সম্মতি জ্ঞাপন করে যে, নগরীর বাইরে তাদের যে সমস্ত গীর্জা বিধ্বস্ত হয়েছে, সেগুলোকে পুনঃনির্মাণের অনুমতি প্রদান করতে হবে। আবদুর রহমান আদদাখেল তাদের এ শর্ত মঞ্জুর করেন, যার ফলে গীর্জার এ অংশও মসজিদে পরিণত করা সম্ভব হয়।

বিস্তৃত ভূমি হাতে আসার পর আবদুর রহমান আদদাখেল নতুন করে কর্ডোভার জামে' মসজিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন। দিমাশকের একজন দক্ষ ও বিজ্ঞ প্রকৌশলী দ্বারা মসজিদের বিশাল এক নকশা তৈরী করেন। সেই নকশা অনুপাতে পরিপূর্ণ মসজিদ তৈরী করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মসজিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হওয়ার দু' বছরের মধ্যেই (১৭২ হিজরীতে) আবদুর রহমান আদদাখেল মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর পুত্র হিশাম এর নির্মাণ কাজ অব্যাহত রাখেন। অবশেষে ছয় বছর সময়ে আশি হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ব্যয়ে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। পরবর্তীতে উমাইয়া বংশের খলিফাগণ মসজিদের আরো বিস্তৃতি সাধন করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আট ধাপ অতিক্রম করে মসজিদটি তার চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ রূপে উপনীত হয়।

কর্ডোভার জামে' মসজিদের ভিতরের অংশটি তার বিস্তৃতি ও সৌন্দর্যের দিক থেকে সমগ্র বিশ্বে অতুলনীয় ছিল। সম্ভবতঃ এত বিশাল ছাদবিশিষ্ট মসজিদ বর্তমানেও পৃথিবীর অন্য কোথাও নাই। মসজিদের এ সম্পূর্ণ অংশ সারি সারি সুদৃশ্য দালানসমূহের সমন্বয়ে গঠিত। এর ছাদগুলো গম্বুজসদৃশ। উভয়দিকে মর্মর প্রস্তরের সুন্দর স্তম্ভের সাঁরি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। মুসলমানদের শাসনকালে মসজিদের মোট স্তম্ভের সংখ্যা ছিল ১৪১৭টি। মসজিদের মোট আয়োতন ছিল তেত্রিশ হাজার একশ' পঞ্চাশ বর্গহাত। (নাফহুত তীব, খণ্ড–২, পৃঃ ৮৭)

মসজিদের দ্বার উন্মুক্ত করা হলে আমরা কম্পিত হৃদয়ে তাতে প্রবেশ করি। সমগ্র বিশ্বের এই সুবিশাল ঐতিহাসিক মসজিদের সুদর্শন স্তম্ভসমূহ—যা পুরাতন ও মলিন হয়ে যাওয়ার পরও আজো বড়

মনকাড়া মনে হয়—অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ দেখতে পাই। কিন্তু সম্পূর্ণ হলটিতে অন্ধকার ও নিস্তব্ধতার রাজত্ব বিরাজ করছিল। কতক ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এই মসজিদের ছাদে তিনশ' ষাটটি তাক এমন বিন্যাসে বিন্যস্ত করা হয়েছিল যে, সূর্য তার সারা বছরের পরিক্রমায় প্রতিদিন একেকটি তাকে প্রবেশ করতো। রাতের বেলায় মসজিদে দু'শ' আশিটি ফানুশ প্রজ্জ্বলিত হতো। যার আলোকিত দীপাধারের মোট সংখ্যা ছিল সাত হাজার চারশ' পঁচিশটি। মসজিদের প্রদীপ ও দীপসমূহ জ্বালাতে বছরে তেল ব্যয় হতো প্রায় তিনশ' চৌদ্দ মণ। সারা বছরে সাড়ে তিন মণ মোম এবং সাড়ে চৌত্রিশ সের সুতা প্রদীপ তৈরী করতে ব্যয় হতো। প্রতি শুক্রবারে মসজিদে আধা সের উদ (উন্নতমানের সুগন্ধি বিশেষ) এবং এক পোয়া আম্বর জ্বালানো হতো। অথচ আজকে এ মসজিদকে দিনের বেলাতেও অন্ধকার দেখাচ্ছিল। বেশ দূরে দূরে কয়েকটি বিদ্যুতের বাতি জ্বলছিল। কিন্তু তা' অন্ধকার বিদূরিত করার জন্য পর্যাপ্ত ছিল না। মসজিদের উপর কুফ্‌র ও শিরকের যে অমানিশা কয়েক শতাব্দী ধরে আধিপত্য বিস্তার করে আছে—দৃশ্যমান এ অন্ধকার তারই স্বাক্ষর বহন করছিল।

ভিতরে প্রবেশ করার পর বাম দিকের সম্পূর্ণ দেওয়ালটিতে খৃষ্টানদের দ্বারা নির্মিত অনেকগুলো গীর্জা–কক্ষ রয়েছে। সেগুলোতে স্থাপিত রয়েছে অনেকগুলো প্রতীমা। মসজিদের ঠিক মাঝখানে মসজিদের কারুকার্যের বিকৃতি ঘটিয়ে অনেক বড় একটি গীর্জা তৈরী করা হয়েছে। মসজিদের অপূর্ব সুন্দর দালানসমূহের গম্বুজ সদৃশ ছাদসমূহে নানারকম ছবি অংকন করা হয়েছে। গীর্জায় প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য বড় বড় মঞ্চ তৈরী করা হয়েছে। সেগুলোর সম্মুখে অনেক দূর পর্যন্ত চেয়ার বসানো রয়েছে।

খৃষ্টানরা মসজিদের অভ্যন্তরে বিকৃতির যে অপচর্চা করেছে, তার ধরন দেখে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাদের উদ্দেশ্য গীর্জার সত্যিকার কোন প্রয়োজন পুরা করা নয়, বরং মসজিদের ইসলামী নিদর্শন সম্বলিত কারুকার্যের বিকৃতি সাধন করাই তাদের উদ্দেশ্য। তাদের আরো লক্ষ্য এই যে, বিশাল জমকালো এই মসজিদের কোনও অংশ যেন খৃষ্টীয় হস্তক্ষেপ

থেকে মুক্ত না থাকে। তাতে ভবনের যত বড় ক্ষতিই হোক না কেন তাতে তাদের কোন পরওয়া নেই। বিধায় তারা কর্ডোভা–মসজিদে নিজেদের কুৎসিত সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির মন খুলে বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। তারা মসজিদের কোন অংশই তাদের অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখেনি।

সর্বসাকুল্যে মসজিদের মেহরাব ও তার সম্মুখে ছোট দু' তিন কাতার জায়গা রশি বেঁধে পৃথক করে রাখা হয়েছে। হয়তো এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য এ অংশটুকু মসজিদের স্মৃতিস্বরূপ রেখে দেওয়া। অপূর্ব সুন্দর কারুকার্যখচিত মেহরাবের উপর ধূলার স্তর জমে আছে। তার সুশোভামণ্ডিত মুখশ্রী যুগ পরিক্রমায় অন্যায়–অবিচারের কষাঘাতে জীর্ণ–মলিন হয়ে আছে। তারই পাশে সেই মেম্বারটিও কালের সাক্ষী হয়ে আছে। যেখান থেকে কখনো কাযী মুনযির বিন সাঈদের ন্যায় প্রথিতযশা খতীবের অগ্নিঝরা বক্তব্যসমূহ ইথারে ইথারে আলোড়ন সৃষ্টি করতো। এটি মসজিদের সেই অংশ, যেখানে নিঃসন্দেহে আল্লামা কুরতবী (রহঃ), আল্লামা ইবনে রুশ্‌দ (রহঃ) ও হাফেয ইবনে আবদুল বার (রহঃ)এর ন্যায় মহামনিষীগণ নামায আদায় করেছেন। খৃষ্টানদের হাজারো অন্যায়–অবিচারের আগ্রাসী হস্তক্ষেপের পরও এখানকার আলো বাতাসে সেই পবিত্রাত্মাদের যিকির–আযকারের সুরভি অনুভূত না হয়ে পারে না। কিন্তু—

وہ سجدہ روحِ زمیں جس سے کانپ جاتی تھی
اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب

অর্থ ঃ জমিনের অন্তরাত্মা যেই সেজদায় কেঁপে উঠতো,
সেই সেজদার জন্য আজ মেম্বার ও মেহরাব ছটফট করছে।

আছরের সময় হয়ে গেছে। আমরা আছর নামায কর্ডোভার মসজিদে আদায় করার নিয়তেই হোটেল থেকে বেরিয়েছিলাম। কে যেন আমাদেরকে ভিত্তিহীন এ তথ্য দিয়েছিলো যে, কর্ডোভার মসজিদ নামাযীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। তথ্যটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ছিল। এখানে যথারীতি নামায পড়ার এখনো অনুমতি নেই। দু' একজন পর্যটক এসে নামায পড়ে নিলে সে ভিন্ন কথা। সুতরাং আমার বন্ধু ও সফরসঙ্গী সাঈদ সাহেব আযান দেন। 'হাইয়া আলাস সালাহ'এর প্রাণ আকুল করা

এ আহ্বানে সাড়া দেওয়ার কেউ এখানে ছিল না। সুতরাং আমরা দু'জনে মেহরাবের সন্নিকটে দাঁড়িয়ে আছর নামায আদায় করি। প্রাচীন ও ঐতিহাসিক এই জামে' মসজিদের ফরাশে সিজদাহ্ প্রদানকালে আমাদের এমন অনুভূত হচ্ছিল, যেন দীর্ঘ আট শতাব্দীর ব্যবধান মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে গেছে। আমরা কালের অন্ধকারময় এই সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে সেই উন্মুক্ত পরিবেশে উপনীত হয়েছি, যার সর্বত্র তাওহীদের জ্যোতি বিকীর্ণ হতো। যেখানকার নির্মল পরিবেশ লা শরীক খোদায়ে ওয়াহদাহুর স্তুতি ও প্রশস্তির উৎসরিত ফোয়ারায় টই-টুম্বুর। 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা'-র যথার্থ তাৎপর্য এখানে এসে অধিকতর মূর্তিমান হয়ে ওঠে। আমার পরোয়ারদেগারের মহান সত্তা উত্থান-পতনের এ আলো-অন্ধকার থেকে বহু যোজন উর্ধ্বে। যখন এখানে সেজদাবনত অসংখ্য ললাটের সমাগমে সুবিশাবল ও সুবিস্তৃত এ মসজিদের আয়তন সংকীর্ণ হয়ে যেত, তখনো তিনি 'আ'লা' অর্থাৎ সর্বোচ্চ ও সর্বমহান ছিলেন, আর আজ যখন 'হাইয়া আলাস সালাহ'-এর আহ্বানে একটি পদও মেহরাব অভিমুখে অগ্রসরমান নেই, এখনও তিনি 'আ'লা' তথা সর্বোচ্চ ও সর্বমহান রয়েছেন। তাঁর তাওহীদের অনুরক্ত কোটি সংখ্যক হোক কিংবা হাতে গোনা কতিপয় হোক, তাঁর দ্বীনকে মন-মুকুরে প্রতিষ্ঠাকারীগণ বিশ্বের বুকে নিজেদের দূর্দান্ত প্রভাব-প্রতাপ প্রতিষ্ঠা করুক, কিংবা নিজেদের পাপকর্মের অশুভ পরিণতিতে পরাজিত ও পরাভূত হোক, এতে তাঁর একত্ব ও তাঁর অমুখাপেক্ষীতায় কোন তারতম্য হয় না।

یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند
بہار ہو کہ خزاں لاالہ الا اللہ

"এ সঙ্গীত বসন্ত ঋতুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।
শীত ও বসন্ত সর্বদাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' প্রাণবন্ত।"

সুদূর বিস্তৃত এ মসজিদে এই মেহরাবটি ছাড়া আর এমন কোন জায়গা ছিল না যেখানে মন ও নয়ন প্রশান্তি লাভ করতে পারে। অবশিষ্ট সম্পূর্ণ মসজিদটি খৃষ্টানদের অন্যায় হস্তক্ষেপে ক্ষতবিক্ষত, যা দেখে আমাদের হৃদয় থেকেও শোনিত ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। কিছু সময় আমরা

মেহরাবের আশেপাশে অবস্থান করি। তার পর বেদনা ও আক্ষেপভরা দৃষ্টিতে মসজিদের সেসব স্তম্ভ দেখতে থাকি, যেগুলোর ছায়াতলে এক সময় জ্ঞানগরিমার আসর সজ্জিত হতো। যেখানে মানবতাকে ভদ্রতা ও সভ্যতার পাঠ দান করা হতো। যেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রদীপসমূহ প্রজ্জ্বলিত হতো। যেখানে মানবতার মস্তকে মর্যাদা ও সাধুতার মুকুট পরানো হতো। এখানকার স্তম্ভগুলো সেসব আসরের স্মৃতিকথা অবশ্যই স্মরণ করে থাকে। এদের অস্তিত্ব মুসলমান জাতির আত্মমর্যাদাবোধের অভাব সম্পর্কে আপাদমস্তক অভিযোগকারী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের এই অভিযোগ এমনই বেদনাবিধূর যে, তা এখানে এসে চোখে দেখা যায় ঠিকই কিন্তু কানে শোনা যায় না।

মসজিদে আমরা দু'জন মাত্র মুসলমান অবস্থান করছি। আমরা উভয়ে নীরব নির্বাক। সাঈদ সাহেব গভীর প্রতিক্রিয়াশীল এই দৃশ্যে অনেকক্ষণ নির্বাক ছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি নীরবতা ভঙ্গ করে আমাকে বলেন ঃ

'তাকী সাহেব ঃ এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলুন। এখানে তো শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।'

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাঁর এ শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা জায়গার সংকীর্ণতা ও আলোহীনতার কারণে ছিল না, বরং এটি ছিল এমন এক অবস্থার সৃষ্টি, যার প্রতিকার না তাঁর হাতে ছিল, না আমার হাতে। আমরা ধীরপদে মসজিদের অপরদিকের বহির্গমনের দরজার দিকে এগোতে থাকি। হৃদয়ে আরেকটি আঘাত লাগা তখনো বাকি ছিল। সেই দরজার অভ্যন্তরেই এক বাদ্যকার দীর্ঘক্ষণ ধরে তার সেতার ও হারমোনিয়াম ঠিক করার কাজে ব্যস্ত ছিল। আমরা তাঁর নিকট পৌঁছতেই সে বাদ্যযন্ত্রের বীনায় সুর দিতে আরম্ভ করে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্তর থেকে এই দু'আ বের হয়ে আসে যে, 'হে আল্লাহ! এমন নিঃস্ব অবস্থায় আগামীতে অন্য কোন মসজিদের যিয়ারত করায়ো না।'

আমি আমার জীবনে বহু ঐতিহাসিক স্থান দেখেছি, বহু শিক্ষণীয় জায়গা ঘোরার সুযোগ লাভ করেছি। কিন্তু কর্ডোভার জামে' মসজিদ দেখে মন-মগজে অনুতাপ ও অনুশোচনার যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তা

অন্য কোন ঐতিহাসিক স্থান দেখে সৃষ্টি হয়নি। এখন আমার বুঝে আসে যে, মরহুম ইকবাল কর্ডোভার মসজিদে বসে এর সম্পর্কে যে দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন তা তিনি কী গভীর প্রতিক্রিয়া নিয়েই না রচনা করেছেন!

سلسلہ روزو شب نقش گر حادثات
سلسلہ روزوشب اصل حیات و ممات
سلسلہ روزو شب تار حریر دورنگ
جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات
تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے یہ
سلسلہ روزوشب صیرفی کائنات

"রাত–দিনের পরিক্রমা অসংখ্য ঘটনার চিত্রকর,
রাত–দিনের পরিক্রমা জীবন–মরণের মূলে কার্যকর।
রাত–দিনের পরিক্রমা সাদা–কালো রেশমী সুতা,
যার দ্বারা গড়ান তিনি পরিধেয় গুণাবলীর।
তোমায় পরখ করছে এ, আমায় পরখ করছে এ।
রাত–দিনের পরিক্রমা পরখকারী জগতের।"

ওয়াদিউল কাবীর ও তার সেতু

মসজিদ থেকে বের হয়ে দেখতে পাই বৃষ্টির ছিটায় মাটি ভিজে আছে। আমরা কর্ডোভা জামে' মসজিদের কেবলার দিকের প্রাচীর অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকি। কিছুদূর পথ চলার পর নগর–প্রাচীরের একটি প্রাচীন ফটক দেখতে পাই। এটি 'বাবুল কানতারাহ' (সেতু ফটক)। এটি মুসলমানদের শাসনকালে দক্ষিণ দিক হতে নগরে প্রবেশ করার কাজে ব্যবহার করা হত। মুসলিম শাসনকালের সে ফটক এখন আর অবশিষ্ট নেই। বর্তমানের ফটকটি একজন খৃষ্টান প্রকৌশলী কর্তৃক নির্মিত। ফটকের সম্মুখ দিয়ে পূর্ব–পশ্চিমে একটি সড়ক পথ চলে গিয়েছে। সড়কটি অতিক্রম করতেই সম্মুখে কর্ডোভার প্রসিদ্ধ নদী 'ওয়াদিউল কাবীর' প্রবাহিত। দুপুরে শহরে প্রবেশকালেও নতুন একটি

সেতুর উপর দিয়ে আমরা অতিক্রম করি। তখন আমি অনুমান করেছিলাম যে, এটিই 'ওয়াদিউল কাবীর' নদী। কারণ, কর্ডোভার আলোচনায় এ নদীর কথাই বিভিন্ন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। পরে যখন নদীর এক তীরে একটি বোর্ডে Guadal Quinur লেখা দেখতে পাই, তখন নিশ্চিত হই যে, এ নাম ওয়াদিউল কাবীরেরই বিকৃত রূপ।

প্রাচীনকালে কর্ডোভা নগরী এ নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত ছিল। দক্ষিণ দিক থেকে নদী অতিক্রম করতেই নগর প্রাচীর আরম্ভ হত। আর তার মধ্যেই ছিল শাহী মহলসমূহ।

প্রথম হিজরী শতাব্দীতে তারেক বিন যিয়াদ লাক্কা প্রান্তরের লড়াই শেষ করে তাঁর সেনাবাহিনীর বিভিন্ন দলকে স্পেনের বিভিন্ন শহর জয়ে প্রেরণ করেন। সুতরাং কর্ডোভার বিজয় অভিযানের দায়িত্ব খলীফা অলীদ বিন আবদুল মালিকের আযাদকৃত ক্রীতদাস মুগীস রূমীর উপর ন্যস্ত হয়। মুগীস রূমী দক্ষিণ দিক হতে অগ্রসর হন। তিনি ওয়াদিউল কাবীরের কিছু পূর্বে শাকান্দা নামক একটি স্থানে শিবির স্থাপন করেন। কর্ডোভা বিজয়ের জন্য প্রথমে নদী অতিক্রম করা এবং তারপর কর্ডোভার সুদৃঢ় ও সুউচ্চ নগর–প্রাচীর হস্তগত করা মামুলী বিষয় ছিল না। কিন্তু আল্লাহর পথের পথিকদের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার গায়েবী মদদ সর্বদাই অব্যাহত থাকে। মুগীসের গুপ্তচররা শাকান্দার অদূরে একজন রাখালকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে। রাখালটি জানায় যে, কর্ডোভার সরদাররা লড়াইয়ের ভয়ে পূর্বেই টলেডোর দিকে পালিয়েছে। নগর রক্ষার জন্য সৈন্য সামন্তও খুব বেশী নেই। মুসলমান গুপ্তচর রাখালের নিকট কর্ডোভার নগর প্রাচীর সম্পর্কে জানতে চাইলে সে বলে যে, প্রাচীর তো খুব মজবুত তবে প্রাচীরের এক জায়গায় একটি ফাটল রয়েছে। এর সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে।

রাতের বেলা মুগীস কর্ডোভা অভিমুখে অগ্রাভিযানের সিদ্ধান্ত নেন। তখন আল্লাহর গায়েবী মদদরূপে আকাশ থেকে অঝোরে বৃষ্টি ঝরতে আরম্ভ করে। বৃষ্টির আওয়াজের মধ্যে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ হারিয়ে যায়। ফলে মুসলিম সেনাবাহিনী নিশ্চিন্তে 'ওয়াদিউল কাবীর' নদীর সেতু অতিক্রম করে। বৃষ্টিপাত ও শৈত্যপ্রবাহের ফলে প্রাচীর রক্ষীরাও প্রাচীর ছেড়ে তাদের চৌকিতে আশ্রয় নিয়েছিল, ফলে প্রাচীর ছিল অরক্ষিত।

রাখালটি যে ফাটলের দিক নির্দেশনা দিয়েছিল, বাস্তবেও প্রাচীরে সে ফাটলটি ছিল। তবে তা এত উঁচুতে ছিল যে, সেখান পর্যন্ত পৌঁছাও সহজ ব্যাপার ছিল না। তবে একজন নিবেদিতপ্রাণ অকুতোভয় মুজাহিদ একটি আঞ্জির বৃক্ষের সাহায্য নিয়ে সে ফাটল পর্যন্ত পৌঁছতে সফল হন। মুগীস তাঁর পাগড়ী খুলে তার এক মাথা সেই মুজাহিদের হাতের দিকে ছুড়ে মারেন। ফলে তাঁর এ পাগড়ী সৈন্যদের জন্য প্রাচীরে আরোহণে ফাঁদের কাজ দেয়। তা ধরে পরপর কয়েকজন সিপাহী প্রাচীরের ফাটল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারা সম্মিলিতভাবে প্রাচীরের অভ্যন্তরে লাফিয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী পাহারাদারদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণে আনে এবং নগর–ফটক উন্মুক্ত করে দেয়। এভাবে কোনরূপ প্রতিরোধ ছাড়াই শহরটি মুসলমানদের হাতে চলে আসে।

(নাফহুত তীব লিল মুকরী, খণ্ড–১, পৃঃ ২৪৫)

আমাদের সম্মুখে ওয়াদিউল কাবীরের সেই তীর দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে ১৩শ' বছর পূর্বে এই বৈপ্লবিক লড়াই সংঘটিত হয়েছিল। সড়ক পার হয়ে আমরা নদীর তীরে পৌঁছি। এখানে দক্ষিণমুখী একটি জীর্ণ ও প্রাচীন সেতু রয়েছে। বর্তমানে একে একটি সাধারণ কিসিমের পুল মনে হয়। প্রাচীনতা ও জীর্ণতার কারণে আজ তা বিধ্বস্ত। কিন্তু একসময় এটিকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ পুল মনে করা হতো। তৎকালীন পৃথিবীতে এত অধিক পোক্ত, বিস্তৃত ও সুদৃঢ় পুল দ্বিতীয়টি ছিল না। তাই এটিকে বিশ্বের আশ্চর্যতম বস্তুসমূহের অন্যতম গণ্য করা হতো। মুসলিমদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এখানে মামুলী কিসিমের দুর্বল একটি পুল ছিল। হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) যখন খেলাফতের গুরুদায়িত্ব কাঁধে নেন, তখন তিনি রাজধানী দিমাশকে বসে কর্ডোভা নগরীর প্রয়োজনসমূহ উপলব্ধি করেন। তিনি স্পেনের গভর্নর সামাহ বিন মালেক খাওলানীকে 'ওয়াদিউল কাবীর' নদীর উপর একটি সুদৃঢ় সেতু নির্মাণের নির্দেশ দান করেন। তাঁর নির্দেশক্রমে ১০১ হিজরী সনে তৎকালীন দক্ষ প্রকৌশলী আবদুর রহমান বিন উবায়দুল্লাহ আল গাফেকীর তত্ত্বাবধানে এই আলীশান সেতু নির্মাণ করা হয়। সেতুটি ৮০০ হাত দীর্ঘ এবং ৪০ গজের অধিক চওড়া ছিল এবং নদী–পৃষ্ঠ থেকে ৬০

হাত উঁচু ছিল। এর তলে আঠারটি সুদৃশ্য ফটক তৈরী করা হয়েছিল। আর উপরে ১৯টি বুরুজ নির্মাণ করা হয়েছিল। সমকালীন যুগে সমগ্র বিশ্বে এর মত সেতু আরেকটি ছিল না। তাই তৎকালীন এক ঐতিহাসিক লেখেন ঃ 'কর্ডোভার সেতু বিশ্বের অন্যতম আশ্চর্য বস্তু।'

পরবর্তীতে সেতুটি বারবার বিস্তৃত ও সংস্কার করা হলেও মৌলিকভাবে তা মুসলমানদের নির্মাণকৃত সেই সেতুই এখনও রয়েছে। যুগ পরিক্রমার কষাঘাত ও বার্ধক্য তার আকৃতি ও রং–রূপের বিকৃতি ঘটিয়েছে। দেখে মনে হয় যে, বহুকাল কেউ তার করুণ দশার প্রতি মনোযোগ আরোপ করেনি। এতদসত্ত্বেও তার মজবুত নিদর্শনসমূহ তার যৌবনদৃপ্ততার দাস্তান শুনিয়ে থাকে।

সেতুর উপর দাঁড়িয়ে তার উভয় দিকের বহমান নদী পরিদৃষ্ট হয়। শীতকাল হেতু তার গতি ছিল মন্থর। নানা জায়গায় উৎপন্ন আগাছা তার প্রবাহ ও গতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। নদীর তীরে কিছু পুরাতন ভবনের ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। এগুলো পানি উত্তোলনের চাক্কিরূপে ব্যবহৃত হতো। যা মুসলমানদের হাতে নির্মিত হয়। একে স্পেনের মুসলমানদের বিশেষ শিল্পকর্ম বলে মনে করা হত।

আমরা সেতু অতিক্রম করে তার দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছলে সেখানে আরো একটি প্রাচীন দূর্গের ফটক দেখতে পাই। এটি রোমানদের যুগে নির্মিত অতি প্রাচীন একটি দূর্গ। একে Caliguris বলা হত। মুসলমানদের শাসনকালে এটি 'কালহারা' নামে প্রসিদ্ধ হয়। আর বর্তমানে একে Calahorra বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে দূর্গের খুব ছোট একটি অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। তাতে একটি সরকারী অফিস রয়েছে। বাকী অংশকে সড়কে পরিণত করা হয়েছে।

মাদীনাতুয্ যাহ্‌রা

ওয়াদিউল কাবীরের সেতুর উপর দাঁড়িয়েই আমরা একটি ট্যাক্সীক্যাব খাড়া করাই। তাতে উঠে বসে ড্রাইভারকে 'মাদীনাতুয্ যাহ্‌রা' যেতে বলি। ট্যাক্সী ড্রাইভার প্রথমে আমাদের কথা বুঝতে পারেনি। আমাদের সংক্ষিপ্ত ইংরেজী বচনের উত্তরে সে স্পেনীশ ভাষায় দীর্ঘ বক্তব্য আরম্ভ করে দেয়।

যার আমরা কিছুই বুঝি না। অবশেষে আমি কর্ডোভার পর্যটন সংক্রান্ত লিখিত ছোট্ট একটি পুস্তক বের করি। তাতে মাদীনাতুয্ যাহ্রার ছবি দেওয়া ছিল। ছবি দেখাতেই সে আমাদের উদ্দেশ্য বুঝে ফেলে। তখন সে সেখানকার প্রশংসা ও পরিচয় সম্পর্কে স্পেনীশ ভাষার সঙ্গে দু' চারটি ইংরেজী শব্দ ঢুকিয়ে সে এই আস্থা নিয়ে কথা বলতে থাকে য, আমরা যেন তার সব কথাই বুঝছি। তার কথার উত্তরে আমরা যে ইংরেজী বাক্য বলি, তাতে তার সে সুধারণা টুটে যায় এবং চুপ হয়ে যায়।

মাদীনাতুয্ যাহ্রা কর্ডোভা নগরী থেকে প্রায় আট মাইল দূরে। আমাদের গাড়ী কর্ডোভার বিভিন্ন সড়ক ও মহল্লা অতিক্রম করতে থাকে। বর্তমানে কর্ডোভা একটি আধুনিক শহর। প্রাচীন ভবনসমূহ মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে নতুন করে এটি তৈরী করা হয়েছে। আর তাই এতে বর্তমানে কর্ডোভার জামে' মসজিদ এবং তার আশেপাশের কিছু নিদর্শন ছাড়া মুসলমানদের যুগের অন্য কোন স্মৃতি ও নিদর্শন অবশিষ্ট নেই। তবে বহু সড়ক ও মহল্লার নাম এখনও এমন রয়েছে যে, সামান্য নাড়াচাড়া করলেই তার মূল আরবী নাম জানা যায়। কিছুক্ষণ পথ চলার পর গাড়ীটি শহরের বাইরে চলে এসে এমন একটি ময়দান এলাকা অতিক্রম করতে থাকে, যার উভয় দিকে সবুজ–শ্যামল বৃক্ষ, লতা–গুল্ম ও ঝোপঝাড় ছড়িয়ে আছে। অবশেষে ঐ সড়কেরই এক জায়গায় মাদীনাতুয্ যাহ্রা লেখা একটি বোর্ড দৃষ্টিগোচর হয়। সেটি ডান দিকে দিকনির্দেশ করছিল। গাড়ী ডান দিকে মোড় নিয়ে একটি সড়কে চলে আসে। সড়কের বামদিক দিয়ে প্রাচীন ধাঁচের একটি প্রাচীর সাথে সাথে চলতে থাকে। এটি মাদীনাতুয্ যাহ্রার প্রাচীর। প্রায় এক কিলোমিটার পথ অগ্রসর হওয়ার পর ময়দান এলাকা শেষ হয়ে যায়। সড়কটি বামদিকে মোড় নিয়ে সবুজ শ্যামল একটি পাহাড়ের উপর আরোহণ করতে থাকে। পাহাড়ের প্রায় মাঝ বরাবর পৌঁছে ড্রাইভার ট্যাক্সী দাঁড় করিয়ে আমাদেরকে বলে যে, মাদীনাতুয্ যাহ্রার প্রবেশ পথ এটিই। আমরা ট্যাক্সী থেকে নেমে সড়কের পূর্ব দিকে একটি পাহাড় দেখতে পাই, আর পশ্চিম দিকে ছিল সুদূর বিস্তৃত উপত্যকা। তার মধ্যে মাদীনাতুয্ যাহ্রার ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছিল।

মাদীনাতুয্ যাহ্রা ছিল ছোট একটি রাজনগরী। কর্ডোভার খলীফা ও তাদের সংশ্লিষ্ট লোকদের আবাসনরূপে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল। ৩২৫ হিজরী সনে খলীফা আবদুর রহমান আন নাসের এর নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন। এর কারণ হিসেবে বর্ণিত রয়েছে যে, খলীফা আবদুর রহমান আন নাসেরের একজন দাসী বহু সম্পদ রেখে মারা যায়। খলীফা দাসীর রেখে যাওয়া অর্থসম্পদ সেসব বন্দী মুসলিম সৈনিকদের মুক্তির কাজে ব্যয় করার নির্দেশ দেন, যারা খৃষ্টানদের হাতে বন্দী ছিল। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল খৃষ্টানদের হাতে খুব কম সংখ্যক মুসলমান বন্দী রয়েছে। তাদেরকে মুক্ত করার পরও অনেক সম্পদই অবশিষ্ট রয়ে যায়। তখন সম্রাজ্ঞী যাহ্রা বাসনা ব্যক্ত করেন যে, তার নামে একটি অতি সুন্দর শহর তৈরী করা হোক। খলীফা নাসের তার বাসনা পূরণার্থে মাদীনাতুয্ যাহ্রার নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন।

মাদীনাতুয্ যাহ্রার বেশী অংশের নির্মাণ কাজ ২৫ বছর সময়কালে খলীফা নাসেরের শাসনকালেই সমাপ্ত হয়েছিল। তবে তার অনেকগুলো ভবন পরবর্তীতে খলীফা দ্বিতীয় আল হাকামের যুগে নির্মিত হয়। তখন নগরীর দৈর্ঘ্য পূর্ব–পশ্চিমে ২০০০ হাত এবং প্রস্থ উত্তর–দক্ষিণে ১৭০০ হাত ছিল।

মাদীনাতুয্ যাহ্রা শাহী ভবন, দরবার কক্ষ, আসর কেন্দ্র, জামে' মসজিদ এবং শাহী খান্দানের বাসভবনসমূহের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। এটিকে সমকালীন যুগে বিশ্বের সর্বাধিক রূপসী নগরী মনে করা হতো।

আমরা যে পাহাড়ের উপর এখন দাঁড়িয়ে, সম্ভবতঃ এটিই সেই 'জাবালুল আরুস', যার সম্পর্কে ইতিহাসে এ ঘটনা পড়েছিলাম যে, মাদীনাতুয্ যাহ্রার নির্মাণ কাজ শেষ হলে রাণী যাহ্রা খলীফা নাসেরের সঙ্গে এর পরিদর্শনে আসেন। তিনি এখানকার ভবনসমূহ খুবই পছন্দ করেন। কিন্তু সুদৃশ্য এ সমস্ত ভবনের একদিকে কালো কুশ্রী একটি পাহাড় দেখতে পেয়ে খলীফাকে বলেন, 'এই অপরূপ সুন্দরী রমণী কি এই কিম্ভূত কিমাকার নিগ্রোর কোলে অবস্থান করবে?' তখন খলীফা নাসের এই পাহাড়ের এলোমেলো বৃক্ষসমূহ উপড়ে ফেলে জায়গায় জায়গায় ফলদার বৃক্ষের বাগান তৈরী করেন। ফলে পাহাড়টি সুন্দরী নববধুর ন্যায়

রূপবতী হয়ে ওঠে। আর এজন্যই পাহাড়টির 'জাবালুল আরুস' 'পর্বতবধূ' নামকরণ করা হয়।

মাদীনাতুয্ যাহ্রার শাহী ভবন রূপ সৌন্দর্য, শৌকুমার্য, কারুকার্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী আধিপত্যের দিক থেকে সমগ্র বিশ্বে অদ্বিতীয় ছিল। তার তুলনা সে নিজেই। এশিয়া ও ইউরোপের বিশাল বিশাল দেশের দূত ও প্রতিনিধিরা শুধুমাত্র একে একনজর দেখার জন্য অনেক সময় এখানে আগমন করত। এই মহলের একটি ভবনের নাম ছিল 'কাসরুল খুলাফা'। এ ভবনের ছাদ ও প্রাচীরসমূহ স্বর্ণ ও স্বচ্ছ মর্মর প্রস্তরে নির্মিত ছিল। কনষ্ট্যান্টিনোপলের সম্রাট 'লিউ' কর্তৃক খলীফা নাসেরের নিকট উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরিত মহামূল্যবান মণি-জহরতসমূহ ছাদের ঠিক মাঝখানে ঝুলন্ত ছিল। ভবনটির ঠিক মাঝখানে একটি সুদর্শন চৌবাচ্চা ছিল। তা পারদ দ্বারা পরিপূর্ণ থাকতো। ভবনটির প্রত্যেক কোণে অষ্ট মেহরাব বিশিষ্ট ফটক ছিল। প্রতিটি মেহরাব বৈচিত্রময় রং সমাহারের প্রস্তর ও মার্বেলের খুঁটির উপর দাঁড়িয়ে ছিল। মেহরাবের পাল্লা ছিল মজবুত কাঠ ও হাতির দাঁতের তৈরী। সেগুলোর উপর সোনালী কারুকার্য করে তার মধ্যে মণিমুক্তা বসানো ছিল। রোদ যখন ভবনের ভিতরে পতিত হত, তখন ভবনের ছাদ ও প্রাচীর থেকে এমনভাবে আলো বিচ্ছুরিত হত যে, তার তীব্র আলোকচ্ছটায় দর্শকদের দৃষ্টি ঝলসে উঠত। খলীফা নাসের যখন সেই কক্ষে উপবিষ্ট থাকতেন এবং উপস্থিত জনদের উপর তার প্রভাব বিস্তার করার ইচ্ছা হত, তখন তিনি কোন ক্রীতদাসকে ইঙ্গিত করতেন। ক্রীতদাস চৌবাচ্চার পারদে নাড়া দিত। পারদ কম্পিত হয়ে রৌদ্রকিরণ বিদ্যুতের ন্যায় সারাকক্ষে চমকাতে থাকত। ফলে এমন অনুভূত হত যে, সম্পূর্ণ কক্ষটি যেন ঘুরছে। কতক ভীনদেশী দূত—যারা ভবনের এ রহস্য সম্পর্কে অনবহিত—এ দৃশ্য দর্শনে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কেঁপে উঠতো।

মাদীনাতুয্ যাহ্রা এ জাতীয় কত বৈচিত্র ও বিস্ময়ের সমন্বয়ে যে পরিপূর্ণ ছিল তা আল্লাহই ভাল জানেন। এর মধ্যে কৃত্রিম নদীও তৈরী করা হয়েছিল এবং এমন চিড়িয়াখানা তৈরী করা হয়েছিল, যার মধ্যে পশুপাখী প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাস করতো। বর্তমান বিশ্বে 'নিরাপদ

পশুকানন' (Game Reserve) বানানোর যে রীতি দেখা যায়, তার সূচনা মাদীনাতুয্ যাহ্‌রা থেকেই হয়।

বাহ্যত যে যুগে মাদীনাতুয্ যাহ্‌রা তৈরী করা হয়, তা ছিল স্পেনে মুসলমানদের উত্থানকাল। তৎকালে এ ভূস্বর্গ দর্শন করে বিশ্বের বড় বড় পরাশক্তিরা প্রকম্পিত হত। কিন্তু বাস্তবদর্শী অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখা হলে স্পেনে মুসলমানদের অধঃপতনের সূচনা এ সমস্ত বিলাসবহুল আবাসকেন্দ্রের নির্মাণ থেকে দেখতে পাওয়া যাবে। যা ক্রমান্বয়ে মুসলমানদের থেকে তাদের কৃচ্ছ্রতা, কষ্টসহিষ্ণুতা ও তাদের অনাড়ম্বর সহজ সরল জীবনের শক্তি ছিনিয়ে নেয়।

যে সময় বিশ্বের অদ্বিতীয় জমকালো এই শাহী মহল তৈরী হচ্ছিল, তখন অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আল্লাহওয়ালা আলেমগণ এদিকে খলীফার দৃষ্টি আকর্ষণ করার দায়িত্বটি কিভাবে পালন করেছিলেন, সে বিষয়েও বিস্ময়কর ঘটনাবলী ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত রয়েছে। সে সময় শাহী মসজিদের খতীব ও ইমাম ছিলেন কাজী মুনযির বিন সাঈদ (রহঃ)। যাঁর অলংকারপূর্ণ অসাধারণ বক্তৃতাসম্ভারকে স্পেনের আরবী সাহিত্যের অনেক বড় ভাণ্ডার মনে করা হয়। খলীফা নাসের যখন তাঁর পিছনে নামায পড়তে আসতেন, তখন তিনি নিজ বক্তৃতাসমূহের মধ্যে দুনিয়ার অন্বেষায় বিভোর হওয়া এবং বিলাসবহুল জীবন যাপনের পিছনে অপচয় করা ইত্যাকার বিষয়ে মন খুলে সমালোচনা করতেন।

এইমাত্র যে ভবনটির আলোচনা করা হলো যে, তার ছাদ এবং দেয়ালসমূহ স্বর্ণ ও মর্মর প্রস্তর দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল—একবার খলীফা নাসের এই ভবনে উপবেশন করে তার মোসাহেবদেরকে বলছিলেন, বিশ্বের বৃহৎ থেকে বৃহত্তর কোন সম্রাটও কি নির্মাণ ইতিহাসে এমন অনন্য কৃতিত্ব সম্পাদন করেছে, যেমনটি আমার হস্তদ্বয় এই ভবন নির্মাণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করেছে? রাজা–বাদশাহদের মজলিশ সব যুগেই চাটুকার দরবারীদের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। সেখানকার চাটুকার মোসাহেবরাও এ প্রশ্নের উত্তরে খলীফার স্বপক্ষে বাকচাতুর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করল। তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে আসমান জমিনকে একাকার করে ফেলল। এমন সময় কাজী মুনাযির বিন সাঈদ (রহঃ)ও সেখানে

তাশরীফ আনেন। খলীফা নাসের তাঁর সম্মুখেও এই প্রাসাদের অপূর্ব সোনালী কারুকার্য খচিত নির্মাণশৈলী ও তার স্বর্ণছাদকে নিজের গৌরবপূর্ণ কৃতিত্ব বলে উল্লেখ করলেন।

প্রতিউত্তরে কাজী মুনাযির বললেন ঃ 'আমিরুল মুমিনীন! আল্লাহ তাআলা আপনাকে স্বীয় পরম করুণায় ও অশেষ অনুগ্রহে অনেক মর্যাদায়ই ভূষিত করেছেন। কিন্তু আমি ধারণাও করিনি যে, আপনি আল্লাহপ্রদত্ত এ সমস্ত অসংখ্য দয়া অনুগ্রহকে বাদ দিয়ে এমন বিষয় নিয়ে গর্ব করবেন, যা আল্লাহ তাআলা কাফেরদের বলে উল্লেখ করেছেন।'

খলীফা নাসের বললেন ঃ 'তা কিভাবে?'

উত্তরে কাজী মুনযির (রহঃ) পবিত্র কুরআনের এ আয়াতগুচ্ছ তেলাওয়াত করলেন—

"وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ."

(زخرف: ٣٣-٣٥)

অর্থ ঃ 'যদি সব মানুষের এক মতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত, তবে যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে আমি তাদেরকে দিতাম তাদের গৃহের জন্যে রৌপ্যনির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি, যার উপর তারা চড়ত। এবং তাদের গৃহের জন্য দরজা দিতাম এবং পালংক দিতাম, যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত। এবং স্বর্ণ নির্মিতও দিতাম। এগুলো সবই তো পার্থিব জীবনের ভোগসামগ্রী মাত্র। আর পরকাল আপনার পালনকর্তার কাছে তাঁদের জন্যেই, যাঁরা ভয় করে।'

(সূরা যুখরুফ, আয়াত ৩৩–৩৫)

খলীফা নাসের আয়াতগুলো শুনে মাথা নত করলেন। কাজী মুনযির তার বক্তব্য অব্যাহত রাখলেন। গভীর প্রভাবশালী ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী ধারায় খলীফাকে নসিহত করলেন। ফলে তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে

আরম্ভ করল এবং পরবর্তীতে তিনি প্রাসাদের ছাদ থেকে স্বর্ণ, চাঁদি নামিয়ে ফেললেন। (নাফহুত তীব, খণ্ড–২, পৃঃ ১০৯)

কাজী মুনযির বিন সাঈদ (রহঃ)–ই মাদীনাতুয্ যাহ্‌রা সম্পর্কে এই চরণগুলো রচনা করেন এবং খলীফাকেও তা শুনান।

يابانى الزهراء مستغرقا اوقاته فيها اما تمهل

له ما احسنها رونقا لو لم تكن زهرتها تذبل

'হে মাদীনাতুয্ যাহ্‌রার প্রতিষ্ঠাতা! যে কিনা স্বীয় জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলো এই নগরের পিছনে নিমজ্জিত রেখেছো, তুমি কি স্থিরচিত্তে কখনও ভেবে দেখো না যে, মাদীনাতুয্ যাহ্‌রা—কত অপরূপ তার লাবণ্য—তবে তাতো তখনই—যদি এ পুষ্প কখনো নেতিয়ে না পড়ত।'

মনে হয় যেন কাজী মুনযির (রহঃ) এই বিলাস–ধামের চরম পরিণতি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করছিলেন। এ অতুলনীয় নগরী চল্লিশ বছর সময়ে যা পূর্ণতা লাভ করে। তা পরিপূর্ণ হওয়ার পর মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর নিজের বাহার দেখাতে পেরেছিল। ৩৯৮ হিজরী সন থেকে সেখানে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। সে গৃহযুদ্ধ চলাকালে মাদীনাতুয্ যাহ্‌রা এমন শোচনীয়ভাবে বিধ্বস্ত হয় যে, তার যাবতীয় সৌন্দর্য, সৌকুমার্য ও প্রভাব–প্রতিপত্তি মুহূর্তের মধ্যে মাটির স্তূপে পরিণত হয়। ৪৩৫ হিজরী সনে আবুল হাযাম নামের স্পেনের একজন মন্ত্রী সেখান দিয়ে অতিক্রম করার কালে দেখতে পান যে, যেই মাদীনাতুয্ যাহ্‌রা এককালে রাজা বাদশাহ ও শাহজাদাদের আবাসস্থল ছিল, এখন সেখানে বনের পশু–পাখীর অবাধ বসবাস চলছে। শিক্ষণীয় করুণ এ দৃশ্য দেখে তিনি এই প্রসিদ্ধ কবিতাটি আবৃত্তি করেন ঃ

قلت يوما لدار قوم تضانوا!

اين سكانک العزاز علينا؟

فاجابت هنا اقاموا قليلا

ثمّ ساروا ولست اعلم اينا؟"

'আমি একদিন নিঃশেষ হয়ে যাওয়া লোকদের আবাসভূমিকে লক্ষ্য করে সুধালাম—তোমাদের সেই অধিবাসীরা আজ কোথায়, যারা

আমাদের বড় প্রিয় ছিলো? সে উত্তর দিলো ঃ ক্ষণিকের তরে তারা এখানে অবস্থান করেছিলো, পরে চলে গেছে। তারা যে কোথায়, তাও আমার জানা নেই।'

আমরা 'জাবালুল আরুসের' মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে। আমাদের সম্মুখে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের একটি কার্যালয়। তার পশ্চাতে উপত্যকার ঢালুতে সুদূর বিস্তৃত মাদীনাতুয্ যাহ্রার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। ১৯১০ ঈসায়ী নাগাদ মাদীনাতুয্ যাহ্রার কোন নামগন্ধও এখানে অবশিষ্ট ছিল না। ১৯১০ ঈসায়ীতে এই পাহাড়ের পাদদেশে প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞরা কিছু নিদর্শন আবিস্কার করে। যার ভিত্তিতে তারা এখানে খনন কাজ আরম্ভ করে। এভাবে এ আলীশান নগরীর এ সমস্ত নিদর্শন আবিস্কৃত হয়। ১৯১০ ঈসায়ী থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে খনন কাজ চলছে। এ আশি বছর সময়ে শহরের বহু অংশ বের হয়ে এসেছে। আমরা এ সমস্ত ধ্বংসাবশেষের বিভিন্ন অংশে শিক্ষা ও অনুতাপের এমন সব নিদর্শন দেখছিলাম, যেগুলোর ব্যাপারে এখন একথা অবগত হওয়াও দুস্কর যে, আসলে এগুলো কী ছিল! এ সম্পূর্ণ খোদাই কাজে শাহী মহলের একটি মাত্র ভবন অনেকটা তার আসল আকৃতিতে বের হয়ে এসেছে। এ ভবনটিকে 'মাজলিসুল মুনিস" বলা হত। স্পেন সরকার ভবনটিকে তার আসল অবস্থায় আনার জন্য নতুনভাবে নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেছে। ভবনের মেহরাব, ছাদ ও মেঝের ভেঙ্গে পড়া পাথরসমূহ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে শোচনীয়ভাবে বিক্ষিপ্তাকারে পতিতাবস্থায় পাওয়া যায়। এখন পাথরগুলোকে জোড়া দিয়ে দিয়ে পুনরায় যথাস্থানে বসানোর কাজ বড় নিপুণতার সাথে সম্পূর্ণ করা হচ্ছে। এর ফলে 'মজলিসুল মু'নিসের' হলকক্ষ অনেকাংশে তার আসল আকৃতিতে পরিদৃষ্ট হচ্ছে।

এ হলরুমের বাইরে একটি বারান্দা রয়েছে। তাতে দাঁড়িয়ে উপত্যকার সুদূর বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। তার পশ্চাতে আদিগন্ত বিস্তীর্ণ সবুজ শ্যামল ভূমি। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, ঋতু, পরিবেশ, জলবায়ু ও নৈসর্গিক অপরূপ দৃশ্য সমাহারের দিক থেকে এই জায়গার নির্বাচন কত সুরুচির সঙ্গে করা হয়েছিল। এখানে বসে আমার এখানকার একজন সাহিত্যিকের স্পেনের স্তুতি সম্বলিত একটি বাক্য স্মরণ হয়।

সে সাহিত্যিকজনকে তৎকালীন শাসক স্পেন ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। সাহিত্যিক ব্যক্তিটি তার এ নির্দেশের ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা করার জন্য সেই শাসকের নামে অন্তরে গভীর রেখাপাতকারী একটি পত্র লেখে। যার ভিত্তিতে উক্ত শাসক তার নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেয়। সেই সাহিত্যিক ব্যক্তিটি পত্রের সূচনা করেছিল একথা দিয়ে ঃ

"ياسيدى كيف افارق الاندلس وهى جنة الدنيا ،
افق صقيل و بسا ط مدبج، و هواء سائح، وماء
متدفق، وطائر مترنم............

'মহাত্মন! কি করে আমি স্পেন ছেড়ে যাব? এটি তো পৃথিবীর বেহেশত! এই নির্মল দিগন্ত, এই নৈসর্গিক লীলাভূমি, এই আন্দোলিত বায়ু, এই উচ্ছল পানি, এই সুরতানের বিহঙ্গ....."

যে দৃশ্য আমাদের সম্মুখে বিরাজ করছিল এর সম্পর্কে উপরোক্ত প্রত্যেকটি বাক্যই প্রকট বাস্তব।

মাদীনাতুয্ যাহ্রার খনন কাজ সুনিপুণ দক্ষতা ও সতর্কতার সাথে এখনও অব্যাহত রয়েছে। এতদিনের খোদাইয়ের ফলে এর যতটুকু অংশ আবিস্কৃত হয়েছে, তার আয়তনও অনেক দীর্ঘ। তা ঘুরে দেখার জন্য বেশ সময় প্রয়োজন। আমরা অল্প সময় এ শিক্ষণীয় স্থান ঘুরে দেখতে থাকি। কিন্তু মাগরিবের সময় ঘনিয়ে আসার ফলে সত্বরই হোটেল অভিমুখে ফিরতি পথ ধরি।

রাতের বেলা এশার নামাযান্তে আহার শেষে আমরা পায়চারি করার উদ্দেশ্যে হোটেল থেকে বের হই। আবহাওয়ায় মনোরম শৈত্য বিরাজ করছিল। কর্ডোভার সুপ্রশস্ত সড়কের উপর দিয়ে এবং সুদৃশ্য ভবনসমূহের মধ্য দিয়ে আমাদের এ পদচারণা বড় উপভোগ্য ছিল। গ্রানাডার ন্যায় এখানে নগরীর কেন্দ্রস্থলে প্রাচীনকালের কোন স্মৃতি–নিদর্শন নজরে পড়ছিল না। মনে হয় যেন সম্পূর্ণ নগরীটি নতুন পরিকল্পনায় নতুন করে গড়ানো হয়েছে। যার মধ্যে ইউরোপিয়ান আধুনিক নগরীসমূহের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান রয়েছে।

এটি ছিল শনি ও রবি'র মধ্যবর্তী রাত। সম্ভবতঃ নগরীর কোন এক

জায়গায় কোন উৎসব চলছিল। ফলে সড়কের প্রাণচাঞ্চল্য আর হৈহুল্লোড়ে এমন লাগছিল যেন, কর্ডোভার সমস্ত অধিবাসী পথে নেমে এসেছে। আমার মনে হল, এদের মধ্যে নাজানি এমন কত লোক রয়েছে, যারা আরব বংশোদ্ভূত এবং তাদের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন মুসলমান। ঈসায়ী আধিপত্যের পর যেই ব্যাপক হারে মানুষদেরকে জোর জবরদস্তি খৃষ্টান বানানো হয়েছে, তার ফলে হাজার হাজার মুসলমান খৃষ্টীয় পল্লীর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে একাকার হয়ে গিয়েছে। তাই স্পেনের বর্তমান অধিবাসীদের মধ্যে নিশ্চয়ই মুসলিম বংশোদ্ভুত অসংখ্য লোক রয়েছে। এখন যদিও তাদের অস্তিত্বে ও আপাদমস্তকে ইসলামী কোন বৈশিষ্ট্য অবশিষ্ট নেই, তবে তাদের কিছু গুণ ও অভ্যাস দেখে মনে হয় যে, এগুলো সেই পুরাতন যুগের স্মৃতি। এতদঅঞ্চল থেকে মুসলিম শাসনের পতন ঘটার পর কয়েক শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতিহাসের পট পরিবর্তন এখানকার চেহারা পাল্টে দিয়েছে। কিন্তু তারপরও আজও তাদের মধ্যে এই কতিপয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য তাদের অতীতের ক্ষুদ্র নিদর্শনরূপে সংরক্ষিত রয়েছে।

প্রথমতঃ, স্পেনের অধিবাসীদের দেহের গড়ন ও মুখাকৃতি ইউরোপের অপরাপর এলাকা থেকে কিছুটা ভিন্নতর। তাদের শ্বেতবর্ণের মধ্যে গোধূম বর্ণের মিশ্রণ এবং মুখাবয়বের তীক্ষ্ণ গঠন তাদের আরব বংশোদ্ভূত হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইউরোপের অপরাপর ভূখণ্ডের বিপরীতে তাদের মধ্যে অধিকতর প্রফুল্লচিত্ততা, বিনম্র আচরণ ও রসোদ্দীপ্ত কথাবার্তা পাওয়া যায়। পরস্পরের সাক্ষাতকালে আবেগ-উষ্ণতার ভাবধারা একান্তই আরবদের ন্যায়। উপরন্তু পরস্পরের সাক্ষাতকালে সর্বপ্রথম যে শব্দটি তাদের মুখে উচ্চারিত হয় তা হল ‘ওলা’ (Ola) সম্ভবত এটি আরবী ‘আহলান’ শব্দের বিকৃত রূপ।

একইভাবে স্পেনের লোকদের মধ্যে কোলাকুলি করা ও পরস্পরকে চুম্বন করার আরবীয় প্রথা আজও বর্তমান রয়েছে। তাছাড়া খানা খাওয়ার পূর্বে এবং খানা খাওয়ার শেষে হাত ধোয়ার দস্তুর এখনও এখানে প্রচলিত রয়েছে, যা ইউরোপের অন্য কোন এলাকায় চোখে পড়েনি। সুতরাং এখানকার বড় বড় হোটেলের রেস্তোরাঁতেও সাধারণতঃ

হাত ধোয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। বাহ্যত এটিও সেই ইসলামী তাহযীবের একটি নিষ্প্রভ স্মৃতি, যা একসময় এই এলাকাকে স্বীয় বরকতরাজি দ্বারা ধন্য করেছিল।

স্পেনিশ ভাষাতেও আরবী ভাষার বহু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ ভাষার অনেক শব্দ মূলত আরবী, যেগুলো সামান্য পরিবর্তন করে স্পেনিশ বানানো হয়েছে। যেমন আরবীতে সেতুকে 'কানতারা' বলা হয়। স্পেনিশ ভাষায় এর নাম Alcantara। চিনিকে আরবীতে 'সুক্কার' বলে। স্পেনিশ ভাষায় Azucar, আরবী 'আরুয' (চাউল)কে স্পেনিশ ভাষায় Arroz বলা হয়। 'আলকারয়া' (গ্রাম)কে Alquria বলা হয়। 'কায়েদ' (নেতা)কে এখনও Al-Caide এবং 'আমীন' (বিশ্বস্ত)কে Al-Amin বলে। মোটকথা, স্পেনিশ ভাষায় আরবী ভাষার প্রভাব এখনও সুস্পষ্ট। স্পেনিশ ভাষার যেসব শব্দ 'আল' (Al) দ্বারা আরম্ভ হয়, সেগুলোর মূল নিঃসন্দেহে আরবী।

মালাগায়

পরদিন সকালে আকাশে মেঘ ছিল। হালকা বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। সেদিনই মালাগা থেকে বেলা ২টায় প্যারিসগামী বিমানে আমাদের সিট বুক করা ছিল। বিমান ধরার জন্য ১টার মধ্যে বিমানবন্দরে পৌঁছা জরুরী ছিল। মালাগা এখান থেকে ২০০ কিলোমিটার দূরে। বৃষ্টির কারণে পৌঁছতে দেরী হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল। তাই আমরা নাস্তার পর অবিলম্বে মালাগার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। দিনটি ছিল রবিবার। সাপ্তাহিক ছুটির দিন। তাই সবাই যার যার বাড়ীতে ছুটি কাটাচ্ছিল। সড়ক ট্রাফিক জ্যামমুক্ত ছিল। কর্ডোভা ছেড়ে আসার পর বৃষ্টিও বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের কার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মসৃণ সড়ক পথে যেন সাঁতরিয়ে চলছে। পথিমধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট গ্রাম ও শহর আসতে থাকে। ছুটির কারণে সব নীরব নিঝুম ছিল। মালাগার প্রায় ২০/২৫ মাইল পূর্ব থেকে সুদৃশ্য নৈসর্গিক-সৌন্দর্য-সমৃদ্ধ একটি পাহাড়সারি আরম্ভ হয়। এটি স্পেনের সুপ্রসিদ্ধ 'আল বাশারাত' (Al-Puxarras) পাহাড়সারি, যা গ্রানাডার দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে সঙ্গে 'আল মারিয়া' পর্যন্ত চলে

গেছে। এক সময় এটিকে স্পেনের সুন্দরতম ভূখণ্ড মনে করা হত। এটিই সেই এলাকা, যেখানে আবু আবদুল্লাহ গ্রানাডা থেকে সিংহাসনচ্যুত হওয়ার পর কিছুদিন অবস্থান করেন। অবশেষে যখন তাকে সেখান থেকেও দেশান্তরিত হতে হয়, তখন এখানকার মুসলমানগণ বহুদিন পর্যন্ত ঈসায়ী হুকুমাতের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালাতে থাকে। তারা নবম হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত খৃষ্টান সেনাবাহিনীর সঙ্গে এখান থেকে মোকাবিলা করতে থাকে।

এ এলাকা নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিক থেকে এতই অপরূপ যে, একটি সুউচ্চ পাহাড়ের চড়াই অতিক্রম করার পর আমরা আর আত্মসংবরণ করতে পারলাম না। এক জায়গায় গাড়ী দাঁড় করে কিছুক্ষণ সম্মুখস্থ বিস্তৃত সুদৃশ্য উপত্যকার মনোহারী দৃশ্য উপভোগ করতে থাকি।

প্রায় ১১টায় আমরা মালাগা শহরে প্রবেশ করি। মালাগা স্পেনের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন শহর। যার বর্ণনা হযরত ঈসা (আঃ)এর যুগের ইতিহাসে পর্যন্ত পাওয়া যায়। মুসলমানদের শাসনকালে এটি একটি পৃথক প্রদেশের প্রধান শহর ছিল এবং বর্তমানেও এটি মালাগা (Malaga) প্রদেশের রাজধানী। মুসলমানদের যুগে এটি স্পেনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর নগরী এবং বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। এখানকার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে আঞ্জীর (ডুমুর) ও আঙ্গুর ছিল সমগ্র স্পেনে প্রসিদ্ধ। মাটির সোনালী পাত্রের মৃৎশিল্পকে মালাগার বিশিষ্টতম শিল্প মনে করা হতো। বর্তমানেও এখানকার এ শিল্প সারাদেশে নাম করা। এ শহরে ৮০০ বছর পর্যন্ত মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখান থেকে বড় বড় আলেম জন্ম নিয়েছেন। যারা 'মালাকী' সম্বন্ধ দ্বারা সুপরিচিত।

যখন স্পেনের বড় বড় শহর ও প্রদেশ খৃষ্টীয় আগ্রাসন ও আধিপত্যের শিকার হয় এবং শুধুমাত্র গ্রানাডা মুসলমানদের হাতে রয়ে যায়; তখনও মালাগা গ্রানাডা সরকারের শাসনাধীন ছিল। কিন্তু শেষ যুগে যখন সুলতান আবুল হাসান গ্রানাডার তখতে আসীন হন, তখন তিনি নিজের কর্তৃত্ব সংকুচিত করে মালাগার শাসন ক্ষমতা স্বীয় ভ্রাতা আয্‌যাগালকে হস্তান্তর করেন। তিনি মালাগাকে একটি স্বায়ত্বশাসিত

রাজ্যের রূপ দেন। আবুল হাসান ও আয্ যাগাল দুই ভাই যৌথভাবে খৃষ্টানদের ঊর্ধ্বমুখী আগ্রাসী অপসংকল্পের মুখে বাধার প্রাচীর খাড়া করার জন্য অব্যাহত জিহাদ আরম্ভ করে দেন। তাদের বিপক্ষে অনেক সফল অভিযান পরিচালনা করেন। এতে করে মুসলমানদের সাহস অনেক গুণ বেড়ে যায় এবং সমগ্র স্পেনব্যাপী খৃষ্টীয় শাসন থেকে মুক্তিলাভের আযাদী আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু এমন সময় আবুল হাসানের পুত্র আবু আবদুল্লাহ অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে স্বীয় পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে গ্রানাডায় নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। এ সময় আবুল হাসান গ্রানাডা থেকে পালিয়ে তাঁর ভাই আয্ যাগালের নিকট চলে আসেন। দুঃখজনক এই ঘটনা গ্রানাডা ও মালাগার মাঝে পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও সহযোগিতার হাত কর্তন করে দেয়। পারস্পরিক এই বিচ্ছিন্নতা ও দ্বন্দ্বের পরিণতিতে খৃষ্টানরা অধিকতর শক্তি লাভ করে। আবুল হাসান ও আয্ যাগাল দুই ভ্রাতা ৮৮৮ হিজরী সন থেকে ৮৯১ হিজরী সন পর্যন্ত খৃষ্টানদের সঙ্গে সর্বোপরি মোকাবেলা করতে থাকেন। অবশেষে ৮৯১ হিজরীতে তাঁরা উভয়ে খৃষ্টানদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁদের শাহাদাতের পর মুসলমানগণ নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। তখন ক্যাষ্টলের খৃষ্টান রাজা ফার্ডিন্যাণ্ড ও সম্রাজ্ঞী ঈসাবেলা এই শহর দখল করে। মালাগার উপর আধিপত্য বিস্তারের পর গ্রানাডার আবু আবদুল্লাহর শাসন ক্ষমতাও সাত বর্ষাধিক কাল টিকে থাকতে পারেনি। ৮৯৮ হিজরীতে আবু আবদুল্লাহ ফার্ডিন্যাণ্ড ও ঈসাবেলাকে গ্রানাডাও হস্তান্তর করে।

মুসলমানদের শাসনকালে মালাগা যদিও একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর ছিল, তবে গ্রানাডা ও কর্ডোভার মত শহরের মোকাবেলায় তা ছিল ছোট শহর। কিন্তু আজ তার অবস্থা ঠিক উল্টো। আয়তন, অধিবাসী ও নগর সুবিধাদির দিক থেকে বর্তমানের মালাগা, কর্ডোভা ও গ্রানাডার তুলনায় অনেক বড় শহর। বন্দর নগরী হওয়ায় ও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থাকায় এর গুরুত্ব বর্তমানের কর্ডোভা ও গ্রানাডা থেকে অনেক গুণ বেশী। মালাগার সমুদ্র উপকূলকেও বড় সুন্দর উপকূল মনে করা হয়। এখানকার আবহাওয়া ইউরোপের অপরাপর দেশের মত খুব বেশী ঠাণ্ডা নয়। ফলে

শহরটি বিরাট ও প্রধান পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

মালাগায় ইসলামী যুগের স্মৃতি-নিদর্শন তালাশ করেও এখন পাওয়া যায় না। বলা হয় যে, মুসলমানদের যুগের একটি বাজার এখনও বিদ্যমান রয়েছে। এটি বর্তমানে তরকারীর বাজার রূপে ব্যবহার করা হয়। মালাগার জামে' মসজিদ—যাকে খৃষ্টীয় আধিপত্যের পর গীর্জায় পরিণত করা হয়েছে—এখন শহরের গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন ভবন। এছাড়া শহরের উত্তরে কিছু দূরে সমুদ্র উপকূলে মুসলমানদের যুগের একটি কেল্লা আজও অক্ষত রয়েছে। একে জাবালে ফারা (Gibral fara) দুর্গ বলা হয়।

(আল আসারুল উন্দুলুসিয়া আল বাকীয়া, পৃষ্ঠা ২৪৮, মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ গানান কৃত কায়রো থেকে ১৩৮১ হিজরীতে প্রকাশিত)

কিন্তু এ সমস্ত ঐতিহাসিক স্থান দেখতে যাওয়ার জন্য যেমন দরকার ছিল সময়, তেমনি একজন পথপ্রদর্শকও। আমাদের হাতে দু'টির কোনটিই ছিল না, তাই এসব স্থানে আমরা যেতে পারিনি।

ইনতাকীরা

বিমানে পৌঁছার পূর্বে যে অল্প সময় হাতে ছিল তাতে আমরা শহরটিকে একনজর দেখা ছাড়াও মানচিত্রের সাহায্যে এমন একটি সমুদ্র উপকূল নির্বাচন করতে সক্ষম হই, যা বিমানবন্দরের পশ্চিমে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। মানচিত্রে তার নাম লেখা ছিল Antequerra। এটি মূলত মালাগা প্রদেশের একটি প্রাচীন শহর 'ইনতাকীরার' বিকৃত রূপ, যা সমুদ্রের উত্তরে বেশ উঁচুতে অবস্থিত। বলা হয় যে, এখানে ইসলামী যুগের নগররক্ষা প্রাচীরের কিছু নিদর্শন এখনও অবশিষ্ট রয়েছে এবং নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের উপর মুসলমানদের যুগের একটি আলীশান কেল্লাও রয়েছে। শহরের পূর্ব দিকে একটি টিলা রয়েছে, তার মধ্যে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৬৫ ফুট নীচে একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষ রয়েছে। এটিকে প্রাগৈতিহাসিক কালের একটি ভূগর্ভস্থ কবরস্থান মনে করা হয়। শহরের অদূরের পাহাড়টিতে মর্মর পাথরের একটি খনি রয়েছে। এই শহরের অধিবাসীদের মধ্যে আবু বকর ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মাদ আনসারী হাকীমে ইনতাকীরী নামে একজন প্রসিদ্ধ কবি অতিক্রান্ত হয়েছেন। শহরটি ৮১৩ হিজরী পর্যন্ত মুসলমানদের শাসনাধীন ছিল। পরবর্তীতে যখন এখানে খৃষ্টানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত

হয়, তখন এখানকার মুসলমানগণ এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে গ্রানাডায় বসবাস আরম্ভ করে। সুতরাং আলহামরা ভবনের অদূরের একটি মহল্লা এ নামের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আজও ‘ইনতাকীরা’ (Antequerra) নামে প্রসিদ্ধ রয়েছে।

(উন্দুলুস কা তারিখী জুগ্রাফিয়া ঃ পৃঃ ১৩৬, মুহাম্মাদ এনায়েতুল্লাহ কৃত, হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য থেকে প্রকাশিত)

কিন্তু বর্তমানে ইনতাকীরা একটি বিনোদনের শহর। যা আকাশচুম্বী হোটেল ও ভাড়ায় দেওয়া ফ্লাটে পরিপূর্ণ। মানুষ সমুদ্র উপকূলকে উপভোগ করার জন্য এখানে সপ্তাহ কাল অবস্থান করে। শীতকাল হওয়ার ফলে এখন এখানে বেশী ভীড় ছিল না। শুনেছি যে, গ্রীষ্মকালে এ এলাকা পর্যটকদের দ্বারা জনাকীর্ণ হয়ে যায়।

আমরা অল্প সময়ের জন্য ইনতাকীরার উপকূলীয় সড়ক (Drive Marine) এর উপর গাড়ী দাঁড় করাই। সমগ্র উপকূলটি ছিল নীরব নিঝুম। সম্মুখে ভূমধ্যসাগরের তরঙ্গমালা পার্শ্বপরিবর্তন করছিল। এ সমুদ্রেরই বুক চিরে এক সময় মুসলমানগণ স্পেনের উপকূলে উপনীত হয়েছিলেন। এ সমুদ্রই সেসব মুজাহিদের বীরত্ব উপভোগ করেছিল, যাঁদের সম্পর্কে কবি ইকবাল বলেছেন—

تھا یہاں ہنگامہ ان صحرا نشینوں کا کبھی
بحر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی
زلزلے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے
بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے

“এখানে একসময় সেই মরুচারীদের কর্মচাঞ্চল্য ছিল,
সমুদ্র ছিল যাঁদের নৌবহরের ক্রীড়াস্থল।
যাঁদের ভয়ে শাহানশাহদের দরবার প্রকম্পিত হতো।
যাঁদের তরবারী বিদ্যুৎ–তরঙ্গের আবাস ছিল।”

এটিই সেই সমুদ্র, যে ৮০০ বছর পর সেই বীর মুজাহিদদেরই উত্তরসূরিদেরকে জরাজীর্ণ অবস্থায় জাহাজে সওয়ার হয়ে মরক্কো অভিমুখে যেতে দেখেছে। এমন করুণ সময় ছিল, যখন কোন ব্যক্তি স্বীয়

পরিবার–পরিজনের সঙ্গে এখান থেকে পালানোর সুযোগ লাভ করলে তার জন্য সৌভাগ্য মনে করা হত এবং তাকে ঈর্ষার নজরে দেখা হত। এ সমুদ্রেই ইসলামের ইতিহাসের প্রসিদ্ধ নাবিক খায়রুদ্দিন বারবারুসার জাহাজ বহু বছর পর্যন্ত স্পেনিশ মুহাজিরদেরকে ঈসায়ীদের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করে মরক্কো ও আলজেরিয়া পর্যন্ত পৌছানোর খেদমত আঞ্জাম দিতে থাকে। আর আজ সেই সমুদ্রের তীরেই পর্যটন, বিনোদন ও বিলাসবহুলতাপূর্ণ খোদাবিস্মৃতির এই আড্ডা প্রতিষ্ঠিত।

وَ تِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

আর আমি এই দিবসসমূহকে অদল–বদল করিতে থাকি লোকদের মধ্যে। (আলে ইমরান ঃ ১৪০)

আমার বন্ধু ও সফরসঙ্গী সাঈদ সাহেব স্পেনের অতীত ও বর্তমানের অবস্থার কথা চিন্তা করে এতই প্রভাবান্বিত ছিলেন যে, এক পর্যায়ে তার মুখ থেকে একথা বেরিয়ে পড়ে যে, ‘আর কি কখনো মুসলমানগণ এ ভূখণ্ডকে পুনরায় ঈমানের আলোয় আলোকিত করতে পারবে?’

আমি নিবেদন করলাম, ‘এখন তো মুসলমানগণ নিজেদের ভূখণ্ডসমূহকেই ঠিকভাবে সামলাক। সেখানেও যেন স্পেনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না ঘটে, এতটুকু ব্যবস্থা করলেও তাদের জন্য অনেক।’

স্পেনে মুসলমানদের উত্থানের কারণসমূহ যেমন স্পষ্ট তাদের পতনের কারণসমূহও তেমনই স্পষ্ট।

شمشیر وسناں اول، طاؤس و رباب آخر

اب یہ ہمارا کام ہے کہ کن اسباب کو اپنے لئے اختیار کرتے ہیں؟

অর্থ ‘প্রথমে তীর ও তরবারী, শেষে সুর ও সঙ্গীত।’

এখন আমাদের কাজ হল, আমরা কোন্ কারণগুলোকে অবলম্বন করবো তা নির্বাচন করা।

Contents

ব্রুনাই সফর

ব্রুনাই সফর

'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী' (ইসলামী ফেকাহ একাডেমী) একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা কেন্দ্র। এটি মুসলিম দেশসমূহের সংগঠন 'মুনায্যামাতুল মু'তামারিল ইসলামী' (অরগানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স, সংক্ষেপে যাকে ও.আই.সি. বলা হয়)এর তত্ত্বাবধানে ১৯৮৩ ঈসায়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানের মৌলিক উদ্দেশ্য ফেকাহ সংক্রান্ত নতুন নতুন সমস্যা নিয়ে সম্মিলিত গবেষণা চালানো এবং ফেকাহর ময়দানে নানামুখী গবেষণামূলক কর্ম সম্পাদন করা।

প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৪ ঈসায়ী থেকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে তার কার্য আরম্ভ করে। এরপর থেকে প্রতি বছর তার সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সভার প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ পূর্ব থেকে নির্ধারণ করে সে বিষয়ে বিশিষ্ট আলিমদের দ্বারা গবেষণা–সমৃদ্ধ প্রবন্ধ লেখানো হয়। পরে তা পরিষদের সদস্যদের সমীপে প্রেরণ করা হয়। তারা প্রবন্ধসমূহের উপর বিশদভাবে চিন্তা–গবেষণা করেন। তারপর বার্ষিক সভায় এ সমস্ত প্রবন্ধ নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়। পরিশেষে প্রত্যেক বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যা একাডেমীর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত বলে বিবেচিত হয়।

১৯৮৪ ঈসায়ী থেকে এখন পর্যন্ত একাডেমীর বড় বড় ৮টি বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তন্মধ্যে থেকে প্রত্যেকটি সভার বিস্তারিত বিবরণ একটি বৃহদাকার পত্রিকায় অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশিত হয়। (তার মধ্যে পেশকৃত প্রবন্ধসমূহ, সদস্যদের পক্ষ থেকে ব্যাপক আলোচনা এবং একাডেমীর সিদ্ধান্ত সবই অন্তর্ভুক্ত থাকে।) এ পর্যন্ত এ সংক্রান্ত ১৭টি বৃহদাকার ভলিউম জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছে।

এই একাডেমীর একজন সদস্য হিসেবে আমি প্রতিবছর তার বার্ষিক সভার বৃত্তান্ত 'মাসিক আল বালাগের' সফরনামা প্রবন্ধে তুলে ধরে থাকি।

এ বছর ব্রুনাই দারুস সালামের সরকার একাডেমীর অষ্টম সভার আতিথ্য সম্পাদনের প্রস্তাব করেছিলেন। সুতরাং এ সভা ১৪১৪ হিজরী সনের মহররম মাসে ব্রুনাইয়ের রাজধানী বন্দরশ্রী বাগওয়ান–এ অনুষ্ঠিত হয়।

বার্ষিক সভায় একাডেমীর নিয়মিত সদস্যগণকে ছাড়া মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ড থেকে বহু আলিমকে বিশেষ দাওয়াতের মাধ্যমেও নিমন্ত্রণ করা হয়। এবার পাকিস্তান থেকে আমার শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ রফী' উসমানী সাহেব (মহাপরিচালক, দারুল উলূম করাচী) এবং ভারত থেকে মাওলানা মুজাহিদুল ইসলাম কাসেমী সাহেবকে বিশেষভাবে দাওয়াত করা হয়।

২১শে জুন সভা আরম্ভ হওয়ার কথা। কিন্তু বিমানের শিডিউলের কারণে আমাদেরকে ১৮ই জুন রাতে করাচী থেকে রওয়ানা করতে হয়। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ রফী' উসমানী সাহেব (মু. যি. আ.) ও আমি অধম রাত ১০টায় সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের বিমানে রওয়ানা হই। সকাল ৬টার কাছাকাছি সিঙ্গাপুর অবতরণ করি। কয়েক ঘন্টা সময় সিঙ্গাপুর শহরে অতিবাহিত করে দুপুর সাড়ে ১২টায় রয়েল ব্রুনাই এয়ারলাইন্সের বিমানে আরোহণ করি। সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতা ও সুব্যবস্থাপনার দিক থেকে বিমানটির তুলনা সে নিজেই। দুপুরে আহারের সময় খাদ্য তালিকা সামনে এলে এজন্য মনে বড় আনন্দ হল যে, পানীয় দ্রব্যের সুদীর্ঘ ও নানারকম তালিকার মধ্যে কোন পানীয়ই এ্যালকোহল মিশ্রিত ছিল না। বরং ত.লিকার নীচে নোট লেখা ছিল যে, ব্রুনাইয়ের সীমানার মধ্যে এ্যালকোহল মিশ্রিত পানীয়ের অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধই শুধু নয়, বরং তার ব্যবহার একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। সেজন্য কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করা হতে পারে।

খাদ্যের তালিকায় গোশতও ছিল। তবে এ গোশত সিঙ্গাপুরের সাধারণ দোকান থেকে নেওয়া কিনা সে ব্যাপারে অধমের সন্দেহ ছিল। তাই আমি বিমানের এক কর্মীকে জিজ্ঞাসা করি, ‘এ গোশত কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে?’ তিনি সাথে সাথে উত্তর দিলেন, ‘আপনি মোটেও ভাববেন না, ব্রুনাই এয়ারলাইন্সে হালাল জবাইয়ের বিশেষ ব্যবস্থা

রয়েছে। এয়ারলাইন্সে ব্যবহৃত সমস্ত গোশত শরয়ী পদ্ধতিতে জবাইকৃত এবং হালাল।'

প্রায় আড়াই ঘন্টা সময় সমুদ্রের উপর দিয়ে ওড়ার পর বিমানটি অবতরণ করতে আরম্ভ করে। কিছুক্ষণ পরই ডানদিকে ব্রুনাইয়ের সবুজ-শ্যামল অপূর্ব সুন্দর দ্বীপ দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। প্রায় ৩টার সময় ব্রুনাইয়ের রাজধানী বন্দরশ্রী বাগওয়ানের বিমানবন্দরে আমরা অবতরণ করি। এখানে আমাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর জেনারেল সেক্রেটারী শেখ হাবীব বালখুজা, ব্রুনাইয়ের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ইসলামী আইন বিষয়ের উপদেষ্টা ডক্টর আনোয়ারুল্লাহ সাহেব (তিনি একজন পাকিস্তানী) এবং মন্ত্রণালয়ের ও একাডেমীর উচ্চপদস্থ অফিসারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ভি.আই.পি. লাউঞ্জে কিছু সময় তাঁদের সঙ্গে ব্রুনাইয়ের সার্বিক অবস্থা ও কনফারেন্স সম্পর্কে আলোচনা হয়। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী ব্রুনাইয়ের অধিবাসী। তিনি পাকিস্তানকে গভীরভাবে ভালবাসেন। আর এ ভালবাসার টানেই তিনি বেশ উর্দূ শিখেছেন। তিনি আমাদের সঙ্গে খুব আগ্রহ নিয়ে বেশ দ্রুত উর্দূতে কথা বলছিলেন। কিছুক্ষণ পর একজন প্রোটোকল অফিসারের সঙ্গে আমাদেরকে হোটেলে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। এখানকার হোটেলগুলো বিশ্বের বড় বড় শহরের হোটেলের ন্যায় খুব বেশী জাঁকজমকপূর্ণ নয়। তবে সাদামাটার মধ্যেই প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা রয়েছে। এ অধমের অবস্থান হয় রিওয়ারভিউ হোটেলে, যা কিনা শহরের হাতেগোনা বিশিষ্ট হোটেলসমূহের অন্যতম। যে কক্ষে আমি অবস্থান করি, তার প্রাচীরের কাঁচ ভেদ করে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত সবুজ-শ্যামল নিঃসর্গের অপরূপ দৃশ্যাবলী সর্বদাই দেখা যেত। হোটেল কক্ষে পূর্ব থেকে একটি কাগজ রাখা ছিল। তাতে মাসের সমস্ত নামাযের সময়সূচী ছাপানো ছিল। কক্ষে কেবলার চিহ্নও বিদ্যমান ছিল। এ সমস্ত কারণে স্পষ্ট উপলব্ধি হচ্ছিল যে, আমরা একটি ইসলামী দেশের হোটেলে অবস্থান করছি।

ব্রুনাই দারুস সালাম চীন সাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছোট একটি দেশ। যার মোট আয়তন মাত্র পাঁচ হাজার সাতশত পঁয়ষট্টি বর্গ

কিলোমিটার এবং অধিবাসী আড়াই লাখের কিছু বেশী। দেশটি মালয়েশিয়ার বোর্ণিও দ্বীপের উত্তর–পশ্চিমে অবস্থিত। তার সীমান্ত মালয়েশিয়ার সারাওয়াক রাজ্যের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। সেখানকার অধিবাসীর সত্তর শতাংশ মালয় বংশোদ্ভূত সুন্নী মুসলমান। আর প্রায় ৩০ শতাংশ চাইনিজ ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তাদের সিংহভাগ অমুসলিম। এদেশের রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় ভাষা মালয় তবে তারা ব্যাপকহারে ইংরেজী ভাষা বলে এবং বোঝে।

বিষুবরেখার অতি নিকটবর্তী হওয়ায় এখানে শীত নেই। তবে এত অধিক হারে বর্ষণ হয় যে, খুব বেশী গরমও হতে পারে না। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস।

ব্রুনাই দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার একটি প্রাচীন রাজ্য। আধুনিক কিছু আবিষ্কার দ্বারা জানা যায় যে, আনুমানিক ৬ষ্ঠ বা ৭ম হিজরী শতাব্দীতে মধ্যপ্রাচ্যের কতিপয় মুসলমান বণিক দ্বারা এতদঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটে। সে সময় পুরো বোর্নিও দ্বীপটিতে একটি অমুসলিম রাজবংশের আধিপত্য ছিল। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে এই রাজ্যের পতন ঘটে এবং বোর্নিওর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশেষে পঞ্চদশ খৃষ্ট শতাব্দীতে ব্রুনাই এতদঞ্চলের সর্বাধিক শক্তিধর রাজ্য বলে পরিগণিত হতে থাকে। ষোড়শ খৃষ্ট শতাব্দীতে সুলতান বালকিয়ার নেতৃত্বে ব্রুনাইয়ের নৌবাহিনী বোর্নিওই শুধু নয়, বরং ফিলিপাইনের কতক অঞ্চল পর্যন্ত নিজেদের বিজয় ধারার বিস্তৃতি ঘটায়।

কিন্তু খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ সম্পূর্ণ এলাকায় পশ্চিমা উপনিবেশের আধিপত্য বিস্তার হয়। ফলে ব্রুনাইয়ের সিংহভাগ এলাকা তার প্রভাবাধীনে চলে যায় এবং ব্রুনাই রাজ্য সংকুচিত হতে হতে তার বর্তমান সীমানায় চলে আসে। ব্রুনাইয়ের বর্তমান বাদশাহ হাসান বালকিয়া বয়সে তরুণ। তিনি বর্তমানে রাজবংশের ঊনবিংশতিতম মুকুটধারী। তিনি পঁচিশ বছর বয়সে সিংহাসনে আসীন হন।

ব্রুনাই একটি স্বায়ত্বশাসিত দেশ হলেও পশ্চিমা সাম্রাজ্যের আধিপত্য ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাকে বৃটিশের কর্তৃত্বে থাকতে বাধ্য করে। সেখানে একটি পৃথক বৃটিশ রেসিডেন্ট অবস্থান করত। ১৯৭১ ঈসায়ীতে বৃটিশের প্রভাব

প্রতিপত্তি শুধুমাত্র পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ও প্রতিরক্ষা বিষয়ে সীমাবদ্ধ করা হয়। অবশেষে ১৯৮৪ ঈসায়ীতে দেশটি পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। এভাবে এটি একটি নতুন ইসলামী দেশরূপে পুনর্বার বিশ্ব মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে।

যে রাজবংশ শত শত বছর ধরে ব্রুনাইয়ের শাসনকার্য চালিয়ে আসছে, অতীতে দ্বীনের ঐতিহ্য ও নিদর্শনসমূহের ক্ষেত্রে সর্বদাই তাদের সুনাম ছিল। স্বাধীনতা লাভের পরও তারা ব্রুনাইকে একটি সত্যিকারের ইসলামী দেশরূপে গড়ার সংকল্প ব্যক্ত করে এবং এতদবিষয়ে কিছু বাস্তব পদক্ষেপও গ্রহণ করে। তার মধ্যে মদ নিষিদ্ধ করার আইনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃথক একটি অধিদপ্তর প্রচলিত আইনসমূহকে ইসলামী আইনে রূপান্তরিত করার কাজ করে যাচ্ছে। পাকিস্তান থেকে ডক্টর আনোয়ারুল্লাহ সাহেবকে এ উদ্দেশ্যেই এখানে আনা হয়েছে। তিনি জামেয়া আশরাফিয়া লাহোর থেকে শিক্ষা সমাপনকারী একজন আলিম। পরবর্তীতে তিনি ইংরেজী ভাষা ও কতিপয় আধুনিক বিজ্ঞান নিয়েও লেখাপড়া করেন। আমি যখন ফেডারেল শরীয়ত কোর্টের জজ ছিলাম, তখন তিনি আদালতের উপদেষ্টা রূপে সেখানে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন। সেখানে তাঁর বহুমুখী যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। কয়েক বছর পর্যন্ত ফেডারেল শরীয়ত কোর্টে কাজ করার ফলে তাঁর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতায় উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি ঘটে। ব্রুনাই সরকারের ইসলামী আইন সংকলনের কাজের জন্য যোগ্য ও উপযুক্ত একজন লোক চাওয়ার প্রেক্ষিতে এঁকে নির্বাচন করা নিঃসন্দেহে একটি উৎকৃষ্ট নির্বাচন ছিল। বর্তমানে তিনি একাগ্রতার সঙ্গে এ কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন।

শরীয়তের অনুশাসন বাস্তবায়নের প্রতি ব্রুনাই সরকারের আন্তরিকতার একটি ফল এও যে, এবার তিনি মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর বার্ষিক অধিবেশনের আতিথ্যের জন্য নিজের থেকে আবেদন করেছেন এবং তা অনুষ্ঠিত করার জন্য উন্নতমানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

আমরা ১৮ই জুন বুধবার বিকেলে ব্রুনাই পৌঁছি। বৃহস্পতি ও

শুক্রবারে আমাদের কোন প্রোগ্রাম ছিল না। একাডেমীর অধিবেশন শনিবার সকাল থেকে আরম্ভ হবে। তাই এ দু'দিন ব্রুনাইয়ের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেখা ও দোস্ত–আহবাবদের সঙ্গে মোলাকাত করার কাজে ব্যয় হয়। আমাদের বন্ধু মুহাম্মাদ তারেক সাহেব এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক। তিনি গভীর হৃদ্যতার সাথে পাকিস্তানী বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন, বড় উপভোগ্য দাওয়াতের ইন্তেজাম করেন এবং শহরের উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহ ঘুরিয়ে দেখান।

২১শে জুন শনিবার ব্রুনাই–এ ১লা মুহাররম ছিল। এভাবে সেখানে নতুন হিজরী বৎসরের সূচনা হচ্ছিল। খুব জাঁকজমকের সাথে হিজরী বর্ষের সূচনা করা ব্রুনাইয়ের ঐতিহ্য। এ সময় ভবনসমূহ সজ্জিত করা হয়। সাধারণ সভা–সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাদশাহ কোন সাধারণ সমাবেশে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন। এবার মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর উদ্বোধনী অধিবেশন রাখা হয়েছিল মহররমের পহেলা তারিখে, যার সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং শাহ হাসান বালকিয়া।

বন্দরসেরী ভগওয়ান ব্রুনাইয়ের রাজধানী এবং সেখানকার বড় শহর। এই শহরের একপ্রান্তে আন্তর্জাতিক কনফারেন্সসমূহের জন্য একটি বিশাল কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। তার নাম ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশান সেন্টার। সংক্ষেপে একে সাধারণতঃ আইসিসি বলা হয়। মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর সমস্ত অধিবেশন এই কমপ্লেক্সেই হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল।

কমপ্লেক্সের প্রধান হলকক্ষে উদ্বোধনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সুলতান হাসান বালকিয়া, যাঁর রাষ্ট্রীয় উপাধি 'মুইযযুদ্দীন ওয়াদ্দৌলা'। তিনি স্বীয় যুবরাজ সন্তান ও ভ্রাতা সহকারে অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি লিকলিকে দীর্ঘদেহের এক তরুণ যুবক। ব্যক্তিগতভাবে তিনি বর্তমান বিশ্বের সম্ভবতঃ ধনাঢ্যতম ব্যক্তি। এখন পর্যন্ত তাঁর রাজ্যে ঐতিহ্যবাহী শাহী আদব রক্ষা করার প্রতি পূর্ণ গুরুত্বারোপ করা হয়। বক্তৃতা ও লেখনীতে যখনই তার নাম নেওয়া হয়, তাঁর সমস্ত উপাধি ও মর্যাদা উল্লেখ করেই নেওয়া হয়।

আরবীতে তা এভাবে বলা হয়—

جلالة الـملك الواثق بالله السلطان الـحاج حسن البلقية مـعز الدين والد ولة ابن الـمرحوم السلطان الـحاج عمر عـلى سيف الدين سعد.الـخير والدين، سلطان سلطنة بروناى دارالسلام

এমনকি বারবার এ সমস্ত উপাধির পুনরাবৃত্তির ফলে অনেক সময় বিরক্তির উদ্রেক হয়।

তাছাড়া এ প্রথাটি আজও এখানে প্রচলিত রয়েছে যে, সুলতানের সাক্ষাতপ্রার্থী তদসম্মুখে এমনভাবে মাথা নোয়ায় যে, তার মাথা সুলতানের বক্ষ বরাবর চলে আসে। এভাবে মাথা নোয়ানোর এ প্রথা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের পরিপন্থী তো বটেই, তাছাড়া রুচিশীল মানসের জন্যও তা অসহনীয়। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, এই তরুণ বাদশাহ, যিনি নিজ দেশে ইসলামী মূল্যবোধের প্রসার ও ইসলামী সামাজিকতার উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট, তিনি এমনতর অর্থহীন প্রথাসমূহকে এখনও কেন এবং কি করে ধরে রেখেছেন!

তবে একথা সত্য যে, ব্রুনাইয়ের জনগণ তাদের বাদশাহকে ভালবাসে এবং তাঁর কর্মধারায় তারা মোটের উপর সন্তুষ্ট এবং পরিতৃপ্ত। সুলতান হাসান আল বালকিয়ার সভাপতির উদ্বোধনী ভাষণ ছিল উৎকৃষ্টতম ইসলামী আবেগের উজ্জ্বল দর্পণ। তিনি মুসলিম বিশ্বের যে সমস্ত সমস্যার কথা উল্লেখ করেন, তার মধ্যে কাশ্মীরের মুসলমানদের উপর আপতিত বর্বরোচিত অত্যাচারের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিষয়টি এদিক থেকে বড়ই গুরুত্বপূর্ণ যে, ভারতের সঙ্গে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার কারণে কতিপয় দেশ কাশ্মীরের নাম নিতেও হকচকিয়ে ওঠে। কিন্তু সুলতান বালকিয়া বরং কাশ্মীরের সমস্যাকে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ন্যায় ও নীতির সমস্যা বলে আখ্যা দেন। তিনি বিষয়টিকে ঐ সমস্ত সমস্যার অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেন, যেগুলোর সমাধান সমগ্র মুসলিম উম্মাহর দায়িত্বে অপরিহার্য।

অধিবেশন শেষে সুলতান কনফারেন্সের সকল নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে এক এক করে সাক্ষাত করেন এবং তাঁদের সম্মানে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেন।

মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর কার্য–অধিবেশনসমূহ ২২শে জুন রবিবার সকাল থেকে আরম্ভ হয় এবং যথারীতি সকাল ৯ ঘটিকা থেকে বেলা দেড় ঘটিকা পর্যন্ত এবং বিকাল ৫ ঘটিকা থেকে রাত ৮ ঘটিকা পর্যন্ত প্রত্যহ দু'টি করে অধিবেশন চলতে থাকে। মধ্যবর্তী বিরতির সময় খসড়া প্রস্তুতকারী কমিটির বৈঠক হতে থাকে এবং পূর্বের ন্যায় এবারেও বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অবিরাম কর্মব্যস্ততা থাকে। অধিবেশনের এজেণ্ডার মধ্যে সাংগঠনিক বিষয়সমূহ ছাড়া জ্ঞান–বিজ্ঞান সংক্রান্ত ১৩টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল, যেগুলো সম্পর্কে আলেমগণ গবেষণাসমৃদ্ধ প্রবন্ধ তুলে ধরেন। প্রতিটি বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ, উপকারী ও মনোমুগ্ধকর আলোচনা–পর্যালোচনা হতে থাকে। অবশেষে এ সমস্ত বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তার মধ্যের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহের সারকথা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. ফেকাহভিত্তিক মাযহাবসমূহের সহজ পন্থাসমূহকে কাজে লাগানো

এ বিষয়টি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ভূখণ্ডে জোরালোভাবে উত্থাপন করা হচ্ছে যে, বিভিন্ন মুজতাহিদ ফকীহগণের মাযহাবসমূহের সব কয়টি যেহেতু যথাস্থানে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য তাই প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেক সমস্যার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা থাকা চাই যে, সে নিজের জন্য যে মাযহাবকে সহজ মনে করবে, তা অবলম্বন করবে। এ মানসিকতা যেহেতু কোনরূপ শর্তের পাবন্দি ছাড়া মুসলিম বিশ্বে রেওয়াজ পাচ্ছে তাই মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী বরাবর এ বিষয়ে সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণ করার দাবী উত্থাপন করা হয়। আলেমগণ দ্বারা এ বিষয়ে প্রবন্ধরাজি লিপিবদ্ধ করানো হয়েছিল এবং এ বিষয়ে পেশকৃত এমন প্রবন্ধের সংখ্যা ছিল ২০এর কাছাকাছি। মুহতারাম ভাই হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ রফী' উসমানী সাহেব (মুঃ যিঃ, মহাপরিচালক, দারুল উলূম করাচী)এর প্রবন্ধও এ বিষয়েই ছিল এবং ভারত থেকে আগত জনাব মাওলানা মুজাহিদুল ইসলাম সাহেবও এ বিষয়েই প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

প্রবন্ধসমূহের সারাংশ অধিবেশনে উত্থাপিত হওয়ার পর এ সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা হয়। পরিশেষে খসড়া প্রস্তুতকারী কমিটি কর্তৃক

প্রস্তুতকৃত যে সমস্ত সিদ্ধান্ত অধিবেশন শেষে গৃহীত হয় তার গুরুত্বপূর্ণ অংশের সারকথা এই—

ধারা নম্বর–৪ ঃ ফেকাহ বিষয়ক মাযহাবসমূহের সহজ পন্থাসমূহকে নিছক রিপুতাড়িত হয়ে গ্রহণ করা জায়েয নেই। কারণ, এর পরিণতি শরীয়তের বিধি–বিধানের অনুশাসন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া। তবে নিম্নোদ্ধৃত বিধিসমূহকে মান্য করে ফেকাহ বিষয়ক কোন মাযহাব কর্তৃক প্রদত্ত সহজ পন্থাকে অবলম্বন করা যেতে পারে।

ক. ফেকাহবিদদের যে উক্তি গ্রহণ করা হবে তা গ্রহণযোগ্য হতে হবে। তা ব্যতিক্রমধর্মী উক্তি (শায) না হতে হবে। বাস্তবিক কোন সংকট দূর করার জন্য সত্যিকার অর্থেই তার সে উক্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে এমন পরিস্থিতি হতে হবে।

খ. চাই সে প্রয়োজন সমাজের ব্যাপক বা বিশেষ প্রয়োজন হোক, কিংবা ব্যক্তিগত প্রয়োজন হোক।

গ. সেই উক্তি গ্রহণকারী ব্যক্তি এমন আলেম হতে হবে, যিনি ফেকাহবিদদের উক্তিসমুহের মধ্যে কোন একটি নির্বাচন করার যোগ্যতা রাখেন, অথবা এমন ব্যক্তি হতে হবে, যে এমন কোন আলেম ব্যক্তির উপর নির্ভর করে তা গ্রহণ করছে।

ঘ. সহজ পন্থাটি গ্রহণ করার দ্বারা নিষিদ্ধ 'তালফীক' অবশ্যাম্ভাবী না হতে হবে। এ সম্পর্কে ৬ নম্বর ধারায় আলোচনা আসছে।

ঙ. সহজ পন্থাটি অবলম্বন করার দ্বারা শরীয়তে অসিদ্ধ এমন কোন উদ্দেশ্য পুরা করার ইচ্ছা না থাকতে হবে।

চ. এই সহজ পন্থাটি গ্রহণ করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্তর নিষ্কন্টক হতে হবে।

ধারা নম্বর–৬ ঃ 'তালফীক' (অর্থাৎ একই বিষয়ের দু'টি শাখা বিষয়ে পৃথক পৃথক ফকীহের উক্তি গ্রহণ করা) নিম্নোল্লেখিত অবস্থাসমূহে নিষিদ্ধ—

ক. যখন এটি শুধুমাত্র নফসের খাহেশাতের উদ্দেশ্যে সহজ পন্থা গ্রহণ করা কিংবা ৪ নম্বর ধারায় উল্লেখিত শর্তসমূহের মধ্য থেকে কোন শর্তের বিরুদ্ধাচারণ করে গ্রহণ করা হবে।

খ. যখন এর দ্বারা কোন বিচারপতির রায়কে প্রত্যাখ্যান করা হবে।

গ. যখন কোন বিষয়ে একজন মুজতাহিদের তাকলীদ করে এক ধরনের আমল করার পর অন্য মুজতাহিদের উক্তি গ্রহণ করে তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।

ঘ. যখন 'তালফীকের' পরিণতিতে এজমায়ের বিরুদ্ধাচরণ করা হবে কিংবা এমন কোন পন্থা অবলম্বন করা হবে, যা এজমায়ের বিরুদ্ধাচরণকে অবশ্যম্ভাবী করে।

ঙ. যখন 'তালফীকের' পরিণতিতে এমন কোন সম্মিলিত অবস্থা অস্তিত্ব লাভ করবে, যা কোন মুজতাহিদের নিকটই গ্রহণযোগ্য নয়।

সড়ক দুর্ঘটনা ও তার বিধি-বিধান

অধিবেশনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল 'সড়ক দুর্ঘটনা' ও তা থেকে উদ্ভূত ফেকাহ বিষয়ক সমস্যাদি। এ বিষয়েও অনেকগুলো প্রবন্ধ লেখা হয়। অধমের প্রবন্ধটিও এ বিষয়েই ছিল। এ অধম ছাড়া আরও যেসকল ব্যক্তিত্ব এ বিষয়ে বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাদের মধ্যে কাতারের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি শায়েখ আবদুল কাদের আল আম্মারী, কুয়েতের বিচারপতি শায়েখ হাসান এবং সুদানের সুপ্রসিদ্ধ আলিম শায়েখ আতা আস্‌সায়্যিদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়েও সবিস্তারে পর্যালোচনা হয়। পরিশেষে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তার সারাংশ এই—

ধারা-১ ঃ ক. যে সমস্ত ট্রাফিক আইন শরীয়ত পরিপন্থী নয়, সেগুলো মেনে চলা শরীয়তের দৃষ্টিতেও ওয়াজিব। কারণ, দেশের ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয়সমূহে শাসকের আনুগত্য শরীয়তের দৃষ্টিতেও জরুরী।

খ. সর্বসাধারণের কল্যাণের দাবী এই যে, ট্রাফিক আইন লংঘনের ব্যাপারে প্রতিরোধমূলক উপযুক্ত বিধান তৈরী করতে হবে। তাতে ট্রাফিক আইন লংঘনের কারণে সম্ভাব্য শাস্তি ও জরিমানা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

ধারা-২ ঃ সড়কপথে গাড়ী চালনায় যে সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটে তার উপর

শরীয়তের 'জেনায়াত' (ফৌজদারী) সংক্রান্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। গাড়ীচালক অন্য কোন ব্যক্তির দেহের বা সম্পদের যে ক্ষতিসাধন করে, সে এর জন্য দায়ী হবে। তাকে নিম্নোদ্ধৃত পরিস্থিতিসমুহ ছাড়া দায়মুক্ত গণ্য করা যাবে না।

ক. দুর্ঘটনা এমন কোন অপ্রতিহত শক্তির ফলে ঘটলে যাকে প্রতিহত করা তার ক্ষমতার বাইরে এবং তা থেকে আত্মরক্ষা করে চলাও তার জন্য অসম্ভব। আর এ অবস্থা তখনই হবে, যখন মানুষের এখতিয়ার বহির্ভূত অভাবনীয় কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে।

খ. যখন দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তি নিজেই এমন কোন কর্ম করে, যা দুর্ঘটনার জন্য অধিক প্রভাবশালী কারণ হয়।

গ. দুর্ঘটনাটি যখন তৃতীয় কোন ব্যক্তির কর্ম বা সীমালংঘনের ফলে সংঘটিত হবে, তখন এই তৃতীয় ব্যক্তি দুর্ঘটনার জন্য দায়ী হবে।

ধারা–৩ ঃ কোন জীব–জন্তু সড়কে চলে আসার কারণে পথে যেসব দুর্ঘটনা ঘটে, তার দায়দায়িত্ব ঐ পশুর মালিকের উপর বর্তাবে যদি কিনা দুর্ঘটনা ঐ পশুর কোন কাজের ফলে ঘটে থাকে। আর তার মালিক সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ত্রুটি করে থাকে। উক্ত শর্তদ্বয় পাওয়া গেল কি গেল না এই ফায়সালা বিচারপতি করবে।

ধারা–৪ ঃ গাড়ীচালক ও দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তি উভয়ের সম্মিলিত কর্মের ফলে দুর্ঘটনা ঘটে থাকলে তাদের প্রত্যেকের উপর অপরের জানমালের ক্ষতির জরিমানা আরোপিত হবে।

ধারা–৫ ঃ ক. উপরোল্লিখিত বিস্তারিত বিধানসমূহের অধীনে মৌলিক বিধান এই যে, দুর্ঘটনা সৃষ্টিকারী সর্বাবস্থায় ক্ষতির দায়দায়িত্ব বহন করবে। চাই তার থেকে সীমালংঘন হোক বা না হোক। আর দুর্ঘটনার কারণ সৃষ্টিকারী কেবলমাত্র তখনই ক্ষতির দায়িত্ব বহন করবে, যখন তার তরফ থেকে কোনরূপ ত্রুটি কিংবা সীমালংঘন পাওয়া যাবে।

খ. দুর্ঘটনা সৃষ্টিকারী ও তার কারণ সৃষ্টিকারী উভয়ের সম্মিলিত কর্মের ফলে যখন কোন ক্ষতিসাধিত হবে, তখন জরিমানা দুর্ঘটনার কারণ সৃষ্টিকারীর উপর নয় বরং সরাসরি দুর্ঘটনা সৃষ্টিকারীর উপর বর্তাবে। তবে হাঁ, যদি দুর্ঘটনার কারণ সৃষ্টিকারীর পক্ষ থেকে কোন

সীমালংঘন হয়ে থাকে এবং দুর্ঘটনা সৃষ্টিকারীর পক্ষ থেকে সীমালংঘন না হয়ে থাকে তাহলে সে এরজন্য দায়ী হবে।

গ. দুর্ঘটনার কারণ সৃষ্টিকারী যদি দু'জন হয় এবং তাদের প্রত্যেকের কর্ম ক্ষতির কারণ হয় তাহলে তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মের প্রতিক্রিয়া পরিমাণ ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব বহন করবে। উভয়ের প্রতিক্রিয়া সমান সমান হলে কিংবা উভয়ের প্রতিক্রিয়ার পরিমাণ পৃথকভাবে জানা না গেলে, উভয়ের উপর সমপরিমাণে জরিমানা আসবে।

এ সমস্ত বিধানের বিস্তারিত আলোচনা এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা সেসবের আলোকপাত ঐ প্রবন্ধসমূহে মওজুদ রয়েছে, যেগুলো সমাবেশে পেশ করা হয়েছিল এবং সেগুলো একাডেমীর পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। এ অধমের প্রবন্ধ 'হাওয়াদিসুস্ সায়ের' বা সড়ক পথের দুর্ঘটনা, এতদসংক্রান্ত চুলচেরা বিশ্লেষণ, তার উপর আলোকপাত এবং তার দলীল প্রমাণের সমন্বয়ে রচিত হয়েছে।

নিলাম ও টেণ্ডার প্রার্থীতার বিধি-বিধান

নিলাম যদিও ব্যবসায়ের প্রাচীন একটি পন্থা, কিন্তু বর্তমান যুগে তার রূপ ও প্রকৃতি বেশ বিচিত্র। টেণ্ডার প্রার্থীতার মাধ্যমেও বহু পণ্য ও কাজের নিলাম করা হয় বিধায় এর কিছু বিষয়ও ফেকাহর দৃষ্টিতে গবেষণার দাবীদার। এসব বিষয়েও গবেষণালব্ধ প্রবন্ধসমূহ লিপিবদ্ধ করানো হয়। অবশেষে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের সারাংশ এই ঃ

১. 'আকদুল মুযায়াদা' তথা নিলাম বেচাকেনা ও ভাড়া উভয় ক্ষেত্রেই হতে পারে।

২. নিলামের জন্য যে কর্মপন্থা, নিয়ম-কানুন ও শর্ত-শারায়েত নির্ধারণ করা হয় তা শরীয়তের কোন বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হতে হবে।

৩. নিলামে অংশগ্রহণকারীর জন্য (টেণ্ডারদাতা বা যে ডাক তোলে তার থেকে) জামানত স্বরূপ অর্থ চাওয়া যেতে পারে। তবে শর্ত হল, যার টেণ্ডার গৃহীত হবে না তার জামানতের অর্থ ফিরিয়ে দিতে হবে এবং যার

টেণ্ডার গৃহীত হবে তার জামানতের অর্থ মূল্যের অর্থের সঙ্গে যোগ করতে হবে।

৪. নিলাম বা টেণ্ডার দাখিলের জন্য এই পরিমাণ ফিস নির্ধারণ করা যেতে পারে, যা এতদসংক্রান্ত কাগজপত্র প্রভৃতির প্রকৃত মূল্য পরিমাণ হবে।

৫. একটি ইসলামী ব্যাংক কিংবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য তার লাভজনক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পুঁজি বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে লোকদের থেকে টেণ্ডার আহবান করা বৈধ হবে। যাতে করে সে অধিক হারে মুনাফা লাভ করতে পারে।

৬. এমন প্রতিটি পন্থা, যার মাধ্যমে ক্রেতাদেরকে ধোকা দিয়ে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের অধিক মূল্য প্রকাশ করা হয়, তা 'প্রতারণার' অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম হবে।

মুদ্রা সংক্রান্ত সমস্যা

মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস ঘটায় যে সমস্ত সমস্যা দেখা দেয় তার মধ্য থেকে কিছু বিষয় সম্পর্কে 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী' তার মতামত ইতিপূর্বে প্রকাশ করেছে। যেমন, ইতিপূর্বে সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, ঋণ ও বাকী মূল্যসমূহকে মূল্য নির্দেশিকা (Price Index)এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যাবে না। এ ধরনের সম্পৃক্তি সুদ বলে গণ্য হবে। তবে এতদসংক্রান্ত কিছু সমস্যার সমাধান বর্তমান অধিবেশনে চূড়ান্ত করা হয়। যেমন ঃ

১. মজুরি নির্ধারণকে মূল্য নির্দেশিকার (Price Index) সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারবে। অর্থাৎ মজুরিদাতা ও তা গ্রহীতার মধ্যে এই চুক্তি হতে পারবে যে, প্রতিবছর মজুরির পরিমাণের মধ্যে এত শতাংশ বৃদ্ধি করা হবে, যত শতাংশ বৃদ্ধি ঐ বছরের মূল্য নির্দেশিকায় থাকবে। তবে বিগত বছরের মজুরী ও ভাড়া—যা পরিশোধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে—তার পরিশোধকে মূল্য নির্দেশিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যাবে না। কারণ, অপরিহার্যভাবে পরিশোধযোগ্য হওয়ার পর মজুরী পরিশোধকারীর দায়িত্বে ঋণ বলে পরিগণিত হয়। আর ঋণকে মূল্য নির্দেশিকার সঙ্গে যুক্ত করা শরীয়তে জায়েয নাই।

২. যেদিন ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার ঋণ পরিশোধ করছে, সেদিন পারস্পরিক সম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারবে যে, ঋণ অন্য কোন মুদ্রার মাধ্যমে পরিশোধ করা হবে। তবে প্রথমত, ঋণ পরিশোধের দিনের পূর্বে এমন চুক্তি করা জায়েয নেই। দ্বিতীয়ত, ঋণ পরিশোধের দিন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও এই শর্তে জায়েয আছে যে, ঋণের অর্থ অন্য মুদ্রায় রূপান্তর সেদিনের মুদ্রার বাজার-মূল্য অনুপাতে হতে হবে।

৩. বিক্রি বা ভাড়া করার সময় উভয় পক্ষ মূল্যের বাকী পরিমাণ কিংবা ভাড়ার বিলম্বিত পরিমাণ নির্দিষ্ট কোন এক মুদ্রা, একাধিক মুদ্রা বা নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ দ্বারা নির্ধারণ করতে পারে।

৪. যে ঋণ কোন এক মুদ্রার মাধ্যমে পরিশোধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে তা অন্য কোন মুদ্রার মাধ্যমে পরিশোধ করার শর্তারোপ পূর্ব থেকে করা জায়েয নেই। (যেমন ঃ টাকা ধার নেওয়ার সময় বলা হল যে, ডলারের মাধ্যমে এটি পরিশোধ করতে হবে।)

এ বিষয়েও অধিবেশনে দীর্ঘ আলোচনা হয় যে, কাল্পনিক কোন মুদ্রা—যেমন, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের দীনার কিংবা ইসলামী বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল Special drawing কে ঋণদান ও তা পরিশোধের ভিত্তি সাব্যস্ত করা যাবে কিনা? কিংবা এমন কোন অর্থ সংক্রান্ত কাগজ তৈরী করা যাবে কিনা, যা ঋণপ্রদান ও তা পরিশোধের ক্ষেত্রে মুদ্রার ন্যায় ব্যবহার করা হবে, তবে তা মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হবে না। একইভাবে এ মাসআলাটিও আলোচনায় আসে যে, যেসব দেশের মুদ্রার মূল্য অতি দ্রুত পড়ে গিয়েছে, যেমন লেবানন, সিরিয়া ও মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ—এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে 'মন্দা বাজারের' অধীন সাব্যস্ত করে একথা বলা যাবে কিনা যে, এখন সাবেক ঋণ মুদ্রার বর্তমান মূল্য অনুপাতে পরিশোধ করতে হবে? কিন্তু এসব বিষয়ে এজলাস চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি। তাই এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এ সমস্ত বিষয় নিয়ে অধিক গবেষণা ও পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে এবং এ সমস্ত সমস্যার অনেক দিক এমনও রয়েছে, যেগুলো প্রবন্ধ বা আলোচনার আওতায় আনা সম্ভব

হয়নি। কাজেই, এসব বিষয়ে আরও প্রবন্ধ লেখানোর প্রয়োজন রয়েছে। তাই আগামী অধিবেশন পর্যন্ত এগুলোকে মুলতবী করা হয়েছে।

'বাইয়ুল আরবুন'

'বাইয়ুল আরবুন' বেচাকেনার ঐ পন্থাকে বলে, যার মধ্যে ক্রেতা বায়নার টাকা এ শর্তে প্রদান করে যে, যদি সে জিনিসটি ক্রয় করে তাহলে এ অর্থ মূল্যের অংশ বলে পরিগণিত হবে আর মূল্যের অবশিষ্ট অংশ সে পরিশোধ করবে। কিন্তু সে যদি বস্তুটি ক্রয় না করে তাহলে বায়নাপত্রের অর্থ সে ফিরে পাবে না। বরং এ অর্থ বিক্রেতার অধিকারে চলে যাবে।

বায়নাপত্রের অর্থ এভাবে নিয়ে নেওয়া হানাফী, শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবে জায়েয নেই, তবে হাম্বলী মাযহাবে জায়েয আছে। এ বিষয়টিও 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী'র বর্তমান অধিবেশনের আলোচনায় আসে। প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ সদস্য এ বিষয়ে হাম্বলী মাযহাব অনুপাতে মত প্রকাশ করেন, যার ভিত্তিতে 'বাইয়ুল আরবুনের' বৈধতার সিদ্ধান্ত সিংহভাগ সদস্য কর্তৃক মঞ্জুর হয়, তবে কতিপয় সদস্য এর বিরোধিতা করেন। তাদের মধ্যে এ অধম ছাড়া সুদানের শায়েখ সিদ্দিক আয যরীর, কাতারের শায়েখ আলী আহমাদ আস্ সালুস, হিন্দুস্তানের মাওলানা মুজাহিদুল ইসলাম কাসেমী এবং আরো কতিপয় ব্যক্তিত্ব রয়েছেন।

চিকিৎসা সংক্রান্ত কিছু সমস্যা

চিকিৎসা সংক্রান্ত অনেকগুলো মাসআলাও সাম্প্রতিক অধিবেশনের এজেণ্ডার অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'আল মুনায্যামাতুল ইসলামিয়া লিল উলুমিত তিব্বীয়া বিল কুয়েত' (চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক ইসলামী সংস্থা, কুয়েত)—যা মুসলিম চিকিৎসকদের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন–এর প্রতিনিধিরাও তাদের অনেক সমস্যা নিয়ে অধিবেশনে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু এ সমস্ত সমস্যা নিয়ে প্রাথমিক আলোচনার পর অধিক গবেষণার জন্য বিষয়গুলোকে পিছিয়ে দেওয়া হয়। তবে এ

সম্পর্কিত তিনটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যার একটি সিদ্ধান্ত ছিল চিকিৎসা বিষয়ক গোপন তথ্য সংরক্ষণ ও তার বিধান সংক্রান্ত। একটি ছিল, এইড্‌স থেকে রক্ষার কৌশল সংক্রান্ত, আর একটি ছিল মহিলাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত। প্রথম দু'টি বিষয়ের সিদ্ধান্তসমূহ একদিকে অতি দীর্ঘ অপরদিকে তার মধ্যে ফেকাহ বিষয়ক মাসআলা কম এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সুপারিশ অধিক বিধায় সেগুলো এখানে উদ্ধৃত করার জরুরত নেই। তবে মহিলাদের চিকিৎসা বিষয়ক যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

"শরীয়তের মূল বিধান এই যে, অসুস্থ নারীর চিকিৎসার জন্য কোন মুসলমান মহিলা চিকিৎসক পাওয়া গেলে রোগীর দেহের কোন অংশ উন্মুক্ত করার জন্য তার থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করা জরুরী। যদি মুসলমান মহিলা চিকিৎসক পাওয়া না যায়, তাহলে অমুসলিম মহিলা চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করানো যেতে পারে। তবে পুরুষ দ্বারা চিকিৎসা করানোর জন্য শর্ত এই যে, সে রোগীর দেহের শুধুমাত্র ঐ অংশটুকু দেখবে, যা রোগ নির্ণয়ে ও চিকিৎসা প্রদানের জন্য অপরিহার্য, এর অধিক নয়। উপরন্তু যতদূর সম্ভব দৃষ্টি আনত রেখে কাজ করবে। চিকিৎসাকালীন সময় রোগীর কোন মোহরেম, স্বামী কিংবা নির্ভরযোগ্য কোন মহিলা সেখানে উপস্থিত থাকবে যেন নির্জনতা সৃষ্টি না হয়।"

আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিকাহ সংস্থা মুসলিম দেশসমূহের সরকারদের সমীপে এ সুপারিশও করে যে, তারা নিজ নিজ দেশে মহিলা ডাক্তারদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের প্রতি যেন মনোযোগ আরোপ করে যাতে করে মহিলাদের চিকিৎসার জন্য ব্যতিক্রমী পথ গ্রহণ করতে না হয়।

এ ভ্রমণ বৃত্তান্তে অধিবেশনে গৃহীত সমস্ত সিদ্ধান্তের মূল বা অনুবাদ তুলে ধরা আমার লক্ষ্য নয়। শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সিদ্ধান্তের সারাংশ এখানে তুলে ধরা হল। অধিবেশনের পরিপূর্ণ কার্যবিবরণ ইনশাআল্লাহ পত্রিকারূপে পৃথকভাবে প্রকাশিত হবে, যা 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী' জেদ্দার ঠিকানায় সংগ্রহ করা যেতে পারে।

'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী'র অধিবেশনের সুবাদে প্রায় নয়দিন ব্রুনাই অবস্থান করি। যদিও এ দিনগুলোর বেশীর ভাগ সময় আমার

অবস্থান স্থল ও কনফারেন্স হলের মধ্যেই কেটে যায়, তবুও মধ্যবর্তী বিরতির সময়গুলোতে কয়েকটি নিমন্ত্রণে অংশগ্রহণ এবং এখানকার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে মত বিনিময়েরও সুযোগ হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাকিস্তানী প্রভাষকের বসবাস রয়েছে। তাদের সঙ্গেও দেখা–সাক্ষাত হয় এবং তাদের একটি সমাবেশে বক্তব্য দানেরও সুযোগ হয়।

ব্রুনাই একটি সচ্ছল দেশ। মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে এটি বিশ্বের সর্বাধিক ধনী দেশ। এখানকার অধিবাসীদের জন্য শিক্ষা ও চিকিৎসা সহ সবকিছু বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। এ দেশের একজন লোকও এমন নেই, যার নিজস্ব গাড়ী নেই। সুতরাং এখানে বাস ইত্যাদি জাতীয় পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নেই। এমনকি আমার পুরা অবস্থানকালে একটি ট্যাক্সীও চোখে পড়েনি। সারাদেশে আইন শৃংখলা আদর্শমানের। নিরাপত্তা ঈর্ষণীয় পর্যায়ের। অপরাধমূলক ঘটনা না ঘটারই সমান।

এদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রাচীন কাল থেকে এখানকার লোকেরা নদীর মধ্যে বাড়ী বানিয়ে বসবাস করাকে পছন্দ করে। এ ধরনের বসতিকে 'ওয়াটার ভিলেজ' বলা হয়। ওয়াটার ভিলেজের অধিবাসীরা নিজেদের বাসস্থানে পৌছার জন্য নৌকা ব্যবহার করে থাকে। কতক জায়গায় বাড়ীর একদিকে নদী ও অপরদিকে স্থল রয়েছে। স্থলের দিকে এদের গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকে, আর নদীর দিকে থাকে নৌকা। এখানকার লোকদের মন–মেজাজে সরলতা ব্যাপক। ধন–দৌলতের প্রাচুর্য সত্ত্বেও এদের মধ্যে খুব বেশী জাঁকজমক ভাব নেই। ভবনসমূহও বেশীর ভাগ সাদামাটা। তাদের জীবন–যাপন ধাঁচও সহজ সরল।

আল্লাহ তাআলা এ দেশকে তেলসম্পদে সমৃদ্ধ করেছেন। সারাদেশ সবুজ–শ্যামলিমা ও বনজঙ্গল দ্বারা আবৃত। দেশের অধিবাসীদের তুলনায় সম্পদের পরিমাণ অধিক। একই অনুপাতে সমস্যা ও জটিলতাও খুব কম। জনগণের মধ্যে ইসলামী চিন্তা–চেতনা ও ইসলামী কর্মকাণ্ডের প্রতি আকর্ষণ সুস্পষ্ট। মসজিদসমূহ অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ। তবে ধর্মীয় মাদ্রাসা বিরল। এখানকার আলেমগণ বেশীর ভাগ 'আল আজহার' থেকে

শিক্ষাপ্রাপ্ত। বর্তমানে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয়েছে। সরকার কুরআন হিফজ করার প্রতি উৎসাহিত করার জন্য হাফেজদের বিশেষ ভাতা নির্ধারণ করেছে। প্রায় সকল মুসলমান অধিবাসী শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। মাযহাবের অনুসরণে তারা খুব দৃঢ়। সবাই পাকাপোক্ত সুন্নী। শিয়া মতবাদের প্রতি তারা বিরূপ ভাবাপন্ন।

রাজত্বের ঐতিহ্যপূর্ণ প্রথাসমূহ সরকারের মধ্যে খোলামেলা পর্যায়ের হলেও মোটের উপর শাসক গোষ্ঠীর মনোভাব ধার্মিকদের প্রতি বৈরী নয়, বরং সহমর্মিতামূলক। এদিক থেকে দেশটির একটি আদর্শ ইসলামী দেশ হওয়ার যথেষ্ট যোগ্যতা বিদ্যমান রয়েছে। ছোট এই দেশটিকে—যা নানারকম সম্পদে সমৃদ্ধশালী—ইসলামী ছাঁচে ঢেলে গড়া কিছুমাত্র কঠিন নয়। সরকার এদিকে মনোযোগী এবং এর ফলে কিছু কিছু আইন পরিবর্তনও করা হয়েছে। একটি সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নারীদের পোশাক–আশাকে পর্দা ও শালীনতার দাবী পূরণের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে যে দ্রুতগতি ও আবেগ–আগ্রহের সাথে এখানে ইসলাম বাস্তবায়নের কাজ হওয়া সম্ভব, তাতে এখনও যথেষ্ট কমতি রয়েছে। তারপরও অন্যান্য অনেক মুসলমান দেশের সঙ্গে তুলনা করে দেখা হলে এই ছোট দেশটি এ যুগে বিশেষ গনীমত বটে। আল্লাহ তাআলা একে নিরাপদ রাখুন এবং এর সরকার ও জনসাধারণকে অধিক তাওফীক দানে ভূষিত করুন। আমীন।

তুরস্কে কয়েকদিন

তুরস্কে কয়েকদিন

গত কয়েকদিন আমি তুরস্কের ইস্তাম্বুল নগরীতে অতিবাহিত করি। তুরস্ক যেহেতু কয়েক শতাব্দীকাল সমগ্র মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্র, মুসলমানদের শৌর্য-বীর্যের প্রতীক এবং রাজনীতি ও কৃষ্টি-কালচারের দিক থেকে বড় বিচিত্র রকমের ইতিহাস-সমৃদ্ধ একটি দেশ, তাই আমার মত তালিবে ইলমের জন্য এ দেশের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক সহজাতবিষয়। আমি ইতিপূর্বেও তুরস্কে গিয়েছি। সে ভ্রমণ বৃত্তান্তও আমার 'জাহানে দিদাহ' (হারানো ঐতিহ্যের দেশে) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এটি হাতে গোনা এমন কয়টি দেশের অন্যতম, যেখানে আমার মত তালিবে ইলম কোনরূপ বিরক্তিভাব ছাড়াই বারবার যেতে পারে।

ইস্তাম্বুল পৃথিবীর প্রাচীনতম একটি শহর। এটি তার ভৌগলিক অবস্থান কেন্দ্রের দিক থেকেও একক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কারণ, এর একাংশ এশিয়া এবং অপরাংশ ইউরোপে অবস্থিত। তার পরতে পরতে সঞ্চিত ইতিহাসের দিক থেকে যে গুরুত্ব এর রয়েছে, তার ভিত্তিতে নির্দ্বিধায় বলা হয় যে, রোম ও এথেন্স ছাড়া অন্য কোন নগরী এক্ষেত্রে তার সমকক্ষ হতে পারে না। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে এই শহরের নাম এত অধিক পরিমাণে পরিবর্তিত হয়েছে যে, সম্ভবত পৃথিবীর অন্য কোন দেশের এত অধিক পরিমাণ নাম পরিবর্তিত হয়নি। শহরটির প্রাচীনতম নাম ছিল সম্ভবত 'জারগ্রাদ'। তারপর একেই মিকলাগার্দ (Myclagard) বলা হত। গ্রীক ও রোমানদের সূচনাতে এর নাম বাইজেন্টিয়া (Byzantia) রাখা হয়। তারপর যখন খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রোম সম্রাট কনষ্ট্যান্টিন (Constantine) এই শহরকে তার রাজধানীতে পরিণত করেন, তখন এর নাম কনষ্ট্যান্টিনোপল (Constantinople) রাখা হয়। একে 'নতুন রোম'ও বলা হত। বাইজেন্টিনা লোকেরা একে 'হি-পোলিস' (He polis) নামে

আখ্যায়িত করত। হি–পোলিস অর্থ শহর। সম্ভবত আরবীতে এরই অনুবাদ 'মাদীনাতুর রূম' (রোম নগরী) দ্বারা করা হয়। সুতরাং প্রাচীন আরবী ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এর নাম 'মাদীনাতুর রূম' উল্লেখ করা হয়েছে। শহরটি যখন মুসলমানদের হাতে আসে, তখন কিছু লোক একে 'ইস্তাম্বুল' বলতে আরম্ভ করে। পরবর্তীতে এ নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামবুল' বানানো হয়। উসমানী খেলাফতের সরকারী কিছু কাগজপত্রেও এর নাম 'ইসলামবুল' লেখা হয়েছে। কিন্তু এর যথারীতি রাষ্ট্রীয় নাম 'কনষ্ট্যান্টিনোপলই' ছিল। ওসমানী খেলাফতের শেষ দিকে একে 'আসেতানা দারুস সা'আদা' এবং 'আলবাবুল আলী' নামও দেওয়া হয়। অবশেষে যখন ওসমানী খেলাফতের বিলুপ্তি ঘটে, তখন ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ থেকে এর যথারীতি রাষ্ট্রীয় নাম 'ইস্তাম্বুল'ই চলে আসছে। বর্তমানে এটি এ নামেই প্রসিদ্ধ।

শহরটি ১১০০ বছর রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। এর উত্থানকালে এটি ছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ শক্তি। খৃষ্টানদের প্রাচ্যের গীর্জার কেন্দ্রীয় শহরও ছিল এটিই। এর প্রধানকে পেট্রিয়ার্ক (Patriarch) বলা হতো। এবং পাশ্চাত্যের গীর্জার মোকাবেলায় একে 'দি হলি অর্থোডাক্স চার্চ' বলা হত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে এ শহর বিজয়ের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। ফলে মুসলমানগণ প্রত্যেক যুগে একে জয় করার চেষ্টা চালিয়ে আসে। সাহাবা ও তাবেঈনদের প্রথম যে বাহিনীটি কনষ্ট্যানটিনোপল অভিযানে যাত্রা করে, তাঁদের মধ্যে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু সেখানেই হয়। বর্তমানে ইস্তাম্বুলে তাঁর মাযার সাধারণ ও বিশিষ্ট জনদের যিয়ারতস্থলে পরিণত হয়েছে।

বিভিন্ন মুসলমান সুলতানের আক্রমণের পর সর্বশেষে কনষ্ট্যান্টিনোপল বিজয়ের সৌভাগ্য আলে উসমান খান্দানের সপ্তম তরুণ খলীফা সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ লাভ করেন। তিনি স্থলপথে জাহাজ চালানোর ঐতিহাসিক কৃতিত্ব সম্পাদন করে এ নগরী জয় করেন। তারপর এটি খেলাফতে উসমানীয়ার রাজধানীতে পরিণত হয়। প্রায় পাঁচশ' বছর পর্যন্ত এটি সমগ্র মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রের মর্যাদা অধিকার

করে। নগরীটি এ সমস্ত বহুমুখী বৈশিষ্ট্যের ধারক হওয়ার ফলে মরহুম ইকবাল এভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন—

خطۂ قسطنطنیہ، یعنی قیصر کا دیار
مہدیٔ امت کی سطوت کا نشان پائیدار
صورتِ خاکِ حرم یہ سرزمیں بھی پاک ہے
آستانِ مسند آرائے شہِ لولاک ہے

نکہتِ گل کی طرح پاکیزہ ہے اسکی ہوا
تربت ایوب انصاریؓ سے آتی ہے صدا
اے مسلماں! ملتِ اسلام کا دل ہے یہ شہر
سیکڑوں صدیوں کی کشت وخوں کا حاصل ہے یہ شہر

"কনষ্ট্যান্টিনোপলের ভূখণ্ড অর্থাৎ কায়সারের দেশ।
এটি উম্মাতের 'মাহদীর' শৌর্য–বীর্যের সুদৃঢ় প্রতীক।
হেরেমের মাটির ন্যায় এ ভূখণ্ডও পবিত্র।
এটি ইহ–পরকালের সম্রাট হযরত মুহাম্মাদ (সা.)এর
শাহী তখতের চৌকাঠ।
ফুলের সৌরভের ন্যায় পবিত্র এর বায়ু।
হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ)এর কবর থেকে সর্বদা এ আহবান উচ্চকিত হচ্ছে—
হে মুসলমান! ইসলাম ধর্মের প্রাণ এ শহর।
শত শত বছরের পরিশ্রমের ফসল এ শহর।"

পরিশেষে মুসলমানদের রাজনৈতিক পতনের সূচনাও এখান থেকেই হয় এবং খেলাফত উৎখাতের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের উপর সর্বাধিক কার্যকরী আঘাতটি এখানেই হানা হয়।

এ সম্পর্কে প্রাচ্যের কবি বলেন—

چاک کردی ترکِ ناداں نے خلافت کی قبا
سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ

"নাদান তুর্কীরা খেলাফতের পরিধেয় ছিন্ন করেছে।
স্বজনদের সরলতা দেখ আর অরাতীদের চাতুরতাও দেখ।"

তুরস্ক ও ইস্তাম্বুলের বিস্তারিত আলোচনা আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত 'জাহানে দীদাহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছি। এখন তুরস্কের সাম্প্রতিক সফরের কিছু প্রতিক্রিয়া পাঠক সমীপে তুলে ধরছি।

১. কামাল আতাতুর্কের যুগ থেকে এখানে ধর্মনিরপেক্ষতার রাজত্ব চলছে। শুরুর দিকে এটি অদ্ভুত এক ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যবস্থা ছিল। এ ব্যবস্থায় মুসলমানদের নিখাঁদ ধর্মীয় নিদর্শন ও প্রতীকসমূহের উপরও চরম কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। মানুষ আযানের জন্য পর্যন্ত ছটফট করত। আরবী ভাষায় ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাদানকে অপরাধ গণ্য করা হয়েছিল। জোর-জবরদস্তি টুপির জায়গায় হ্যাট পরানোর জন্য যথারীতি রক্তাক্ত নাটক রচনা করা হয়। মোটকথা, ধর্মহীনতার এমন সব উন্মাদনার (Fanatic) প্রদর্শন এখানে দেখা গেছে, যা সম্ভবত আলমে ইসলামের অন্য কোন ভূখণ্ডে দেখা যায়নি। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে এ সমস্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলেও দেশের রাজনৈতিক অবকাঠামো ধর্ম নিরপেক্ষই রয়ে যায়। কেউ ধর্মীয় তৎপরতার সাহস দেখালে তার উপর দমন-পীড়ন নীতি দীর্ঘদিন পর্যন্ত বলবৎ থাকে। এখন আল্লাহর মেহেরবানীতে অবস্থার বিশেষ অনুকূল পরিবর্তন আসছে।

ধর্মীয় তৎপরতার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাপূর্ণ জটিল ও ধৈর্যসংকুল অবস্থার মধ্যেও ধর্মীয় গোষ্ঠী সাহস হারিয়ে নির্জীব বসে থাকেননি, বরং তারা বিভিন্ন দিক থেকে নিজেদের কাজ অব্যাহত রেখেছেন। এ ব্যাপারে তিন শ্রেণীর প্রচেষ্টা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ ঐ সমস্ত আলেম, যাঁরা দৃশ্যপটের অন্তরালে চলে যাওয়া সত্ত্বেও ইসলামী শিক্ষা সংরক্ষণের জন্য জান বাজি রেখে কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। দ্বিতীয়টি ছিল আল্লামা বদিউজ্জামান নুরসী (রহঃ)এর সেই অরাজনৈতিক আন্দোলন, যা

দাওয়াত ও তাবলীগ এবং সংস্কার ও পরিশুদ্ধির মাধ্যমে তরুণদের ধর্মীয় প্রশিক্ষণ দান এবং তাদের মধ্যে ইসলামী প্রাণ সঞ্চারের কৃতিত্ব বিস্ময়কর পন্থায় আঞ্জাম দিয়েছে। এমনকি সম্ভবত জীবনের কোন শাখা এমন ছিল না, যার মধ্যে নুরসী আন্দোলনে প্রভাবিত লোকদের বিরাট একটি সংখ্যা বিদ্যমান ছিল না। তৃতীয়, নাজমুদ্দীন আরবোকান সাহেবের সেই রিফাহ পার্টি, যা রাজনৈতিক অঙ্গনে ইসলামী তৎপরতা ফিরিয়ে আনার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। বর্তমানে কিছুদিন ধরে এই তিন গোষ্ঠীর সঙ্গে তাবলীগ জামাতের প্রভাবশালী তৎপরতাও যোগ হয়েছে। তারা নিজেদের নিরেট তাবলীগী ও সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক বিশেষ আঙ্গিকে কাজ করে যাচ্ছে। এর প্রভাবাধীন গণ্ডি দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. উপরে বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে যে ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে সেখানকার ধর্মীয় গোষ্ঠীকে আনন্দিত ও আশান্বিত দেখতে পাই, তা হলো, কয়েক মাস পূর্বে তুরস্কে যে পৌর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে নাজমুদ্দীন আরবোকান সাহেবের রিফাহ পার্টি উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে। বর্তমানে দেশের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পৌরসভায় এ পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। এ পার্টির লোকই মেয়র নির্বাচিত হয়েছে। যেদিন আমি ইস্তাম্বুল পৌঁছি, তার কয়েকদিন পূর্বে পৌরসভার কিছু অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনী ফলাফলে পত্র-পত্রিকা ছিল পরিপূর্ণ। এ ফলাফল অনুপাতেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে রিফাহ পার্টির সদস্যরা বিজয়ী হয়। তুরস্কের যে সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর কথা উপরে আলোচনা করা হল, তাদের মধ্যে মতাদর্শিক ও কর্মপন্থা ভিত্তিক মতবিরোধ থাকলেও রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থানে সীমাবদ্ধ না থেকে নিজেদের শক্তিকে সম্মিলিত করে কেবলমাত্র রিফাহ পার্টিকে সমর্থন ও সহযোগিতা করে। যার ফলাফল সবারই সফলতারূপে আত্মপ্রকাশ করে। সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে এখনও বেশ দেরী আছে। কিন্তু এরা খুবই আশাবাদী যে, তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সুন্দর ও উন্নত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দ্রুত ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে। যদি কোন প্রকারের বহির্দেশীয়

অস্বাভাবিক হস্তক্ষেপ প্রতিবন্ধক না হয় তাহলে আগামী সাধারণ নির্বাচনেও ইনশাআল্লাহ রিফাহ পার্টি বিশেষ সাফল্য অর্জন করবে।

৩. যেহেতু পৌর নির্বাচনের পর বেশীদিন অতিক্রান্ত হয়নি এবং কিছু অঙ্গ প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন ঠিক ঐদিনই শেষ হয়েছিল যেদিন আমি ইস্তাম্বুলে পৌঁছি, ফলে সেখানকার পরিবেশ নির্বাচনী উত্তেজনায় প্রভাবান্বিত ছিল। কিন্তু একটি বিষয় এমন অভাবনীয় ছিল—যা আমাদের দেশের কেউই উপলব্ধি না করে পারবে না—তা এই যে, নির্বাচনের এই গরম বাজারে খুনাখুনি, লুটতরাজ, শত্রুতা ইত্যাদির কোন লক্ষণ সেখানে ছিল না। শহরের প্রাচীরসমূহ রাজনৈতিক শ্লোগান এবং প্রার্থীদের বিজ্ঞাপন দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ হতে দেখিনি। পোষ্টারও লাগানো দেখা যায়নি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যে, শহরের বিভিন্ন অংশে নির্বাচনী পোষ্টার ও বিজ্ঞাপন লাগানোর জন্য নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে। শুধুমাত্র সেসব জায়গাতেই বিজ্ঞাপন ও পোষ্টার সাঁটা ও ব্যানার ঝুলানো দেখা যায়। তাও ছিল পরিমার্জিত ও পরিশীলিত পর্যায়ে। কোন উচ্ছৃঙ্খলতা বা অশালীনতা তাতে ছিল না। সেখানকার লোকেরা জানায় যে, দেওয়ালে হাতে কিছু লেখা কিংবা ষ্টেনসিলের মাধ্যমে কোন কথা ছাপানো সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। আর এ নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র আইনের শোভা বৃদ্ধির জন্যই নয়, বরং খুব কঠোর ভাবে তা বাস্তবায়ন করা হয়। নির্দিষ্ট স্থান এবং নির্দিষ্ট প্রাচীরে পোষ্টার সাঁটার অনুমতি রয়েছে এবং রশিতে গেঁথে ঝুলানোর অনুমতি রয়েছে। তবে এ আইনও রয়েছে যে, যে ব্যক্তি বা দল পোষ্টার লাগাবে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর তারাই তা নামাতে বা মুছে দিতে বাধ্য থাকবে। সেই মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর পোষ্টার বা বিজ্ঞাপন সেখানে লাগানো থাকলে সংশ্লিষ্ট দল বা ব্যক্তিকে আইনগতভাবে জবাবদিহি করতে হয়। হায়! আমাদের দেশেও যদি মানুষের আবেগ প্রকাশ কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং ভদ্রতা ও শালীনতার অধীন হতো!

রি ইউনিয়নের দ্বীপে

রি ইউনিয়নের দ্বীপে

আমেরিকার পর আফ্রিকার দিকে আমার ভ্রমণ আরম্ভ হয়। মাঝখানে আল্লাহ তাআলা কিছুদিন পবিত্র মক্কা মুকাররমায় অতিবাহিত করার সৌভাগ্য দান করেন। সর্বদার ন্যায় পুনরায় একবার এ শাশ্বত সত্যটি খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করি যে, বিশ্বের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সমৃদ্ধ অপরূপ ভূখণ্ডের সুদর্শন দৃশ্যাবলী এক পাল্লায় রাখা হলে আর পবিত্র মক্কা–মদীনা এক পাল্লায় রাখা হলে মক্কা–মদীনার এই বৃক্ষলতাশূন্য উপত্যকার রূপ–সৌন্দর্যের পাল্লাই ভারী হবে।

اگر جنت بریں روئے زمین است
ہمین است وہمین است وہمین است

"পৃথিবীর বুকে যদি কোন জান্নাত থেকে থাকে
তাহলে তা এটিই, এটিই, এটিই।"

মক্কা–মদীনার চির বসন্তের কোলে ছয়দিন অতিবাহিত করার পর আমার আফ্রিকা মহাদেশের ছোট একটি দ্বীপ 'রি ইউনিয়ন' যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। সেখানে যাওয়ার জন্য নাইরোবী থেকে বিমান ধরতে হবে। তাই কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীতেও একরাত অবস্থান করি। পরদিন নাইরোবী এয়ার মারিসাসের বিমানযোগে যাত্রা করি। বিমানটি চাঁদ দ্বীপের সুদৃশ্য রাজধানী মৌরুনীতে সংক্ষিপ্ত বিরতিসহ পাঁচ ঘন্টায় আমাদেরকে 'রি ইউনিয়ন' পৌঁছে দেয়। বিশ্বের মানচিত্রে আফ্রিকা মহাদেশের দিকে নজর দিলে মহাদেশটির দক্ষিণ–পূর্বে মাদাগাসকার ও মারিসাসের মাঝখানে ছোট একটি বিন্দু দৃষ্টিগোচর হয়। ছোট এই বিন্দুটিই 'রি ইউনিয়ন' দ্বীপ। এ দ্বীপটিতে ফ্রান্সের শাসন বলবৎ রয়েছে। যদিও এটি প্যারিস থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত, এমনকি তা ভিন্ন মহাদেশের অঙ্গ, তারপরও এটি ফ্রান্সেরই একটি প্রদেশ বলে

গণ্য হয়। একসময় এটি ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল। এখন ব্যবস্থাপনার দিক থেকে এটিকে ফ্রান্সেরই একটি অংশ মনে করা হয়। এখানকার অধিবাসীরা ফ্রান্স নাগরিকত্বের অধিকারী। এখানকার ভাষা থেকে আরম্ভ করে মুদ্রা পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিস ফরাসী। কথিত আছে যে, ষোড়শ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত এ দ্বীপটিতে কোন জনবসতি ছিল না। প্রথমে পর্তুগিজ নাবিকগণ এখানে এসে অবতরণ করে। তারপর ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন ভারতের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে, তখন কোম্পানীর জাহাজ আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্ত (উত্তমাশা) ঘুরে ভারত সাগরের মধ্যে প্রবেশ করত। তারা উত্তমাশা থেকে ভারত পর্যন্ত দীর্ঘ ভ্রমণের মাঝখানে একটি মধ্যবর্তী বিরতিস্থান হিসেবে এই দ্বীপটিতে নোঙর করত। দ্বীপটি নৈসর্গিক সৌন্দর্য, সম্পদ ও ঋতুর দিক থেকে ফরাসী বণিকদের নজর কাড়ে। তারা এখানে বসবাস আরম্ভ করে। এভাবে দ্বীপটি পৃথিবীর বসতি অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন থেকে এখানকার মূল অধিবাসী শ্বেত ফরাসীরা, তবে এরা বিভিন্ন কাজ আদায়ের জন্য কতক আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গকে দাস বানিয়ে এখানে নিয়ে আসে। এভাবে এখানে আফ্রিকান বংশোদ্ভুত কিছু লোকও অধিবাসী হয়। দাসপ্রথার বিলুপ্তির পর এশিয়া, বিশেষত ভারত থেকে অনেক লোককে শ্রমিক ও চাকুরীজীবি রূপে এখানে আনা হয়। কতক ভারতীয় লোক ব্যবসার উদ্দেশ্যেও এখানে আসে। এভাবে ভারতীয় বংশোদ্ভূত অনেক লোকও রি ইউনিয়নের অধিবাসী হয়ে যায়। তারা স্থানীয়দের সঙ্গে এমনভাবে একাকার হয়ে যায় যে, এখন তাদের নতুন প্রজন্ম নিজেদের মাতৃভাষা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে। ফরাসী ভাষাই এখন তাদের মাতৃভাষার স্থান দখল করেছে। ভারতীয় ও আফ্রিকান বংশের এ অধিবাসীদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক মুসলমানও রয়েছে।

ছোট এই দ্বীপটি মাত্র ৪০ মাইল লম্বা এবং ৩০ মাইল চওড়া। এর মোট আয়তন মাত্র ৯৭০ বর্গমাইল। এর অধিবাসী প্রায় সাড়ে ৫ লাখ। এর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। তবে তারা অত্যন্ত সুসংহত ও সচেতন মুসলমান। দ্বীপের প্রায় প্রত্যেকটি শহরে শানদার মসজিদ রয়েছে। শিশুদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে। সমগ্র এলাকার মুসলমানদের

ধর্মীয় প্রয়োজনাদির তত্ত্বাবধানের জন্য মুসলমানগণ 'আল-মারকাযুল ইসলামী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। যার ফরাসী নাম 'সেন্টার দি ইসলামিক'। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় 'সেন্ট পিটার্স' নামক শহরে। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ফরাসী ভাষায় একটি মাসিক ধর্মীয় পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। কেন্দ্রটি অনেকগুলো ধর্মীয় পুস্তকের ফরাসী অনুবাদ খুবই আকর্ষণীয় আঙ্গিকে প্রকাশ করেছে। অনেক পুস্তক খোদ ফরাসী ভাষাতেই লিখিত। এই কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ফরাসী ভাষার এ লিটারেচার শুধুমাত্র রি ইউনিয়নের মধ্যেই নয়, বরং বিশ্বের ঐ সমস্ত দেশেও বিতরণ করা হয়, যেখানে ফরাসী-ভাষী মুসলমান রয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রটি বিভিন্ন আফ্রিকান দেশের জন্য ধর্মীয় গ্রন্থসমূহ যোগান দানের অতিমূল্যবান কাজ করে যাচ্ছে। কেন্দ্রের পক্ষ থেকেই সারা দেশের মসজিদ ও মাদরাসার সাধারণ ব্যবস্থাপনা করা হয়। মসজিদসমূহে ইমাম ও খতীব নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রত্যেক মসজিদ সংলগ্ন মাদরাসার দেখাশোনাও এ কেন্দ্রই করে থাকে। কেন্দ্রের উদ্যোগেই অনেক তরুণকে ভারত ও পাকিস্তানের ধর্মীয় মাদরাসাসমূহে উচ্চতর ধর্মীয় শিক্ষালাভের জন্য প্রেরণ করা হয়। তারা এসব দেশ থেকে ইসলামী জ্ঞানের শিক্ষা সমাপন করে স্বদেশে ফিরে এসেছেন। তরুণ এ আলেমগণ ফরাসী ভাষায় লেখনী ও বক্তব্য দানের মাধ্যমে মুসলমানদের ধর্মীয় দিক নির্দেশনার দায়িত্ব খুব চমৎকার ভাবে আঞ্জাম দিচ্ছেন। মুসলমান জনসাধারণের উপর তাঁদের এ সমস্ত খেদমতের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এত প্রকট যে, যে কোন ব্যক্তি তা খোলা চোখে প্রত্যক্ষ করতে পারে।

'আল মারকাযুল ইসলামী'র সভাপতি মাওলানা সাঈদ আঙ্গার এবং মহাসচিব মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক গঙ্গাত—মাশাআল্লাহ—বড়ই কর্মতৎপর এবং সর্বজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব। তাঁরা একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশের সমস্ত আলেম ও ধর্মীয় গোষ্ঠীকে এমনভাবে একসূত্রে জুড়ে রেখেছেন যে, তারা সকলে সম্মিলিতভাবে এক চিন্তা-চেতনায় দুধে চিনিতে একাকার হয়ে স্ব স্ব দায়িত্বে নিমগ্ন রয়েছেন। মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ দূর্গায়ী সাহেব মারকাযের সহ-সভাপতি। দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে তিনি শিক্ষা সমাপন করেছেন। তারপর সেখানেই ফতওয়ার কোর্স

সমাপন করেছেন। বর্তমানে তিনি রি-ইউনিয়নে মুফতী পদে কাজ করে যাচ্ছেন। এঁরা সকলে বংশ পরম্পরায় রি-ইউনিয়নেরই অধিবাসী। ফরাসী তাদের মাতৃভাষা। কিন্তু তাঁরা উপমহাদেশের বিভিন্ন ধর্মীয় মাদরাসা থেকে শিক্ষা লাভ করার উদ্দেশ্যে উর্দূভাষা শিক্ষা করেছেন। এখন তাঁরা বেশ সাবলীলভাবে উর্দূ বলেন। তাঁদের মাধ্যমে রি-ইউনিয়নের অধিবাসীদের আরবী ও উর্দূ কিতাব-পত্রের সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

রি-ইউনিয়ন দ্বীপে ফরাসী কৃষ্টি-কালচার তার বহুমূখী ফেতনার উপকরণ নিয়ে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এটি বড় ধরনের পর্যটন কেন্দ্র হওয়ার কারণে, আধুনিক পশ্চিমা কৃষ্টির যাবতীয় অবশ্যম্ভাবী ফল এখানে পুরো মাত্রায় বিদ্যমান। এতদসত্ত্বেও এমন জটিল পরিবেশে মুসলমানগণ নিজেদের ধর্মীয় স্বকীয়তা এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন যে, ধর্মীয় আত্মমর্যাদাবোধ, ধর্মের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য এবং ইসলামী ঐতিহ্য ও নিদর্শনাবলীর পাবন্দীর ঐসব দৃশ্য অনেক মুসলিম দেশেও পরিলক্ষিত হয় না, যা এখানে পরিলক্ষিত হয়। এর মৌলিক কারণ, এ সমস্ত উলামায়ে কেরামের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা। বিশেষ করে এ বিষয়টি দেখে বড়ই আনন্দিত হই যে, এখানকার সমস্ত ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্য, হৃদ্যতা ও সহমর্মিতা রয়েছে। এখানে দলাদলি ও বিভক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেনি। আর এরই বরকতে ধর্মীয় কাজ ও প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রভাবশালী ও উপকারী প্রমাণিত হচ্ছে। এমন কোন মুসলিম পরিবার এখানে নেই, যে তার শিশুদেরকে অন্য কোন কাজে লাগানোর পূর্বে মসজিদ-সংলগ্ন মক্তবে প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়াচ্ছে না। সুতরাং সমস্ত মুসলমান—যারা শিশুকালে এ সমস্ত মক্তব অতিক্রম করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছে—ইসলামের মৌলিক শিক্ষায় সুসজ্জিত, যা তাদের দৈনন্দিন কর্মধারায় সুস্পষ্টরূপে ভাস্বর।

এখানকার মসজিদসমূহ বড়ই সুদর্শন, শানদার, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও খুবই সুনিয়ন্ত্রিত। মসজিদগুলো মুসলমানদের জন্য আদর্শ কেন্দ্রসমূহ হিসেবে গুরুত্ব রাখে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে নামাযীর সংখ্যাও অনেক হয়ে থাকে। বেশীর ভাগ মুসলমান নামাযের পাবন্দী করে থাকে। ধর্মীয় আলোচনায় অংশগ্রহণে তারা বিশেষভাবে আগ্রহী। বেশীর ভাগ মুসলমান

ব্যবসায়ী এবং অর্থনৈতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে সম্পদের প্রাচুর্য তাদের মধ্যে অহংবোধের সৃষ্টি করেনি।

এখানকার 'আল মারকাযুল ইসলামী' কতিপয় সামাজিক ও ফেকাহ সংক্রান্ত সমস্যার ব্যাপারে পরামর্শের জন্য আমাকে দাওয়াত করেছিল। এসব বিষয়ে আলোচনার জন্য কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আলেমদের সঙ্গে বেশ কয়েকটি বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়। প্রশ্নের এক দীর্ঘ তালিকা পূর্ব থেকে প্রস্তুতকৃত ছিল। সুদীর্ঘ চারটি অধিবেশনে এসব বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত হয়। এ সমস্ত প্রশ্ন থেকেই অনুমিত হয় যে, মারকায সাধারণ মুসলমানদের সমস্যাবলীর বিষয়ে কি পরিমাণ আন্তরিক এবং তারা এ সমস্ত মাসআলা সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বের আলেমদের নতুন নতুন গবেষণা জানার জন্য কেমন আগ্রহী।

আমার পাঁচদিনের অবস্থানকালে আমি রি-ইউনিয়নের বিভিন্ন শহরে মুসলমানদের ধর্মীয় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করি। আলেমদের সঙ্গে উপরোক্ত বৈঠকসমূহে ব্যতিব্যস্ত থাকি। দুই জায়গায় সাধারণ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করি। স্থানীয় ব্যক্তিগণ তা অনুবাদ করে শ্রোতাদেরকে শোনায়। সাথে সাথে রি-ইউনিয়নের নৈসর্গিক রূপ-সৌন্দর্যও উপভোগ করার সুযোগ হয়। ছোট এই দ্বীপটিকে আল্লাহ তাআলা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধশালী করেছেন। দ্বীপের চতুর্দিকের উপকূলের সাথে সাথে ছোট ছোট শহর আবাদ রয়েছে। প্রত্যেক শহরের একদিকে সমুদ্রোপকূল আর অপরদিকে উঁচু উঁচু সবুজ-শ্যামল পাহাড় হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ভৌগলিক অবস্থান কেন্দ্রের দিক থেকে এ দ্বীপটির একক বৈশিষ্ট্য এই যে, যে কোন ব্যক্তির যে কোন ধরনের ঋতুর প্রয়োজন হোক সে তা এক-আধ ঘন্টা সময় গাড়ী দৌড়িয়ে লাভ করতে পারে। যদি শহরের উপকূলীয় অংশে গরম থাকে, তাহলে শুধুমাত্র আধাঘন্টা সময় গাড়ী চালালে সে শহরের অপর দিকের পাহাড়ে শীত ঋতুতে পৌছতে পারে। যেহেতু রি-ইউনিয়ন বিষুব রেখার দক্ষিণে অবস্থিত, তাই ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাস এখানে গ্রীষ্মকালরূপে পরিগণিত হয়। সুতরাং আজকাল উপকূলীয় শহরে গ্রীষ্মকাল চলছিল। তবে রাত কাটানোর জন্য আমরা নিকটবর্তী কোন পাহাড়ে চলে যেতাম,

সেখানে আমাদেরকে কম্বল গায়ে দিতে হতো।

রি-ইউনিয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎপন্ন দ্রব্য যদিও আখ তবে সব ধরনের মানসম্পন্ন ফল-ফসল এখানে জন্মায়। এখন যেহেতু এখানে গ্রীষ্মকাল ছিল, তাই অত্যন্ত সুস্বাদু আম, তাজা লিচু প্রত্যেক খাবারের মজলিসে উপস্থিত থাকত। এছাড়া উপমহাদেশের গ্রীষ্মকালীন প্রসিদ্ধ ফলসমূহের মধ্য থেকে প্রায় সব ফলই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছিল।

দ্বীপটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এখানকার আগ্নেয়গিরি বিশিষ্ট পাহাড়সমূহ। এগুলো বিশ্বের বৃহত্তর আগ্নেয়গিরি বিশিষ্ট পাহাড়সমূহের মধ্যে পরিগণিত হয়। কয়েক বছর পর পর এই পাহাড় থেকে লাভা উদগীরিত হয়। এই লাভা প্রবাহিত ও প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরূপে সমুদ্র পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। সমুদ্র উপকূলে পৌছে এই লাভা যখন ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তখন জমে কালো পাথরের রূপ ধারণ করে, যা উপকূলাংশে সুদূর পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। পর্যটকরা এ আগ্নেয়গিরি দেখার জন্য অনেক দূরদূরান্ত থেকে এসে থাকে। কিন্তু আগ্নেয়গিরির মুখ পর্যন্ত পৌছার পথ বড় দুর্গম এবং বড় ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, পথ চলতে চলতে হঠাৎ করে এত নরম জমিন চলে আসে যে, গোটা মানুষ তার মধ্যে ঢুকে পড়ে। এভাবে এখানকার মাটি অনেক পর্যটককে গিলে ফেলেছে। আমাদের মেজবানগণ আমাদেরকে প্রাকৃতিক বিস্ময়ের এই দৃশ্য দেখানোর জন্য হেলিকপ্টার ব্যবহার করেন। হেলিকপ্টারটি আমাদেরকে আগ্নেয়গিরির একেবারে মুখের উপর নিয়ে যায়। যার অবস্থান আকাশচুম্বী একটি পাহাড়চূড়ার উপর। তার আকৃতি প্রায় চার পাঁচ বর্গকিলোমিটারের একটি প্রাকৃতিক হাউজের ন্যায়। এই হাউজের তীরে এবং মাঝে জায়গায় জায়গায় চুলার ন্যায় গর্ত দৃষ্টিগোচর হয়। এ সমস্ত গর্তের মুখ লাল বর্ণের। এগুলো থেকেই লাভা উদগীরিত হয়। লাভা কমে গেলে হাউজের মধ্যে তা আবদ্ধ থাকে, আর বেড়ে গেলে শত শত ফুট উঁচুতে লাফিয়ে ওঠে। তারপর পাহাড়ের বাইরের কোন পৃষ্ঠে তা পতিত হয়ে জলপ্রপাতের রূপ ধরে সমুদ্র পৃষ্ঠের দিকে ধাবিত হয়। এখানকার লোকদের বর্ণনামতে যখন অগ্নুৎপাত হয় তখন আকাশে বহুদূর পর্যন্ত লালিমা ছড়িয়ে পড়ে এবং সম্পূর্ণ দ্বীপে তীব্র উত্তাপ অনুভূত হয়। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন যে,

শেষবার যখন ১৯৯২ ঈসায়ীতে অগ্নুৎপাত হয়, তখন সে তা দেখার জন্য প্রায় দুই মাইল নিকট পর্যন্ত চলে যায়। গরমের তীব্র তাপে তার চামড়া কালচে হয়ে যায়। কালিমার এই স্তর অনেকদিন পর্যন্ত তার দেহ থেকে উঠতে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য যে, পাহাড়পৃষ্ঠ থেকে গড়িয়ে পড়া এই তরল অগ্নি যেমনি ভয়ংকর ও ধ্বংসাত্মক, তেমনি আবার সুদৃশ্যও। সুতরাং রে–ইউনিয়নের পরিচিতি পুস্তক এই তরল অগ্নির বিভিন্ন দৃশ্যের ছবি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। এদিক থেকে অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী লোকের চোখে এই আগ্নেয়গিরি পৃথিবীতে জাহান্নামের অন্তর্নিহিত প্রতিচ্ছবি, যার বাহ্যিক দিক (অর্থাৎ পাপকর্ম) বাহ্যত বড় চমৎকার, কিন্তু তার ভিতরে ভয়ংকর অগ্নি ভরা।

হেলিকপ্টারটি ঐ আগ্নেয়গিরি পর্বত দেখানো ছাড়াও আমাদেরকে পাহাড় সারির মাঝের ছোট একটি গলি পথও ভ্রমণ করায়। গলিপথটি অনেকগুলো জলপ্রপাত দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। এখানকার একটি জলপ্রপাত ছয়শ' মিটার উঁচু থেকে পতিত হচ্ছে। তার রূপ–সৌন্দর্য ও কমনীয়তা যথার্থভাবে পরিদর্শন করা হেলিকপ্টার ছাড়া সম্ভব নয়।

Contents

দক্ষিণ আফ্রিকায়

দক্ষিণ আফ্রিকায়

রি–ইউনিয়নের পর দক্ষিণ আফ্রিকা ছিল আমার পরবর্তী মঞ্জিল। জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহ সেখানে কাটাই। আমি ইতিপূর্বেও বহুবার দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়েছি। তবে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করার পর এটিই ছিল আমার প্রথম সফর। স্বাভাবিকভাবেই এখন সেখানে অনেক পরিবর্তন এসেছে। জগতের উত্থান–পতন থেকে শিক্ষা গ্রহণকারীদের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের বহুবিধ উপকরণ রয়েছে। তাই এ শিরোনামে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কেই কিছু কথা আলোচনা করবো।

'দক্ষিণ আফ্রিকা' আফ্রিকা মহাদেশের সর্বাধিক উন্নত দেশটির নাম। এ দেশের বড় বড় শহরসমূহ যেমন জোহান্সবার্গ, প্রিটোরিয়া, ডারবান ও কেপটাউনকে নির্দ্বিধায় ইউরোপ ও আমেরিকার আধুনিক ও উন্নত শহরসমূহের মোকাবেলায় খাড়া করা যেতে পারে। তবে দেশটির ভাগ্য খারাপ যে, কয়েক বছর পূর্ব পর্যন্ত এখানে বংশ ও বর্ণ পূজার প্রেত তার কুৎসিত চেহারা নিয়ে জেঁকে বসেছিল। এখানকার নব্বই শতাংশ নিগ্রো আদিবাসী দশ শতাংশ শ্বেতাঙ্গের পাঞ্জাবদ্ধ হয়ে ইতিহাসের চরম এবং নিকৃষ্টতম জুলুম ও নিগ্রহের শিকার ছিল।

আফ্রিকা মহাদেশের অন্যান্য বেশীর ভাগ দেশের মত এদেশের মূল অধিবাসীও ছিল কৃষ্ণাঙ্গদের সমন্বয়ে। এরা ছিল এ এলাকার আদিবাসী। এদের উপর শ্বেতাঙ্গদের আধিপত্যের সূচনা এভাবে হয় যে, পঞ্চদশ খৃষ্ট শতাব্দীতে পশ্চিমা দেশসমূহ হিন্দুস্তানে তাদের বাণিজ্য এবং বাণিজ্যের আড়ালে তাদের সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির প্রসার ঘটানোর জন্য দীর্ঘদিন ধরে এমন একটি পথের সন্ধানে ছিল, যেটি হবে মুসলমানদের প্রভাব থেকে মুক্ত। এ উদ্দেশ্যে তারা বিভিন্ন নৌ অভিযান প্রেরণ করে। অবশেষে

যখন ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে বর্তলমাইডাইস আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছে ফিরে আসে, তখন পর্তুগালের বাদশাহ জানদুম আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তের আবিষ্কারকে ভবিষ্যত অভিযানের জন্য আশাব্যঞ্জক মনে করে তার নাম দেয় 'উত্তমাশা' (Cape of good hope)। এর দশ বছর পর উত্তমাশার পথ ধরে ভাস্ক দা গামা ভারত পৌঁছতে সফল হয়। এ কারণেই এখন পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার এই ভূখণ্ড 'উত্তমাশা' নামে পরিচিত হয়ে আসছে। কেপটাউন এর রাজধানী।

পরবর্তীতে যেহেতু উত্তমাশা পশ্চিমা দেশসমূহের বাণিজ্যিক সফরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মঞ্জিলের রূপ লাভ করে তাই তারা এ অঞ্চলের উপর বহুদিন পর্যন্ত আধিপত্যের দাঁত বসিয়ে রাখে। অবশেষে হল্যাণ্ডের ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে এ এলাকা দখল করে। আধিপত্যবাদী এ শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। স্থানীয় কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের উপর পূর্ণ বিজয় লাভের জন্য আরও বহু সংখ্যক শ্বেতাঙ্গ লোকের প্রয়োজন ছিল। তাই তারা এখানে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসী বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা আরম্ভ করে। হল্যাণ্ডের অধিবাসীদের এখানে অভিবাস গড়ার জন্য অভিযান চালায়। হল্যাণ্ডের অধিবাসীরা এখানে আসতে প্রস্তুত ছিল না বিধায় ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের ইচ্ছা পূরণার্থে হল্যাণ্ডের এতিমখানাসমূহ থেকে এতিম মেয়েদেরকে সংগ্রহ করে এখানে পাঠিয়ে দেয়। তাছাড়া দেশান্তরের দণ্ডপ্রাপ্ত লোকদেরকেও জোর জবরদস্তি করে এখানে পাঠিয়ে দেয়। এভাবে ক্রমে ক্রমে এখানে শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাদের বংশ বিস্তার লাভ করায় তারা এখানকার এক উল্লেখযোগ্য অধিবাসীতে পরিণত হয়।

ডাচ জাতির যেসব লোক দক্ষিণ আফ্রিকায় তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে, তাদের কর্মই শুধু নয়, বরং বিশ্বাস ও দর্শনও এই ছিল যে, শ্বেতাঙ্গ লোকদের কৃষ্ণাঙ্গদের উপর শাসন চালানোর জন্মগত অধিকার রয়েছে। শ্বেতাঙ্গদের সেবা ও গোলামী করাই কৃষ্ণাঙ্গদের সৃষ্টির লক্ষ্য। তাদের নিকট কৃষ্ণাঙ্গরা (বরং, শ্বেত বর্ণের নয় এমন সমস্ত মানুষ) মানবীয় মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য নয়। সুতরাং এ বিশ্বাস ও দর্শনের ভিত্তিতে তারা দক্ষিণ আফ্রিকায় যে রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা চালু

-৮

করে, তাতে দেশের নব্বই শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীকে অস্পৃশ্যের চেয়েও নিম্নস্তরে স্থান দেওয়া হয়। কৃষ্ণাঙ্গদের সবকিছু শ্বেতাঙ্গদের থেকে পৃথক রাখা হয়। তারা শ্বেতাঙ্গদের আবাসিক এলাকায় বসবাসের অধিকার পায়নি। তাদের বসতি এলাকা, তাদের রেস্তোরাঁ, বিনোদন কেন্দ্র, তাদের ট্রেন, মোটকথা সবকিছুই ছিল পৃথক। শ্বেতাঙ্গদের আবাসিক এলাকা ও অন্যান্য স্থানে কুকুরের প্রবেশাধিকার ছিল, কিন্তু কোন কৃষ্ণাঙ্গের প্রবেশাধিকার ছিল না। এমন এক সময় অতিবাহিত হয়, যখন উঁচু ভবনসমূহে কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গরা লিফট ব্যবহার করতে পারত, কৃষ্ণাঙ্গদের তা ব্যবহার করার অনুমতি ছিল না। প্রত্যেক অফিসে কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গদের কাউন্টার পৃথক ছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত জাঁকজমকপূর্ণ শহর সম্পূর্ণরূপে শ্বেতাঙ্গদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। জোহান্সবার্গ হোক, চাই প্রিটোরিয়া কি ডারবান হোক, চাই কেপটাউন, প্রত্যেক শহরের দোকান, কারখানা ও বাড়ীতে কৃষ্ণাঙ্গরা দিনের বেলা শ্রম দিত। তাদের পরিশ্রমেই এ সমস্ত শহর আবাদ ছিল। কিন্তু কোন কৃষ্ণাঙ্গের সেখানে বাড়ী বানানোর অনুমতি ছিল না। শুধু তাই নয়, বরং সূর্যাস্তের পর কৃষ্ণাঙ্গ কোন লোক এ সমস্ত শহরে অবস্থান করতে পারত না। এ সমস্ত শহরকে বিদ্যুতের বাতি আলো ঝলমলে করার পর হাজার হাজার কৃষ্ণাঙ্গ বাসে সওয়ার হয়ে নিজেদের অন্ধকার ও সংকীর্ণ পর্ণকুটিরে চলে যেতে বাধ্য ছিল। যেগুলো ছিল শহর থেকে বহু মাইল দূরে। প্রথম দিকে তো কোন কৃষ্ণাঙ্গের লেখাপড়া করার অনুমতিই ছিল না। পরবর্তীতে অনুমতি দেওয়া হলেও তাদের শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ পৃথক রাখা হয়। সেখানে নির্দিষ্ট একটি সীমা পর্যন্তই কেবল শিক্ষা দান করা হতো। সাধারণ নাগরিক–অধিকারের ক্ষেত্রেই যখন কৃষ্ণাঙ্গদের সঙ্গে এরূপ আচরণ করা হতো, তখন রাজনীতিতে কোন কৃষ্ণাঙ্গের অনুপ্রবেশের তো প্রশ্নই ওঠে না। পার্লামেন্ট সম্পূর্ণটাই শুধুমাত্র দশ শতাংশ শ্বেতাঙ্গ লোকদের জন্য ছিল নির্ধারিত। কৃষ্ণাঙ্গদের না ভোটদানের অধিকার ছিল, না পার্লামেন্ট সদস্য হওয়ার অধিকার ছিল।

অপরদিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় যেহেতু স্বর্ণ ও প্লাটিনামের খনি ছিল, তাই এটি শ্বেতাঙ্গদের জন্য সত্যিকার অর্থেই 'সোনার পাখি' ছিল।

সুতরাং এখানকার প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ ব্যবহার করে দেশটি ধনী দেশসমূহের মধ্যে গণ্য হতে থাকে। ইউরোপ ও আমেরিকার বেশীর ভাগ দেশ তার সঙ্গে বন্ধুসুলভ সম্পর্কই শুধু বজায় রাখেনি, বরং তার খোলামেলা মানবতা বিধ্বংসী আচরণ সত্ত্বেও তার পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। তবে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণপূজার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন রাখে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন থাকে।

প্রথম দিকে দেশের কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল বিধায় এই জুলুম ও নীপিড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সোচ্চার করার অনুভূতিই তাদের মধ্যে জন্মাতে পারেনি। তবে ক্রমে ক্রমে কিছু লোক যখন শিক্ষিত হল এবং তারা স্বজাতির দুরাবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চাইল, তখন তাদেরকে চরম নির্যাতনের লক্ষ্যে পরিণত করা হয়। এ ধরনের লোকেরা দেখতে দেখতে নিখোঁজ হয়ে যেত। তাদের বাকী জীবন নির্যাতন–প্রকোষ্ঠে বলির শিকার হত।

দেশে যখন এ অবস্থা বিরাজ করছিল তখন নেলসন ম্যাণ্ডেলা স্বজাতির মুক্তির জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করেন। যার পরিণতিতে তিনি স্বীয় যৌবনের অমূল্য সাতাশটি বছর কারাগারে অতিবাহিত করেন। তিনি যখন কারাগারে যান, তখন শ্বেতাঙ্গদের শাসন ক্ষমতা এত সুদৃঢ় ছিল যে, বাহ্যত তাদের স্বস্থান থেকে সরে আসার কথা কল্পনা করাও কঠিন ছিল। কিন্তু ম্যাণ্ডেলার কারাবন্দী হওয়ার পর স্বাধীনতা আন্দোলন স্তব্ধ না হয়ে বরং ক্রমশঃ শক্তিশালী হতে থাকে। বর্ণপূজারী সরকারের বিরুদ্ধে ভিতরে ভিতরে ঘৃণার লাভা উত্তপ্ত হতে থাকে। অপরদিকে সরকার তার অবস্থান থেকে হটতে প্রস্তুত ছিল না বিধায় দেশটির আকাশে বাতাসে একটি ভয়ংকর রক্তাক্ত বিপ্লব ঘটার আশংকা বহু বছর ধরে তরঙ্গায়িত হচ্ছিল। এ কথা তো নিশ্চিত যে, নির্যাতন ও নিপীড়নের এ আধিপত্যের একদিন না একদিন বিলুপ্তি ঘটতই, কিন্তু আশংকা ছিল যে, অন্য কতিপয় আফ্রিকান দেশের ন্যায় এখানেও এ বিপ্লব রক্তপাতের মাধ্যমে সূচিত হবে। সুন্দর এই দেশের বুকে রক্তের নদী প্রবাহিত হবে। তবে

ইনসাফের কথা এই যে, দেশকে ভয়ংকর এ রক্তপাত থেকে রক্ষা করার পুষ্পমাল্য একদিকে যেমন নেলসন ম্যাণ্ডেলার ধৈর্য ও সহনশীলতার মস্তকে শোভা পায়, অপরদিকে এর ক্রেডিট সর্বশেষ শ্বেতাঙ্গ সরকারেরও, কারণ শেষ প্রান্তে এসে হলেও সরকার 'দেওয়ালের লিখন' পাঠ করে এবং শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে নীতিগতভাবে রাজি হয়ে যায়। অন্যথা ক্ষমতার মদে মত্ত জালেমদের ইতিহাস বলে যে, তাদের চক্ষু তখনই উন্মেলিত হয়, যখন তাদের অহমিকা কোন 'লাল সাগরে' নিমজ্জিত হয়। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বশেষ সরকার প্রথমতঃ বর্ণবৈষম্যমূলক আইনসমূহ রহিত করে, তারপর ম্যাণ্ডেলাকে মুক্তি দিয়ে তার প্রতি সমঝোতার হাত প্রসারিত করে।

অপরদিকে নেলসন ম্যাণ্ডেলাও প্রতিশোধাগ্নিতে পরাভূত হওয়ার পরিবর্তে স্বজাতিকে শান্তিপূর্ণ বিপ্লব উপঢৌকন দান করাকে প্রাধান্য দেন। জীবনের মহামূল্যবান সাতাশটি বছর বন্দীত্বের দুর্দিনে অতিবাহিত করা সত্ত্বেও তার রাজনৈতিক পলিসির মধ্যে ব্যক্তিগত শত্রুতা ও প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা ছায়াপাত করেনি। যে সমস্ত লোক তার ব্যক্তিগত জীবনকে ধ্বংস করতে কিছুমাত্র ক্রটি করেনি, তিনি তাদেরই সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসেন এবং একটি অন্তর্বর্তীকাল পর্যন্ত তাদেরকে ক্ষমতায় নিজের অংশীদার বানাতে সম্মত হন। অবশেষে তিনি স্বজাতির মুক্তির জন্য এমন এক ফর্মূলা আবিস্কারে সফল হন, যার ফলে কোন প্রকার রক্তপাত ছাড়া তার জাতি স্বাধীনতা লাভ করে।

এই ফর্মূলার অধীনে প্রথমবার যখন দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখন ম্যাণ্ডেলার নেতৃত্বাধীন পার্টি 'আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস' বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সফল হয়। নেলসন ম্যাণ্ডেলাকে স্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়। এই মহাবিজয়ের কালে ম্যাণ্ডেলা রেডিও ও টিভিতে যে ভাষণ দান করেন, তাও তার দূরদর্শিতার প্রমাণ ছিল। তিনি জাতিকে এ রাজনৈতিক বিজয়ের কারণে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করেন, অপরদিকে তিনি আশংকা বোধ করেন যে, বিজয়ের আনন্দে দেশের কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীরা প্রতিশোধমূলক তৎপরতা চালাতে পারে, ফলে দেশের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত

হওয়ার আশংকা রয়েছে। তাই তিনি তার ভাষণে ঘোষণা করেন যে, এই মহাবিজয়ের কারণে নাগরিক পর্যায়ে কোন আনন্দ উদযাপন করা হবে না। কাল থেকে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের নতুন দেশ বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে চলে যাবে। পূর্বাধিক উদ্যমের সঙ্গে কাজ করবে। এটিই হবে আমাদের আনন্দ উদযাপন।

স্বাধীনতার গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে নেলসন ম্যাণ্ডেলাকে যে দীর্ঘ ও ধৈর্যসংকুল ধাপসমূহ অতিক্রম করতে হয়, তার উপাখ্যান তিনি নিজের আত্মজীবনীতে বর্ণনা করেছেন, যার নাম (The long walk to freedom) অর্থাৎ 'স্বাধীনতার দীর্ঘ সফর'। বইটি প্রকাশ পেয়ে যখন বুক ষ্টলসমূহে আসে, তখন কয়েকদিনের মধ্যে তার সমস্ত কপি বিক্রি হয়ে যায়।

ম্যাণ্ডেলা স্বজাতিকে স্বাধীনতা দানের জন্য যে কৃতিত্ব সম্পাদন করেন, তা তাকে জাতির হিরো বানানোর জন্য যথেষ্ট, কিন্তু এই বিজয়ে উন্মত্ত না হয়ে তাঁর সমস্ত মনোযোগ বর্তমানে দেশকে নতুনভাবে গড়ার কাজে নিবদ্ধ। এখনও পর্যন্ত নিজেকে নিজে জাতির ত্রাণকর্তা সাব্যস্ত করে নিজের পূজা করানোর কোন ভূত তার মাথায় সওয়ার হয়েছে বলে মনে হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার সাম্প্রতিক অবস্থানকালে আমি কোথাও ম্যাণ্ডেলার উল্লেখযোগ্য কোন ছবি দেখতে পাইনি, তিনি ক্ষমতায় আসার পর নিজের এবং নিজের সহকর্মীদের সরকারী সুযোগ সুবিধা লাভকে বিশেষ হ্রাস করেছেন। তাঁর পলিসির মধ্যে এ উপলব্ধি ভাস্বর দেখা যায় যে, স্বাধীনতা লাভের পর দেশ গড়া স্বাধীনতা লাভের চেয়ে অধিক কঠিন ও ধৈর্যের ব্যাপার। তাকে এমন একটি জাতিকে নিয়ে কাজ করতে হবে, যারা শত শত বছর নিষ্পেষিত হওয়ার পর এই প্রথমবার মুক্ত পরিবেশ লাভ করেছে। অপরদিকে শিক্ষার স্বল্পতা তাদেরকে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও উচ্চতর মানবীয় গুণাবলী থেকে দূরে রেখেছে। স্বাধীনতা লাভের পর অবিলম্বে গ্রামের অধিবাসীরা দলে দলে শহরে স্থানান্তরিত হচ্ছে। বড় বড় শহরে এসব লোকের ঝুপড়ি সুদূর বিস্তৃত দেখা যায়। যা এ সমস্ত শহরের সার্বিক মন-মানসের সাথে কোনভাবেই খাপ খাওয়ার মত নয়। অপরদিকে অশিক্ষিত কৃষ্ণাঙ্গরা উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বঞ্চিত বিধায় তারা বহুবিধ অপরাধ কর্মে অভ্যস্ত, যার

ফলে স্বাধীনতা লাভের পর শহরগুলোতে চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধকর্ম বেশ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন স্বাধীন সরকারের কঠিন পরীক্ষা নিত্য নতুন এ সমস্ত সমস্যাসমূহ উত্তোরণ করা এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বর্তমানে যে অসীম দূরত্ব বিরাজ করছে, তা সুকৌশলে হ্রাস করে দেশকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ যোগান দেওয়া। দক্ষিণ আফ্রিকায় বহু সংখ্যক মুসলমান অধিবাসীও রয়েছে। এ এলাকায় মুসলমানদের আগমনেরও বিস্ময়কর ও শিক্ষণীয় এক ইতিহাস রয়েছে, যা স্বাধীন পরিবেশে জন্মগ্রহণকারী মুসলমানদের অবশ্যই জানা থাকা উচিত। তার বিবরণ পাঠক সম্মুখে পেশ করবো ইনশাআল্লাহ।

Contents

দক্ষিণ আফ্রিকায় মুসলমান

দক্ষিণ আফ্রিকায় মুসলমান

দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসলাম ও মুসলমানদের অনুপ্রবেশের ইতিবৃত্তও গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী। মুসলমানদের পূর্বসুরীগণ প্রত্যেক ভূখণ্ডে ইসলামের প্রচার–প্রসার এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি বিশাল ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করেছেন, তা' এ ইতিহাস থেকে অনুমান করা যায়।

আমি পূর্বে আলোচনা করেছি যে, কৃষ্ণাঙ্গ গোত্রসমূহ দক্ষিণ আফ্রিকার মূল অধিবাসী। সপ্তদশ খৃষ্ট শতাব্দীতে হল্যাণ্ডের ডাচ জাতি একদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার উপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। অপরদিকে সে সময়েই মালয় ও তার পার্শ্ববর্তী দ্বীপসমূহকেও উপনিবেশবাদের পাঞ্জায় কষে ধরে। মালয় ও তার পার্শ্ববর্তী দ্বীপসমূহে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। সেখানে মুসলমানদের পক্ষ থেকে বার বার স্বাধীনতা আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। ডাচ সম্প্রদায় তাদের স্বভাব মাফিক এ সমস্ত আন্দোলনকে সবসময়ই জুলুম–নির্যাতনের মাধ্যমে দমন করে। সেখানকার অনেক মুজাহিদ মুসলমানকে বন্দী করে দাস বানিয়ে রাখে। এতদসত্ত্বেও ডাচ গোষ্ঠীর আশংকা ছিল যে, এরা যে কোন সময় বিদ্রোহ করে বসতে পারে। তাই সরকার তাদেরকে দেশান্তর করে কেপ টাউন পাঠিয়ে দেয়। যেন স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থান করে তারা চরম অসহায় হয়ে পড়ে। সুতরাং মালয় ও আশেপাশের প্রায় তিন শ' মুজাহিদকে দাস বানিয়ে পায়ে শিকল পরিয়ে কেপটাউন নিয়ে আসা হয়।

কেপটাউনে মালয় মুসলমানদের দ্বারা বড় কষ্ট–সাধ্য কাজ নেওয়া হত। ডাচ শাসকগোষ্ঠীর ভাল করেই জানা ছিল যে, তাঁদের স্বাধীনতা লাভের এ অদম্য স্পৃহা মূলত তাঁদের বক্ষ্যস্থিত প্রজ্জ্বলিত ঈমানের উত্তাপে উজ্জীবত। তাই তাঁদেরকে স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে ও তাঁদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে ঈমানের নূর থেকে বঞ্চিত করতে সবধরনের প্রচেষ্টাই তারা চালায়। নামায পড়া তো দূরের কথা, ডাচ মনিবদের পক্ষ থেকে তাদের কালিমা পড়ার অনুমতিটুকুও ছিল না। অসহায় সেই

মুসলমানদের থেকে সারাদিন চরম কষ্টসাধ্য কাজ নেওয়া হতো। কোন ব্যক্তি নামায পড়া বা অন্য কোন এবাদতে লিপ্ত হওয়ার দুঃসাহস দেখালে তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হতো।

কিন্তু এমন চরম নির্যাতন ও নিপীড়নের মাধ্যমে এ সমস্ত দেশান্তরিত ও নিঃস্ব মুসলমানদের অন্তর থেকে ঈমানের প্রদীপ নির্বাপিত করা সম্ভব হয়নি। জুলুম-নির্যাতনের যাঁতায় নিষ্পেষিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের দ্বীনকে বুকে ধরে রাখেন। চরম অপারগতার এ অবস্থাতেও তাঁরা নামাযকে পর্যন্ত ছাড়েননি। সারাদিন কষ্টকর পরিশ্রম করার পর দৃঢ় সংকল্পী এই মুজাহিদগণ রাতে যখন নিজেদের অবস্থান স্থলে ফিরে যেতেন, তখন ক্লান্তিতে নিথর হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁদের তত্ত্বাবধায়কদের ঘুমিয়ে পড়ার অপেক্ষা করতেন। তারা ঘুমিয়ে পড়লে মুজাহিদগণ রাতের অন্ধকারে চুপে চুপে অবস্থান স্থল থেকে বের হয়ে একটি পাহাড়ে আরোহণ করে সারাদিনের নামায একসঙ্গে পড়ে নিতেন। বর্তমানে কেপটাউনের প্রত্যেক মুসলমান অধিবাসী সে জায়গা সম্পর্কে জ্ঞাত আছে যেখানে নিপীড়িত ও নিগৃহীত এ সমস্ত মুসলমান নিস্তব্ধ নিশীথে স্বীয় মনিবের সমীপে সেজদায় লুটিয়ে পড়তেন। আমিও সে জায়গা দেখেছি। প্রাচীন শহর থেকে বেশ দূরে সেই পাহাড়টি। পাহাড়ের মাঝের প্রশস্ত একটি জায়গাকে নিরাপদ মনে করে স্বীয় প্রভুর সম্মুখে দাসত্বের সেজদাহ করার জন্য তাঁরা নির্বাচিত করেছিলেন। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত শ্রান্ত মুসলমানদের প্রতিদিন এখানে এসে নামায পড়া এমন একটি সাধনা, যার কল্পনাও চোখকে অশ্রুসিক্ত করে। এখানকার পরিবেশে আল্লাহ-পাগল সেই মুজাহিদদের যিকির ও তাকবীরের সুরভি আজও অনুভূত না হয়ে পারে না।

প্রায় আশি বছর আল্লাহর এই নেক বান্দাগণ দাসত্বের শিকলে একইভাবে বন্দী থাকেন। দীর্ঘ এ সময়ে তাঁদের মসজিদ বানানো তো দূরের কথা একাকী নামায পড়ারও অনুমতি ছিল না। অবশেষে এমন একটি পর্যায় এল, যখন বৃটিশ শ্বেতাঙ্গরা কেপটাউনের উপর আক্রমণ করে ডাচ জাতি থেকে এ অঞ্চল ছিনিয়ে নিতে চাইল। তারা বিশাল এক সেনাবাহিনী নিয়ে 'উত্তমাশার' কূলে পৌঁছে গেল। এ যেন চোরের ঘরে

বাটপারের আগমন। এ অবস্থায় ডাচ শাসকদের ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য এমন নিবেদিতপ্রাণ সিপাহীদের প্রয়োজন পড়ল, যারা জান বাজি রেখে তাদের পথ রোধ করবে। প্রাণদানের জন্য ভিনদেশী এই মুসলমানদের চেয়ে অধিক উপযুক্ত আর কেউ ছিল না। সুতরাং ডাচ সরকার নির্যাতিত ও নিপীড়িত এ সমস্ত মুসলমানের নিকট এ লড়াইয়ে ডাচ সরকারের পক্ষ হয়ে শুধু লড়াই করারই নয়, বরং ইংরেজদের মোকাবেলায় এদের অগ্রবাহিনীর দায়িত্ব পালনের দাবী জানায়।

এ পর্যায়ে এ সমস্ত মুসলমান ডাচ সরকারের নিকট থেকে কোন সুবিধা লাভের এই প্রথমবার সুযোগ পেল। কিন্তু এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা কোন টাকা পয়সার আবদার করেননি বা নিজেদের জন্য অন্য কোন সুবিধাও চাননি। তারা এসবের পরিবর্তে ডাচ মনিবদেরকে বলেন যে, আমাদের জন্য ইংরেজ ও ডাচ শাসকদের মধ্যে যদিও কোন তফাত নেই তবুও আমরা আপনাদের খাতিরে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য একটি শর্তে নজরানা স্বরূপ আমাদের জান পেশ করতে পারি, আর তা হল, এ লড়াই শেষ হলে আমাদেরকে কেপটাউনে একটি মসজিদ নির্মাণ করার এবং সেখানে জামাআতের সাথে নামায আদায় করার অনুমতি দিতে হবে। ডাচ সরকার এ শর্ত মেনে নেয়। এভাবে বহু সংখ্যক মুসলমান নিজেদের জানের বিনিময়ে এখানে একটি মসজিদ বানানোর অনুমতি লাভ করে। এটি ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম মসজিদ, যা ঐ সমস্ত নিপীড়িত ও নিগৃহিত মুসলমানগণ নির্মাণ করেন।

ঐতিহাসিক এ মসজিদটি আমি দেখেছি। কম বেশী তিন শ' বছর পূর্বে নির্মিত এ মসজিদটি এখনও সেই অবকাঠামোতেই রয়েছে, যে অবকাঠামোতে নিবেদিতপ্রাণ নির্মাতাগণ তা নির্মাণ করেছিলেন। মেহরাব এখনও পূর্ববৎ রয়েছে। তার দ্বার–প্রাচীর থেকে তার নির্মাতাদের এখলাসের সাক্ষ্য মিলে। ঘটনাক্রমে কেপটাউন নগর অনেক উন্নতি করলেও এ মসজিদটি পূর্বের সেই সাদামাটা অবস্থায় অপরিবর্তিত রয়েছে। এখানকার মসজিদের ইমামগণ আজও সেই বংশ থেকেই নিযুক্ত করা হয়, যাঁদেরকে মসজিদ নির্মাণের সময় ইমাম বানানো হয়েছিল। একটি মাত্র পার্থক্য এই সৃষ্টি হয়েছে যে, যে সমস্ত সহায়–সম্বলহীন

মুসলমান এ মসজিদটি বানিয়েছিলেন, তাঁদের নিকট কেবলার সঠিক দিক জানার উপযুক্ত কোন যন্ত্র ছিল না, তাই সম্ভবতঃ তারা অনুমানের ভিত্তিতে কেবলার দিক নির্ধারিত করে মেহরাব তৈরী করেন। এখন দিক–নির্ণয়ক যন্ত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, মেহরাব কেবলার সঠিক দিক থেকে বেশ সরানো। তাই এখন নামাযের কাতার মেহরাবের দিকে না করে বাঁকা করে কেবলার সঠিক দিকে করা হয়।

এই মসজিদের আঙ্গিনায় একটি খেজুর গাছ রয়েছে। কেপটাউনের আশেপাশে কোথাও খেজুর গাছ দেখা যায় না বিধায় এ গাছটি দেখে কিছুটা আশ্চর্যান্বিত হই। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে, এ মসজিদের একজন ইমাম সাহেব হজ্জ করতে যান। ফেরার পথে তিনি পবিত্র মদীনার খেজুর নিয়ে আসেন। তারই একটি বীচি এখানে বপন করেছিলেন। যা থেকে এ বৃক্ষটি শাখা বিস্তার করে।

এই হল দক্ষিণ আফ্রিকায় মুসলমানদের অনুপ্রবেশের সূচনা। প্রথম দিকে এখানে মালয় মুসলমানগণ আবাদ হন, যাদের বেশীর ভাগ কেপটাউনেই বাস করেন। দেশের উত্তর দিকের ট্রান্সুয়াল ও নাটাল প্রদেশে তাদের সংখ্যা ছিল খুব কম। কিন্তু পরবর্তীতে ভারত, বিশেষ করে সুরাট ও গুজরাটের মুসলমানগণ ব্যবসার উদ্দেশ্যে এখানে আসেন। তারা ট্রান্সুয়াল ও নাটালে বিশেষভাবে অধিবাস গড়ে তোলেন। এভাবে বহু সংখ্যক মুসলমান সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়েন। এতদসত্ত্বেও দেশের মোট অধিবাসীর তুলনায় মুসলমানদের হার অতি কষ্টে চার–পাঁচ শতাংশ হবে। তবে এত সামান্য হারের সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানগণ নিজেদের ধর্মীয় স্বকীয়তা যেই সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাথে সংরক্ষণ করেন, তা শত প্রশংসার যোগ্য। এমন অনেক দেশে আমার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, যেখানে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু, কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানগণকে দ্বীনের দিক থেকে অন্যান্য সমস্ত দেশের মোকাবেলায় অধিকতর সুসংহত, উদ্যমী ও সজাগ দেখতে পেয়েছি। তাঁরা সারাদেশে অনেকগুলো জাঁকজমকপূর্ণ মসজিদ তৈরী করেছেন। এ সমস্ত মসজিদে প্রবেশ করার পর কোন ব্যক্তিই এগুলোর উন্নতমানের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সুরুচি দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারবে না। তাঁরা প্রত্যেক

মসজিদের সঙ্গে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য একটি করে মানসম্পন্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেখানে মুসলমান শিশুরা প্রত্যেকদিন বিকালে মৌলিক ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করে থাকে। সম্ভবতঃ মুসলমান পরিবারের একটি শিশুও এমন নেই, যে জীবনের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার পূর্বে এ সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্র থেকে শিক্ষা লাভ করে না। তাছাড়া এখানকার মুসলমানগণ নিজেদের অনেক তরুণকে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষালাভের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের বড় বড় ধর্মীয় মাদরাসায় পাঠান। যাঁরা সেখান থেকে ইসলামী শিক্ষা সমাপন করে স্বদেশে ফিরে আসেন। এখন তাঁদের বিরাট একটি দল স্বদেশে অত্যন্ত মূল্যবান দ্বীনি খেদমত করে যাচ্ছেন। এখন খোদ দক্ষিণ আফ্রিকাতে বেশ কয়েকটি মানসম্মত মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেগুলোতে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলমানগণ যেহেতু অর্থনৈতিকভাবে সাধারণত সচ্ছল এবং দেশীয় ব্যবসায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে তাই এরা ঐ সমস্ত জুলুম–নির্যাতনের শিকার হয়নি, যা সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদেরকে ভোগ করতে হয়। কিন্তু বর্ণবৈষম্য ভিত্তিক পলিসির কারণে তারাও দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকরূপে বাস করেন এবং বর্ণবৈষম্যের তালিকায় তাদেরকেও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে গণ্য করা হয়। অবশেষে যখন কৃষ্ণাঙ্গদের পক্ষ থেকে আযাদী আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন অনেক মুসলমান পর্যন্ত সে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ফলে বন্দীত্বের নির্যাতনও বরণ করেন। অনেক মুসলমান সরাসরি নেলসন ম্যাণ্ডেলার রাজনৈতিক দল 'আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের' প্লাটফর্ম থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন করতে থাকেন। সুতরাং যখন দেশ স্বাধীন হয় এবং দেশে প্রথমবার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তখন অনেক মুসলমানও এ.এন.সি.র প্রতীকে বিজয়ী হয়ে সংসদে যান। বর্তমানে ১৫/২০ জনের কাছাকাছি মুসলমান নতুন সংসদের সদস্য। বরং তিনজন মুসলমান ম্যাণ্ডেলার কেবিনেটেরও সদস্য। তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, বর্তমানে আইন মন্ত্রণালয়ের মত নাজুক অধিদপ্তর রয়েছে মুসলমান মন্ত্রী মিষ্টার

আব্দুল্লাহর হাতে।

ম্যাণ্ডেলা ক্ষমতায় আসার পর দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানগণ নতুন সরকারের নিকট দাবী করে যে, স্বাধীনতার সুবিধার মধ্যে মুসলমানদেরকে অংশীদার করার জন্য মুসলমানদের বিবাহ, তালাক, অসিয়ত, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ক পারিবারিক আইনসমূহ সরকারীভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হওয়া দরকার। মুসলমানদের পারিবারিক মামলাসমূহের রায় ইসলামী আইন মোতাবেক হওয়া উচিত। ম্যাণ্ডেলার সরকার নীতিগতভাবে এ দাবী মেনে নিয়েছেন। তিনি মুসলমানদেরকে বলে দিয়েছেন যে, তারা এ বিষয়ে একটি খসড়া আইন তৈরী করে দিক, যা সংসদে পাশ করিয়ে কার্যকর করা হবে। এখন মুসলমানদের বিভিন্ন সংগঠন সম্মিলিতভাবে সমগ্র দেশব্যাপী একটি মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছে। বোর্ড এই খসড়া আইন প্রস্তুত করছে। কেপটাউনের মুসলিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সভাপতি শায়েখ নাজিম এই বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং এ্যাডভোকেট জনাব শুয়াইব উমর (যিনি দারুল উলূম করাচীতে ফেকাহ বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করেন) বোর্ডের সেক্রেটারী জেনারেল। এ খসড়া আইন তৈরী করতে অনেকগুলো আইনগত ও কর্মগত সমস্যা সামলাতে হবে। আমাকে বোর্ডের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী এ সমস্ত বিষয় নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শের জন্য দাওয়াত করেছিলেন। এবার আমার বেশীর ভাগ সময় কাটে ডারবানে এবং বেশীর ভাগ সময় এ বিষয়ে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের কাজে অতিবাহিত হয়। তবে অল্পসময়ের জন্য জোহান্সবার্গ ও প্রিটোরিয়ায়ও যাওয়া হয়। সেখানে সে দেশের মুসলমান আইনমন্ত্রী মিষ্টার আবদুল্লাহ, পার্লামেন্টের কতিপয় সদস্য এবং আরো কিছু লোকের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। দেখে আনন্দিত হই যে, আল্লাহর মেহেরবানীতে মুসলমানদের জন্য এই খসড়া আইন তৈরীর কাজে সমস্ত দলমতের লোকেরা যথার্থ আন্তরিকতা পোষণ করছেন। একটি অন্তর্বর্তীকালীন খসড়া ইতোমধ্যে তৈরী করা হয়েছে। আইনমন্ত্রী স্বয়ং এই খসড়াকে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি পার্লামেন্টে পেশ করার আন্তরিক সদিচ্ছা রাখেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন মুসলিম গোষ্ঠীর ঐকমত্য লাভের জন্য সচেষ্ট রয়েছেন।

পাশ্চাত্যে দু' সপ্তাহ

পাশ্চাত্যে দু' সপ্তাহ

গত ৩৫ দিনে ৯টি দূরবর্তী দেশ সফর করে এলাম। সেগুলো হল কাতার, হল্যাণ্ড, কানাডা, আমেরিকা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, সৌদী আরব, কেনিয়া, রি–ইউনিয়ন ও দক্ষিণ আফ্রিকা। এসব দেশের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, আমার প্রতিক্রিয়া এবং এসব দেশের বিভিন্ন তথ্য পাঠকদের মনোরঞ্জনকারী ও উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

ডিসেম্বরের ২য় সপ্তাহর দু'দিন কাতারে অতিবাহিত করে আমার কানাডা ও আমেরিকা যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। দীর্ঘ সফরের কষ্ট–ক্লান্তি থেকে বাঁচার জন্য মাঝে একদিন হল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ শহর আমষ্টারডামেও অবস্থান করি। সেখানে বিশ্বের সেই ব্যক্তিক্রমধর্মী শহরটিও দেখার সুযোগ লাভ করি, যাকে নদী ও পুলের শহর বলা হলে অত্যুক্তি হবে না। আমার জানামতে সমগ্র বিশ্বে এটিই একমাত্র শহর, নৌকায় আরোহণ করে যার পুরোটা ভ্রমণ করা যায়। পুরো শহরে আমষ্টার নদীর শাখা নদীসমূহের জাল বিস্তৃত। যেগুলো শহরের ঘনবসতিপূর্ণ মহল্লাসমূহের মধ্য দিয়ে বরং গলিসমূহের মধ্য দিয়েও ছড়িয়ে আছে। এখানকার বহু সংখ্যক অধিবাসী নৌকাতেই বসবাস করে এবং সে নৌকাগুলো সর্বদা নদীতেই অবস্থান করে।

যা হোক, প্রায় ৩২ ঘন্টা আমষ্টারডামে বিনোদনমূলক অবস্থানের পর আমি উত্তর আমেরিকা ভ্রমণ করি। এ সফরে কানাডার সর্ববৃহৎ নগরী টরেন্টো এবং আমেরিকার সর্ববৃহৎ নগরী নিউইয়র্কে প্রায় ১ সপ্তাহ অতিবাহিত করার সুযোগ লাভ করি। আমি ইতিপূর্বেও বহুবার আমেরিকা গিয়েছি। ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যখনই আমেরিকা যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, তখনই সেখানকার মুসলমানদের অবস্থা ও ইসলামী তৎপরতায় পূর্বের তুলনায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি অনুভূত হয়েছে। আমেরিকায় মুসলমানদের সংখ্যা, তাদের ধর্মীয় তৎপরতা এবং নতুন

নতুন প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ দৈনন্দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেদিন আমি কানাডায় পৌঁছি, তার মাত্র দুদিন পূর্বে (অর্থাৎ ১০ই ডিসেম্বর ১৯৯৪ খৃষ্টাব্দে) ক্যালিফোর্নিয়ার প্রসিদ্ধ পত্রিকা 'লসএঞ্জেল্স টাইমস' পাশ্চাত্যে মুসলমানদের অবস্থার উপর বিস্তারিত একটি সার্ভে রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল, যার শিরোনামে বলা হয়েছিল যে, 'যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় ইসলাম ধর্ম অন্যান্য ধর্মের তুলনায় সর্বাধিক দ্রুত বিস্তার লাভ করছে।' এ পর্যন্ত আমেরিকায় মুসলমানদের মোট সংখ্যার ব্যাপারে মানুষ বিভিন্ন অনুমান করে এসেছে। মুসলমানদের সংখ্যা সাধারণত ছয় থেকে আট মিলিয়ন পর্যন্ত বলা হতো। কিন্তু 'লসএঞ্জেলস টাইমসে'র বক্তব্য হল এ অনুমান বিজ্ঞানসম্মত কোন সার্ভের ভিত্তিতে ছিল না। এই সার্ভে অনুপাতে আমেরিকার মুসলমানদের সংখ্যা যদিও শুধুমাত্র ৫ লক্ষ বর্ণনা করা হয়েছে তবে সার্ভেতে স্পষ্টতঃ উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ সংখ্যা শুধুমাত্র ঐ সমস্ত মুসলমানের, যারা আমেরিকান মসজিদগুলোতে নিয়মিতভাবে জামাআতে নামায আদায় করে। সার্ভেকারীরা আমেরিকার ১০৪৬টি মসজিদের ব্যবস্থাপকদের নিকট থেকে মসজিদে নিয়মিত আগমনকারী মুসল্লীদের সংখ্যা অবগত হয়। তারপর এগুলোকে একত্রিত করে যে ফল প্রকাশ পায় তাতে জানা যায় যে, প্রত্যেক মসজিদে নিয়মিত নামায আদায়কারীদের সংখ্যা মসজিদ প্রতি গড়ে ৪৬৫ জন। সাথে সাথে সার্ভেতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের মোট সংখ্যার মাত্র দশ শতাংশ নিয়মিতভাবে মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করে। তাই মুসলমানদের প্রকৃত সংখ্যা ৫ মিলিয়ন অর্থাৎ ৫০ লাখের কম নয়। তবে এ থেকে এ ফলাফল বের করাও সঠিক হবে না যে, যে ৯০ শতাংশ মুসলমান নিয়মিতভাবে মসজিদে যায় না তারা সম্পূর্ণরূপে বেনামাযী। কারণ আমেরিকায় মসজিদসমূহের অবস্থান বহু দূরে দূরে। যে কারণে প্রত্যেকের জন্য নিয়মিতভাবে মসজিদে যাওয়া দুস্কর। সুতরাং অনেক মুসলমান হয় ঘরেই নামায পড়ে নেয় অথবা তারা বিভিন্ন মহল্লায় এমন নামাযের জায়গা বানিয়ে নেয়, যা নিয়মতান্ত্রিকভাবে মসজিদ নয়, তবে মহল্লার লোকেরা সেখানে একত্রিত হয়ে জামাআতের সাথে নামায আদায় করে।

লসএঞ্জেলস টাইমসের এই সার্ভেতে একথা বলা হয়েছে যে, আমেরিকায় প্রতিবছর কমপক্ষে ১ লক্ষ ২৫ হাজার মুসলমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার মধ্যে অন্যান্য দেশ থেকে আগমন করে অধিবাস গ্রহণকারী মুসলমানও শামিল রয়েছে এবং যে সমস্ত আমেরিকান অধিবাসী ইসলাম কবুল করছে, তারাও শামিল রয়েছে। পত্রিকার ভাষ্যমতে যদি মুসলমানদের সংখ্যা এ গতিতেই বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে আগামী শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত আমেরিকায় মুসলমানদের সংখ্যা আমেরিকান ইহুদীদের চেয়ে বেড়ে যাবে। তখন খৃষ্টধর্মের পর ইসলামই হবে আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম।

আমেরিকার কতিপয় মুসলিম গোষ্ঠী লসএঞ্জেলস টাইমস–এ প্রকাশিত এই সার্ভে রিপোর্টের শুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেছে। তারা দাবী করেছে যে, এই সার্ভে রিপোর্টে মুসলমানদের সংখ্যা বাস্তবের তুলনায় কম দেখানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের সঠিক সংখ্যা বর্তমানেও ইহুদীদের চেয়ে বেশী। তবে যদি লসএঞ্জেলস টাইমস–এর এই রিপোর্টকেই সঠিক ধরা হয়, তাহলেও একথাই স্পষ্ট হয় যে, আমেরিকায় ইসলাম ও মুসলমানদের যে দ্রুত গতিতে উন্নতি হচ্ছে তা পাশ্চাত্যের মিডিয়া জগতকে সজাগ ও শংকিত করার জন্য যথেষ্ট। এর পরিণতি এই হয়েছে যে, বিগত ২৫ বছরে আমেরিকার প্রায় প্রত্যেক ভূখণ্ডে জাঁকজমকপূর্ণ মসজিদ নির্মিত হয়েছে। শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে।

এটি ছিল একটি স্বনামধন্য আমেরিকান পত্রিকার রিপোর্ট। ঘটনাচক্রে এই রিপোর্ট প্রকাশ করার ঠিক এক বছর পূর্বে লণ্ডনের প্রসিদ্ধ দৈনিক 'টাইমস' ৯ই নভেম্বর ১৯৯৩ খৃষ্টাব্দ সংখ্যায় বৃটেনে ইসলামের জাগরণ সম্পর্কে একটি অতি বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল। যার শিরোনাম ছিল 'বৃটিশ নারীরা ইসলাম কবুল করছে কেন?' এই প্রবন্ধের শুরুতে এ শিরোনামও লাগানো হয়েছিল যে, পশ্চিমা মিডিয়ার বিদ্বেষমূলক আচরণ সত্ত্বেও ইসলাম পশ্চিমাদের অন্তর জয় করছে। এ প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, যে বিরাট সংখ্যক বৃটিশ অধিবাসী আজকাল

ইসলাম কবুল করছে, তার দৃষ্টান্ত অতীতে পাওয়া যায় না। যদিও বৃটেনে মুসলমানদের অধিক সংখ্যক ঐ সমস্ত লোকের, যারা স্বদেশ পরিত্যাগ করে বৃটেনে এসে অধিবাস গ্রহণ করেছে, তবে এখন বিরাট সংখ্যক বৃটিশ বংশোদ্ভুত নওমুসলিম এই সংখ্যাকে বৃদ্ধি করছে। অনুমান করা হচ্ছে যে, আগামী বিশ বছরের মধ্যে বৃটিশ নওমুসলিমদের সংখ্যা ঐ সমস্ত লোকদের তুলনায় বেড়ে যাবে, যারা বংশগতভাবে মুসলমান এবং স্বদেশ ছেড়ে এসে বৃটেনে অধিবাস গ্রহণ করেছে।

লণ্ডন টাইমস লিখেছে যে, যদিও পশ্চিমা মিডিয়া জগত ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে সর্বদা নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরে আসছে, এতদসত্ত্বেও বৃটিশ অধিবাসীদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের গতি দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মজার ব্যাপার হল, এ সমস্ত নওমুসলিম বৃটিশদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা অধিক। পত্রিকার ভাষ্যমতে আমেরিকার নওমুসলিমদের মধ্যেও নারীদের সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় চারগুণ বেশী এবং বৃটেনের নওমুসলিমদেরও অধিক সংখ্যক তারাই। পত্রিকার ভাষ্য হল ঃ

'It is even more ironic that most British converts should be women, given the despread view in the West that Islam treats women poorly.'

অর্থ ঃ 'আরও জুলুমের কথা এই যে, অধিকাংশ বৃটিশ নওমুসলিম হল নারী, অথচ পশ্চিমে একথা খুবই পরিচিত যে, ইসলাম নারীদের সঙ্গে খুবই হেয়তাপূর্ণ আচরণ করে।'

পাশ্চাত্যে ইসলাম বিস্তারের এই দ্রুতগতির কারণসমূহের উপরও পত্রিকা বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছে। তাদের বক্তব্য হল, যখন থেকে সালমান রুশদীর বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ে, তখন থেকে মানুষের মধ্যে ইসলামকে জানার আগ্রহ জন্মায়। অপরদিকে উপসাগরের যুদ্ধ ও বসনিয়ার মুসলমানদের দুরাবস্থাও ইসলামের প্রতি সহমর্মিতার কারণ হয়। তাছাড়া পশ্চিমা শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক গবেষণা শিক্ষা দানও বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলেও অনেক লোক মুসলমান হয়। তাছাড়া বৃটিশ মিডিয়া ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অক্লান্তভাবে যে প্রপাগাণ্ডা চালিয়ে থাকে এবং ইসলামের প্রত্যেকটি জিনিসকে মন্দ আখ্যা দেওয়ার যে পলিসি সে গ্রহণ করেছে, অনেকের উপর তারও

বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাচ্ছে। ফলে তারা ইসলামের দিকে ধাবিত হচ্ছে। শেষে পত্রিকা লিখেছে—

'Westerners despairing of their own society-rising crime, family breakdown, drugs and alcoholism-have come to admire the discipline and security of Islam.'

অর্থ ঃ 'পাশ্চাত্যের লোকেরা নিজেদের সমাজের ব্যাপারেই নিরাশ হয়ে চলেছে। তাতে ঊর্ধ্বমুখী অপরাধ প্রবণতা, পারিবারিক জীবন ব্যবস্থার বিলুপ্তি এবং মদ ও নেশাকর বস্তু সেবনের প্রাবল্য বিস্তার করেছে, ফলে তারা ইসলামপ্রদত্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার প্রশংসা করে থাকে।'

অনেক নওমুসলিম পূর্বে খৃষ্টান ছিল। তারা চার্চের বিশ্বাসের দৃঢ়তার অভাবে ক্ষুব্ধ এবং ত্রিত্ববাদ ও অন্যান্য আকীদার ব্যাপারে অতৃপ্ত ছিল। অনেক লোক এমনও ছিল, যারা মূলত কোন ধর্মের প্রতিই বিশ্বাসী ছিল না। কিন্তু তাদেরকে সেই তাসাউফ (আধ্যাত্মিকতা) হাতছানি দিয়ে ডাকে, যাকে তারা 'ইসলামের বোমের মোড়কে গুপ্ত হীরা' বলে আখ্যা দেয়। পত্রিকায় একথাও লিখেছে যে, তথাকথিত চিন্তার স্বাধীনতার এ যুগেও ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে বৃটেনে নিজের গোত্র ও সমাজের পক্ষ থেকে তীব্র সংকটের মুখোমুখী হতে হয়। নারীদের সাহায্যকারী সংস্থাকে টেলিফোন করে সাহায্য প্রার্থনাকারী নারীদের মধ্যে প্রায় এক চতুর্থাংশ নওমুসলিম।

তারপর লণ্ডন টাইমস এমন অনেক নারীর সাক্ষাৎকারও ছেপেছে, যারা বৃটিশ বংশোদ্ভূত, উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং ভালভাবে বুঝে শুনে ইসলাম গ্রহণ করেছে। ৩৯ বছর বয়স্কা এক মহিলা—যিনি তাঁর ইসলামী নাম রেখেছেন 'মায়মুনা'—পূর্বে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি খৃষ্টধর্মের প্রত্যেক দল সম্পর্কে গবেষণা করেন। তারপর তিনি ইহুদী ধর্ম, বৌদ্ধ মত ও হরেকৃষ্ণ সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন করেন। পরিশেষে তিনি ইসলামকে মনোনীত করেন। অনেক নওমুসলিম মহিলা বলেছেন যে, আমরা গীর্জার কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাসের বিরোধী। ইসলামের এ বিষয়টি আমাদের ভাল লেগেছে যে, প্রত্যেক মুসলমান সরাসরি তার খোদার সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে পাবে।

২৮ বছর বয়স্কা এক বৃটিশ মহিলা—যিনি মুসলমান হয়ে 'হুদা খুতুব' নামে পরিচিতি লাভ করেছেন—তিনি মুসলমান নারীদের জন্য একটি গ্রন্থও লিখেছেন। তিনি ১০ বছর পূর্বে মুসলমান হয়েছেন। ইসলাম ও খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

'খৃষ্টধর্ম সর্বদা পরিবর্তিত হতে থাকে, যেমন বর্তমানে কতিপয় খৃষ্টান বলতে আরম্ভ করেছে যে, বিবাহের পূর্বেই যৌন সম্পর্ক করায় কোন দোষ নেই, তবে শর্ত হল এ সম্পর্ক ঐ ব্যক্তির সঙ্গে হতে হবে, যার সঙ্গে বিবাহ করার ইচ্ছা রয়েছে। এটি বড় শিথিল ধর্ম। পক্ষান্তরে যৌন–সম্পর্কের বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা সর্বদা একরূপ। একইভাবে দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বিধানে ধারাবাহিকতা রয়েছে। নামাযের মাধ্যমে মানুষ সর্বদা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের কথা অন্তরে জাগরুক রাখে। এভাবে আপনার নিকট সবসময় আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার একটি ভিত্তি মজুদ থাকে।'

যদিও সাধারণ্যে প্রসিদ্ধ এই যে, পশ্চিমা নারীরা পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে পছন্দ করে এবং তাদের জন্য এ অবস্থান থেকে ফিরে আসা বড়ই কঠিন, কিন্তু বৃটেনের যে সমস্ত নওমুসলিম নারীর সঙ্গে লণ্ডন টাইমস কথা বলেছে, তাঁরা তাদেরকে বলেছেন যে, আমাদের জন্য ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণই ছিল এই যে, ইসলাম নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করেছে। যা উভয়ের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক কাঠামোর সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁদের মতে পাশ্চাত্যের নারীবাদী আন্দোলন (Feminism) মূলতঃ নারী জাতির সঙ্গে বিদ্রোহ ছিল। 'নারী স্বাধীনতা আন্দোলন' সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁরা বলেন যে, এর অর্থ এছাড়া আর কিছুই নয় যে,

Women copying men, an exercise in which womanhood has no intrensic value.

অর্থ ঃ 'নারীরা পুরুষদের অনুকরণ করবে, আর এটি এমন একটি কাজ, যার মধ্যে নারীত্বের নিজস্ব কোন মূল্য ও মর্যাদা অবশিষ্ট থাকে না।'

স্কটল্যাণ্ডের ছত্রিশ বছর বয়স্কা একজন মহিলা ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত একটি আবর্জনার টুকরীতে পড়া

অবস্থায় পান (নাউযুবিল্লাহ)। তিনি কাগজটি উঠান, কাগজটি পাঠ করে তাঁর অন্তরে ইসলাম গ্রহণের আগ্রহ জন্মায়। তিনি মুসলমান হন। তিনি নিজের ইসলামী নাম ধারণ করেন 'নূরিয়া'। এক আলোচনায় নূরিয়া পাশ্চাত্যের নারীদের কর্মপন্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন ঃ

'Most of the women in this country are traitors to their sex. It is almost as if we have been defeminised.'

অর্থ ঃ 'এদেশে অধিকাংশ নারী স্বজাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। এ কর্মপন্থাটি অনেকটা এমন, যেমন কিনা আমাদের থেকে আমাদেরকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।'

নূরিয়ারই এক বান্ধবী—১৯৮৮ ঈসায়ীতে মুসলমান হন—যিনি নিজের নাম রেখেছেন 'হাসানা'। তিনি পর্দার বিধান মেনে চলেন এবং বলেন যে, 'কমপক্ষে আমি স্বজাতের বিদ্রোহী নই।'

পর্দা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি আরো বলেন—

'এতে আমরা নিরাপত্তা উপলব্ধি করি এবং আমাদের আস্থাশীলতা বৃদ্ধি পায়।'

নূরিয়া বলেন যে, পাশ্চাত্যে এখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে বিতর্ক চলছে যে, বিবাহের সময় এবং তার পরবর্তীতেও নারীর নাম পর্যন্ত পুরুষের অধীন হয়ে থাকে। অথচ ইসলামে আমাদেরকে পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক অধিকার দান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি সম্পত্তির উত্তরাধিকার, শিশু হস্তান্তর ইত্যাদি বিষয়ে ইসলামী বিধানের উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, অবস্থা যেদিকে মোড় নিচ্ছে আমি এদেশে (বৃটেন) নারী জাতির কোন ভবিষ্যত দেখতে পাচ্ছি না, শেষ পরিণতি নারীদেরই খারাপ হয়ে থাকে।

'Scratch any new man and you find an old man trying to get out ; men will always be the same women are changing much faster, but they are not trying to get what they want, every thing the feminist movement is aiming for, except abortion and lesbianism, we've got.'

অর্থ ঃ 'যে কোন নতুন পুরুষকে খুঁটিয়ে দেখুন। তার ভেতর থেকে একটি পুরাতন পুরুষ বের হতে দেখা যাবে। পুরুষরা সর্বদা একই রূপ থাকবে। নারীরা অতি দ্রুতগতিতে পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু তারা যা লাভ করতে চায়, তা লাভ করতে চেষ্টা করছে না। নারীবাদী (Faminism)

আন্দোলন যে সমস্ত লক্ষ্যকে নিয়ে সংগ্রাম করছে, তার মধ্য থেকে গর্ভপাত ও সমকামিতা ছাড়া সবকিছু আমরা পূর্ব থেকেই লাভ করেছি।'

লণ্ডন টাইমস লেখে যে, অনেক নওমুসলিম মহিলা ইসলাম ও পাশ্চাত্যের তুলনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, ইসলামী শিক্ষায় নারী অধিক মর্যাদা ও সতীত্ব লাভ করেছে। যা পাশ্চাত্যের নারীরা লাভ করেনি। তাদের মতে পাশ্চাত্যের 'নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের' এ ছাড়া অন্য কোন ফল হয়নি যে, নারী দ্বিগুণ বোঝার চাপে নিষ্পেষিত হয়েছে। পত্রিকার ভাষায়—

'Many muslims contrast the status of women in Islam with what they see as the dismal plight of women in the west. They note that here women work fulltime out of financial necessity remaining lumbered with the housework and children care. It is a puzzling version of emancipation.'

অর্থ ঃ 'অনেক মুসলমান ইসলামে প্রদত্ত নারীর মর্যাদার সাথে পাশ্চাত্যে দৃশ্যমান নারীর বেদনাদায়ক দুরাবস্থার মোকাবেলা করে থাকে। তারা দেখে যে, এখানে (পাশ্চাত্যে) নারীরা নিজেদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পুরা করার জন্য সবসময় অর্থনৈতিক পেশা অবলম্বন করে। এতদসত্ত্বেও গৃহস্থালী কর্ম ও শিশুদের পরিচর্যার দায়িত্বের চাপে তারা যথাপূর্ব নিষ্পেষিত। এটি নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের অবোধগম্য দিক।'

লণ্ডন টাইমস এ ধরনের বেশ কয়েকটি সাক্ষাতকার এ সংখ্যায় প্রকাশ করেছে। সেগুলোতে বৃটিশ নওমুসলিম মহিলারা পাশ্চাত্য জীবনধারার প্রতি বীতশ্রদ্ধতা ব্যক্ত করেছেন, পক্ষান্তরে ইসলামের শান্তি ও পরিতৃপ্তির কথা স্বীকার করেছেন। এখানে তাদের সমস্ত কথা উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। তবে এ প্রবন্ধের সঙ্গে লণ্ডন টাইমস একটি সম্পাদকীয়ও লিখেছে, যার শিরোনাম 'ইসলামকে নির্বাচন'। সেই সম্পাদকীয়র কিছু উদ্ধৃতি—কথা দীর্ঘ হওয়ার আশংকা সত্ত্বেও—পত্রিকার নিজের ভাষায় তুলে ধরা সমীচীন মনে করছি। লণ্ডন টাইমস লিখছে—

'As the investigation in the Times on women and Islam has shown, the intellectual calarity and moral certainly of this 1400 years-old faith are proving attractive to many Western women disillusioned with the moral relationism of their own culture. Though

some are converting to Islam after marrying Pakistani of Bangladeshi men, others are making the leap of faith as an independent act of spiritual self improvement.

Inspite of the outrageous indignities which many women suffer in Muslim countries, the principles outlined in the Quran are generally sympathetic to their interests, promising them rights over men similar to those of men over women'

....The separate spheres marked out for the two sexes by Islam certainly bear little relationship to the nations of gender which have been ushered in by the faminist revolution. But what matters is that many of the women in the West who have taken this unexpected path have done so out of choice rather that familial duty or historic obligation they have been positively attracted by the sense of sisterhood and community they discover in Islam. This fentative process of spritual change suggests that increasing numbers of people are questioning the value system of their own culture. It raises important questions about the state of the Western moral tradition and how it might be fortified. Yet the effect of this (still modest), phenomenon is likely to be positive. The presence of Muslim converts in British Society-many of them highly educated can only assist the process of mutual understanding between the two cultures which the Prince of Wales celebrated last month. Only those who have crossed the divide can truly understand what lies on either side.'

'টাইমস' নারী ও ইসলাম বিষয়ে যে গবেষণা করেছে তার ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ১৪০০ বছরের পুরাতন এই ধর্ম চিন্তাগত দিক থেকে স্বচ্ছ এবং নৈতিকতার দিক থেকে চূড়ান্ত ও অপরিহার্য হওয়ায় বহু পাশ্চাত্য নারীর জন্য আকর্ষণীয় প্রমাণিত হচ্ছে। এরা ঐ সমস্ত নারী, যারা নিজেদের সংস্কৃতির নৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রতারণা থেকে মুক্ত হয়েছে। (নৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্বারা সম্পাদকের উদ্দেশ্য হল, পাশ্চাত্য দেশে কোন নৈতিক মূল্যবোধ স্থায়িত্বের অধিকারী নয়, বরং স্থান ও কালের দাবী অনুপাতে তা পরিবর্তিত হতে থাকে)। যদিও কিছু মহিলা পাকিস্তান বা বাংলাদেশী পুরুষের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর ইসলাম কবুল করছে, কিন্তু অন্যান্য নারী ইসলামের দিকে এজন্য ছুটে চলছে যে, তা তাদের পক্ষ থেকে আধ্যাত্মিকভাবে ব্যক্তি সংস্কারের এক স্বাধীন কর্মসূচী।

যদিও মুসলমান দেশসমূহে বহু নারী তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও লাঞ্ছনার শিকার, কিন্তু কুরআনে বর্ণিত মূলনীতিসমূহ সাধারণতঃ নারী স্বার্থের প্রতি সহানুভূতিশীল। কুরআন ওয়াদা করে যে, পুরুষদের উপর নারীদেরও এমন অধিকার রয়েছে, যেমন অধিকার রয়েছে, নারীদের উপর পুরুষদের।

ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীর জন্য যে ভিন্ন কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করেছে, তা নিশ্চয়ই ঐ সমস্ত নেতিবাচক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে না, যেগুলো নারী আন্দোলন প্রচার করেছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, পাশ্চাত্যের বহু নারী—যারা অপ্রত্যাশিত এ পথ গ্রহণ করেছে—নিজেদের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে এমনটি করেছে। পারিবারিক কোন চাপ কিংবা ঐতিহাসিক কোন কর্তব্য পালনের জন্য নয়। তারা মূলতঃ ইতিবাচকভাবে সেই ভ্রাতৃত্ব ও সমাজ-চেতনায় প্রভাবিত হয়েছে, যা তারা ইসলামের মধ্যে পেয়েছে।

আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের এ অন্তর্বর্তী কর্ম প্রকাশ করে যে, মানুষের বর্ধিষ্ণু সংখ্যা নিজেদের সংস্কৃতির মূল্যবোধ ব্যবস্থাকে হেয় ও সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখছে। এ পরিস্থিতির কারণে পাশ্চাত্যের নৈতিক ঐতিহ্যের বর্তমান অবস্থার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বহু প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। আরো প্রশ্ন উঠছে যে, এ অবস্থাকে কিভাবে সুদৃঢ় করা যায়? তবুও (ইসলাম গ্রহণের) এ অবস্থা (যা এখনও পর্যন্ত ভারসাম্যের মধ্যে রয়েছে) বাহ্যতঃ ইতিবাচক প্রমাণিত হবে। বৃটিশ সমাজে নওমুসলিমদের অবস্থানের কারণে—যাদের অনেকে উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত—এ লাভই হতে পারে যে, উভয় সভ্যতার মাঝে পারস্পরিক সমঝোতাকে কাজে লাগানোর মধ্যে সহযোগিতা পাওয়া যাবে। এ দিকটির উপর প্রিন্স অব ওয়েলস জোর দিয়েছেন। যে সমস্ত লোক বিভেদ রেখার সীমানা অতিক্রম করে গেছে কেবলমাত্র তারাই এ বিষয়টি যথাযথভাবে বুঝতে পারবে যে, অপরদিকের স্বরূপ কি?"

ইউরোপ ও আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ দু'টি পত্রিকার রিপোর্ট এবং তাদের প্রতিক্রিয়া সুধী পাঠক পাঠ করলেন। যদিও মুসলমানদের পক্ষ থেকে অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের সুসংহত কোন কাজ হচ্ছে না বরং সত্যি কথা এই যে, মুসলমানদের সামগ্রীক ধর্মীয় ও নৈতিক অবস্থা ইসলামের দিকে তাদেরকে আকৃষ্ট করার কারণ না হয়ে বরং প্রতিবন্ধক হচ্ছে। তৃতীয়তঃ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে

পাশ্চাত্য মিডিয়া জোর তৎপর। কিন্তু এতসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যে ইসলাম বিস্তারের গতি খোদ পাশ্চাত্যবাসীকেই চমকিয়ে দিচ্ছে। এতে করে অনুমান করা যায় যে, পাশ্চাত্য দেশসমূহে একনিষ্ঠভাবে ধর্মীয় কাজ করার কত বিশাল ময়দান রয়েছে। মুসলমানগণ যদি স্বীয় কথা ও কর্মের মাধ্যমে অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ সুসংহত ভাবে সম্পাদন করে তাহলে তার ফলাফল কত উৎকৃষ্ট হতে পারে?

পাশ্চাত্যে মুসলমানদের বর্ধিষ্ণু সংখ্যা একদিকে যেমন সুন্দর ভবিষ্যতের বার্তাবহ, অপর দিকে মুসলমানগণ সেখানে বহু কঠিন সমস্যারও মুখোমুখী। একথা তো টাইমস এর ভাষায় আপনারা পূর্বে পাঠ করেছেন যে, যে সমস্ত লোক মুসলমান হন, তাদেরকে নিজেদের পরিবার ও পরিবেশের পক্ষ থেকেই বহু নির্যাতন সহ্য করতে হয়। পাশ্চাত্যের চিন্তার স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার যত প্রপাগাণ্ডাই করা হোক না কেন, কিন্তু তাদের বাস্তব অবস্থা দেখে মনে হয়, চিন্তার স্বাধীনতা ও স্বাধীন মতামতের এই সুন্দর মূলনীতি মুসলমানদের জন্য তৈরী করা হয়নি। অপরদিকে সেখানকার মুসলমানদের সর্ববৃহৎ সমস্যা নিজের সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা। সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে যে পাঠ্যক্রম চালু রয়েছে এবং যে পরিবেশে সেখানে শিশুরা শিক্ষা লাভ করে তাতে শুধু ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষা করাই জটিল নয় বরং ঈমান রক্ষা করাও বড় জটিল ব্যাপার। তাই পাশ্চাত্যে বসবাসকারী প্রত্যেক সচেতন মুসলমান এজন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যে, তারা কিভাবে নিজেদের সন্তানদেরকে মুসলমানরূপে টিকিয়ে রাখবে?

এ সমস্যার মূল সমাধান তো এই যে, মুসলমানদের শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ পৃথক করতে হবে। যেখানে মুসলমান শিশুরা ইসলামী পরিবেশে প্রতিপালিত হতে পারবে। এদিকে কিছু প্রচেষ্টাও চলছে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। যার কয়েকটি আমারও দেখার সুযোগ লাভ হয়েছে। এ অবস্থা দেখে বড়ই আনন্দিত হয়েছি যে, এ সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্রে শিশুদেরকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে পরিমিত পরিমাণ ধর্মীয় জ্ঞানই শুধু দান করা হচ্ছে না, বরং সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সার্বিক পরিবেশ তাদের

ধর্মীয় ও নৈতিক দীক্ষা দানে কল্যাণকর কৃতিত্ব সম্পাদন করছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা খুবই কম। সেগুলো সমস্ত মুসলমানের প্রয়োজন পুরো করার জন্য মোটেও যথেষ্ট নয়। তাই বেশীর ভাগ মুসলমান নিজেদের শিশুদেরকে দ্বীন সম্পর্কে অবহিত করা এবং ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করে থাকে তা এই যে, প্রায় প্রত্যেক মসজিদে এবং প্রত্যেক ইসলামী কেন্দ্রে ছোট ছোট মক্তব ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তার মধ্যে কিছু মাদরাসা প্রতিদিন বিকাল বেলা দুই থেকে তিন ঘন্টা সময় শিশুদেরকে ধর্মীয় শিক্ষায় সমৃদ্ধ করার খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছে। আর কিছু মাদরাসা রয়েছে সাপ্তাহিক। সেগুলোতে রবিবার দিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এ খিদমত আঞ্জাম দেওয়া হয়। এগুলোকে 'সানডে স্কুল' বলা হয়। শিশুদের মাতা-পিতা এ ব্যাপারে যত্ন নিয়ে থাকেন। সাধারণ স্কুল থেকে ছুটি পাওয়ার পর তারা শিশুদেরকে বিকাল বেলা ঐ সমস্ত মাদরাসায় পাঠিয়ে থাকেন। এ জন্য মা-বাবা বড় কষ্ট করেন। এ জাতীয় মাদরাসা যেহেতু অনেক দূরে দূরে অবস্থিত, তাই মা-বাবা নিজেরাই শিশুদেরকে মাদরাসায় পৌঁছান এবং নিজেরাই নিয়ে আসেন। দৈনন্দিনের কর্মব্যস্ততার মধ্যে শিশুদেরকে মাদরাসায় পৌঁছানো এবং নিয়ে আসার এই কাজ সেখানকার ব্যস্ততম জীবনে খুব জটিল। কিন্তু যে সমস্ত মুসলমানের নিজের সন্তানদের ভবিষ্যতের ফিকির রয়েছে, তারা এ কষ্ট খুশী মনে বরণ করে থাকেন।

এছাড়া এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সেখানকার সচেতন মুসলমানদের নিজেদের সন্তানদেরকে গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশেষ ফিকির রয়েছে। তারা পদে পদে শিশুদের চলাফেরার প্রতি নজরদারি করেন। নিজেদের পারিবারিক পরিবেশে তাদেরকে ইসলামী মূল্যবোধের অনুগামী বানানোর চেষ্টা করেন। সবচে' বড় কথা হল, তারা নিজেদের কর্মপন্থার মাধ্যমে সন্তানদের মস্তিষ্কে একথা বদ্ধমূল করে দিয়েছেন যে, তাদের জাতীয় ও ধর্মীয় স্বকীয়তা পাশ্চাত্যের অধিকাংশ অধিবাসীর থেকে পৃথক। আমি সেখানকার এ দৃশ্য দেখে অভিভূত ও বিস্মিত হয়েছি যে, সেখানকার সচেতন মুসলিম ঘরানার সন্তানদের মধ্যে ইসলামের

নিদর্শনসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা এবং দিবস–রজনীর বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের 'মাসনূন দু'আ' পাঠ করার এত অধিক গুরুত্ব রয়েছে যে, আমরা খোদ পাকিস্তান ও অন্যান্য মুসলিম দেশেও সেরূপ গুরুত্ব দেখতে পাই না। সেখানকার শিশুরা অনেক সময় এমন সব কথা জিজ্ঞেস করে, যা এখানকার বড়দের থেকেও শোনা যায় না। তবে সেখানকার পরিবেশে থাকতে থাকতে অবস্থা এই হয়েছে যে, শিশুরা নিজেদের বাপ–দাদার ভাষা—যেমন, উর্দূ, আরবী ইত্যাদির থেকে একদম অপরিচিত হয়ে গিয়েছে। তাই তাদের সঙ্গে ইংরেজীতেই কেবল কথা বলা যায়। তারা উর্দূ, আরবী পুস্তিকা থেকে যথাযথ উপকৃত হতে পারে না। তাই তাদের ইংরেজী পুস্তিকার (প্রচারপত্র) প্রয়োজন রয়েছে। তারা এ ধরনের পুস্তিকা হাতে পেলে আনন্দ প্রকাশ করে। ধর্মীয় সভায় অংশগ্রহণেরও সেখানে বেশ আগ্রহ রয়েছে। মানুষ গুরুত্বের সাথে নিজেদের সন্তানদেরকে এমন সভায় অংশগ্রহণের জন্য অনেক দূর থেকে সঙ্গে নিয়ে আসে।

মুসলমানদের এ ধর্মীয় চেতনাই পাশ্চাত্য দেশসমূহে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়তে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে। কতিপয় শিক্ষাকেন্দ্রের আলোচনা তো আমি উপরে করলাম। বর্তমানে সেখানে এমন উঁচুমানের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, যেগুলো ইসলামী জ্ঞান–বিজ্ঞানে দক্ষ আলেম তৈরী করতে সক্ষম। যেন এ সমস্ত আলেম সেখানে মুসলমানদের ধর্মীয় দিক নির্দেশনার দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে আমাদের মুহতারাম দোস্ত ডঃ ইসমাঈল সাহেব কয়েক বছর পূর্বে নিউইয়র্ক–এর 'বাফেলো' শহরে একটি বড় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এছাড়া মুসলমানদের সাধারণ প্রয়োজনসমূহ পুরো করার জন্য জায়গায় জায়গায় হালাল গোস্তের অসংখ্য দোকান প্রতিষ্ঠা করেছেন। হালাল খাদ্য সম্বলিত বহু সংখ্যক রেস্তোরাঁও প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিছু কিছু শহর ও মহল্লায় গিয়ে মনে হয়, যেন আমরা কোন মুসলিম দেশে দাঁড়িয়ে আছি।

পাশ্চাত্য দেশসমূহে বসবাসের জন্য বাড়ীর ব্যবস্থা করা বড় ধরনের একটি সমস্যা। সাধারণতঃ মানুষ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বাড়ী তৈরী করে। কিন্তু যে সমস্ত মুসলমান সুদ থেকে বাঁচতে চায়, তারা এমন সমস্ত

প্রতিষ্ঠান খাড়া করছে, যেখান থেকে লোকদেরকে বিনা সুদে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এ ধরনের ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান টরেন্টো, টেক্সাস, লসএঞ্জেলস ইত্যাদিতে আগে থেকে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এখন মুসলমানদের মধ্যে সেগুলো আরো বাড়ানোর তৎপরতা শুরু হয়েছে। আমাদের এক আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ নওমুসলিম বন্ধু আবদুল কাদের ষ্টিভেন (যার পূর্বে নাম ছিল 'মিঃ ষ্টিভেন') বিশেষভাবে এ কাজে আন্তরিকতা পোষণ করেন।

তিনি 'জার্নাল অব ইসলামী ফিন্যান্স' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও বের করেন। তাতে ইসলামের অর্থ ও সম্পদের বিভিন্ন দিক সংক্রান্ত প্রবন্ধ ও সংবাদসমূহ প্রকাশিত হয়। তিনি 'ওহাইও'–এর সামাদ গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমেরিকান মুসলমানদের জন্য একটি সুদমুক্ত বাসস্থান স্কীম আরম্ভ করার ইচ্ছা করেছেন, যা সমগ্র আমেরিকায় ব্যাপক আকারে কাজ করতে চায়। জেদ্দার 'আল বারাকা' গ্রুপের সহযোগিতাও তারা লাভ করেছেন। এ স্কীমের আইনী দিকসমূহের তত্ত্বাবধান করার জন্য তারা নিউইয়র্কের আইনবিদদের প্রসিদ্ধ ফোরাম গোডার্ট ব্রাদার্সের সেবা লাভ করেন। স্কীমের শরীয়ত আইনও বাস্তব কর্মক্ষেত্রের দিকসমূহ সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য তারা গোডার্ট ব্রাদার্সের অফিসে সাক্ষাতের একটি প্রোগ্রাম রেখেছিলেন। তাতে আমাকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সেখানে গোডার্ট ব্রাদার্সের পক্ষ থেকে মি. পিটার তার দু'জন সহযোগী সহ উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া আমাদের বন্ধু আবদুল কাদের ষ্টিভেন, আল বারাকার পক্ষ থেকে ড. সালেহ ঘালাইকা এবং সামাদ গ্রুপের পক্ষ থেকে জনাব বশির আহমাদও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। কয়েক ঘন্টা ধরে এ আলোচনা চলতে থাকে।

তারপর মি. পিটার তার অফিসেই—যা যুগখ্যাত এ্যাম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং এর সম্মুখে আকাশচুম্বী এক ভবনে অবস্থিত—মধ্যাহ্ন ভোজেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। তাতে ফোরামের অন্যান্য বিশিষ্ট আইনবিদদেরকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। যদিও খাওয়ার এ অনুষ্ঠানের অধিকাংশ লোক অমুসলিম ছিলেন, কিন্তু আমরা যারা মুসলমান ছিলাম তাদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে মি. পিটার খাবারে শুধুমাত্র মাছ ও সবজির ব্যবস্থা করেন।

পানীয়সমূহও কেবলমাত্র ফলের রস ও পেপসি কোলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন। খাবার টেবিলে বসতে বসতে মি. পিটার আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানের পর অন্যান্য অমুসলিম সুধীজনকে বলেন যে, আপনাদের মনে ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে নানারকম প্রশ্ন জেগে থাকে। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আপনারা যদি এঁকে কিছু প্রশ্ন করতে চান তাহলে তার জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। বাস আর কি চাই.... চতুর্দিক থেকে প্রশ্নের ঢল ছুটল। এভাবে ভোজের এ আসর মনোমুগ্ধকর এক আলোচনা মাহফিলে পরিণত হয়। কতক উপস্থিতির প্রশ্ন কিছুটা তির্যকও ছিল। তবে আল্লাহ তাআলার বিশেষ মেহেরবানী যে, আমি প্রশান্তভাবে সেগুলোর উত্তর দিতে থাকি। এক পর্যায়ে প্রশ্নসমূহের সামগ্রিক দিক লক্ষ্য করে আমি মৌলিক কথা বলা সমীচীন মনে করি। আমি নিবেদন করি যে, ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শ পাশ্চাত্য জীবনে চালু মুদ্রা বলে অনেক সময় পাশ্চাত্য মস্তিষ্কের এ কথার তাৎপর্য বুঝে আসে না যে, জীবনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকসমূহকে দ্বীন–ধর্মের শিকলে আবদ্ধ করা হবে কেন? আরো প্রশ্ন জাগে যে, প্রায় পনের শতাব্দী পূর্বের শিক্ষাসমূহ বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে কি করে কার্যকর হতে পারে? এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমি সংক্ষেপে একথা পরিষ্কার করার চেষ্টা করি যে, জীবনের সমস্ত সমস্যার যথাযথ সমাধানের জন্য কেবলমাত্র মানববুদ্ধি কেন যথেষ্ট নয় এবং কেন এজন্য ঐশী প্রত্যাদেশের প্রয়োজন।

তারপর আমি একথাও তুলে ধরি যে, বর্তমানে পাশ্চাত্য জগত সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয়বরণ ও খণ্ড বিখণ্ড হওয়া এবং সোস্যালিজমের ব্যর্থতায় আনন্দ করছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার যে সমস্ত খারাপ দিকের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ করেছিল, সে সমস্ত খারাপ দিক কি পুঁজিবাদী দেশসমূহ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়নের ধসকে সমাজতন্ত্রের ভরাডুবি তো বলা যেতে পারে, কিন্তু পুঁজিবাদের জয় বলা যায় না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যদি তার সে সমস্ত খারাপ দিক সংশোধনে প্রস্তুত না হয় তাহলে অন্য কোন রূপে এর প্রতিক্রিয়া

আত্মপ্রকাশ করতে পারে। উপস্থিত সুধীজনের প্রশ্নের উত্তরে আমি ইসলামের কতিপয় অর্থনৈতিক দিক–নির্দেশনার বিশ্লেষণ করি এবং সাথে সাথে অনুযোগও করি যে, যখনই কোথাও এ সমস্ত শিক্ষা অনুপাতে আমল করার আহবান করা হয়, তখনই পাশ্চাত্যে এ বিষয়ে শান্ত ও গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা না করে বরং হৈচৈ আরম্ভ করা হয় যে, এরা মৌলবাদী, এরা পশ্চাতপদ। এ সমস্ত শিক্ষার আহবায়করা ঘড়ির কাঁটাকে পিছনে ফেরাতে চায়, ইত্যাদি। এই হৈচৈ এর ফলে সমঝোতার সমস্ত দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

উপস্থিত সুধীজন মুক্তমনে আমার আলোচনা শ্রবণ করেন। কতিপয় ইসলামী শিক্ষার ব্যাখ্যায় যে কথাগুলো বলা হয়েছিল, সেগুলোকে তারা সৃজনশীল (Creative) আখ্যা দেন। আমি তাদেরকে বলি যে, আজকের এ আলোচনার যদি শুধুমাত্র এ ফায়দাটুকুও হয় যে, আমরা নিছক শ্লোগান আর প্রোপাগাণ্ডায় প্রভাবিত না হয়ে প্রকৃত স্বরূপকে অধ্যয়ন করার সংকল্প করি, তাহলেও এ বৈঠক কল্যাণ থেকে খালি হবে না। বৈঠক শেষ হওয়ার পরদিন মিঃ থমাস ষ্টিভেন হোটেলে আমার সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। তিনি আমাকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করে বলেন যে, কালকের আলোচনায় উপস্থিত লোকদের উপর ভাল প্রভাব পড়েছে। ঐ বৈঠকের কথাগুলো পরেও আলোচিত হতে থাকে।

আমেরিকার সফরশেষে আমি কয়েকদিনের জন্য ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের প্রসিদ্ধ দ্বীপ বারবাডোজ (Barbados) ভ্রমণ করি। ইতিপূর্বে যখনই আমি আমেরিকা বা কানাডা গিয়েছি, বারবাডোজের কতিপয় বন্ধু অত্যন্ত মহব্বতের সঙ্গে তাদের সেখানে যাওয়ার জন্য প্রত্যেকবারই আমাকে দাওয়াত করেন। কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে আমি তাদের সে ফরমায়েশ পুরা করতে পারিনি। এবার আমি তাদের সঙ্গে ওয়াদা করেছিলাম। তাই সে ওয়াদা পুরো করা ছিল আমার জন্য জরুরী। সুতরাং নিউইয়র্কের ভ্রমণ শেষ হলে সুদৃশ্য এ দ্বীপে কয়েকদিন অবস্থান করি।

বারবাডোজ ঐ সমস্ত দ্বীপের অন্যতম, যেগুলোকে ইংরেজীতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বলে। কথিত আছে যে, কলম্বাস যখন এ সমস্ত দ্বীপে এসে পৌঁছেন, তখন তিনি মনে করেন যে, তিনি ভারত পৌঁছেছেন।

পরবর্তীতে এ ভুল ধারণা বিদূরীত হলেও দ্বীপগুলোর নাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজই প্রসিদ্ধি লাভ করে। এটি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মাঝে চন্দ্রাকৃতিতে বিস্তৃত অনেকগুলো দ্বীপের সমষ্টি। যার মধ্যে কিউবা, জ্যামাইকা, হাইতি, ত্রিনিদাদ বাহামাস, টোবাগো, বারবাডোজ ইত্যাদি শামিল রয়েছে। এক সময় এ সমস্ত দ্বীপ কোন না কোন ইউরোপিয়ান শক্তির অধীনস্থ ছিল। এখন এ সব কয়টি দ্বীপই স্বাধীন হয়েছে। এখন এখানকার প্রত্যেকটি দ্বীপ একেকটি স্বতন্ত্র দেশ।

বারবাডোজ যদিও আয়তন ও জনসংখ্যার দিক থেকে খুবই ছোট একটি দ্বীপ, কিন্তু নৈসর্গিক সৌন্দর্য–সমৃদ্ধ ও উন্নত হওয়ার ফলে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সমস্ত দ্বীপের উপর এর প্রাধান্য রয়েছে। দ্বীপটির মোট আয়তন কেবলমাত্র ১৬৬ বর্গমাইল, উত্তর থেকে দক্ষিণে এর মোট দৈর্ঘ্য ২১ মাইল এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে এর প্রস্থ মাত্র ১৫ মাইল। এখানকার বড় শহর মূলত একটি, যার নাম ব্রীজটাউন। অবশিষ্ট ছোট ছোট জনবসতি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে আছে। সমগ্র দ্বীপের মোট জনসংখ্যা মাত্র আড়াই লাখের কাছাকাছি। এখানকার সমস্ত অধিবাসী বহিরাগত। অন্যথা এখানকার আদিবাসী 'এ্যারাডাক' গোত্রের একজনও এখন আর বিদ্যমান নেই। বলা হয় যে, ইউরোপিয়ান অধিবাস গ্রহণকারীরা এই গোত্রের বীজ নিপাত করেছে। এ কথাও বলা হয় যে, এরা ছিল মানুষ খেকো। আমাদের জানা নেই যে, একথা সাম্রাজ্যবাদী জুলুম–নির্যাতনকে পর্দাবৃত করার জন্য প্রচার করা হয়েছে, নাকি প্রকৃতই তারা মানুষ খেকো ছিল?

যা হোক, এখন এখানকার অধিবাসীদের সিংহভাগ ঐ সমস্ত কৃষ্ণাঙ্গদের, যাদেরকে দক্ষিণ আমেরিকা বা আফ্রিকার কিছু ভূখণ্ড থেকে দাস বানিয়ে এখানে আনা হয়েছিল। প্রায় দশ শতাংশ অধিবাসী শ্বেতাঙ্গ। তারা এই দ্বীপ বিজয়ী ইংরেজদের স্মৃতি। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এ দ্বীপ বৃটিশ শাসকদের কর্তৃত্বাধীন ছিল। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সংযুক্ত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে এটি পরিপূর্ণভাবে স্বাধীনতা লাভ করে। এখন এটি পৃথক একটি রাষ্ট্র। যা এত ছোট আয়তন ও কম জনসংখ্যার হওয়া সত্ত্বেও নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি হওয়ার কারণে পর্যটকদের সমাগমস্থলে পরিণত হয়েছে।

বিষুবরেখার নিকট অবস্থিত বিধায় এখানে শীত পড়ে না। সাধারণতঃ ঋতুর মধ্যে ভারসাম্য বিরাজ করে। সুতরাং ইউরোপ ও আমেরিকার তীব্র শীতে শঙ্কাগ্রস্ত মানুষ শীতকালীন ছুটি এখানে এসে অতিবাহিত করে। আখ ছাড়া এদেশের আমদানীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মাধ্যম পর্যটন।

যখন এখানে ইংরেজদের শাসন ছিল, তখন তারা কিছু ভারতীয় অধিবাসীকে চাকরী দেওয়ার জন্য এখানে নিয়ে আসে। এভাবে এখানে অনেক ভারতীয় বংশোদ্ভূত লোকেরও বসতি হয়। কিছু ভারতীয় বণিক এখানে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এসেও অধিবাস গ্রহণ করে। এভাবে এখানে বেশ সংখ্যক ভারতীয়ও রয়েছে। তার মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ১ হাজার। যদিও মুসলমানদের এ সংখ্যা (যার মধ্যে নারী ও শিশুও অন্তর্ভুক্ত) অতি অল্প, কিন্তু এরা এজন্য শতবার মোবারকবাদ ও প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য যে, এরা নিজেদের ইসলামী স্বকীয়তাকে পূর্ণ যত্ন সহকারে এমনভাবে ধরে রেখেছে যে, এদের ধর্মীয় উদ্দীপনা অনেক মুসলিম দেশের অধিবাসীদের তুলনায়ও অনেক বেশী। ব্রীজটাউনের ছোট শহরটিতে দুটি জাঁকজমকপূর্ণ মসজিদ রয়েছে। সেগুলোতে নিয়মিতভাবে মাইকযোগে আযান হয়। উভয় মসজিদে শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য মাদরাসা রয়েছে। প্রত্যেক মুসলমান শিশু স্কুল ছুটি হওয়ার পর আবশ্যকভাবে দুই ঘন্টা সময় এ সমস্ত মাদরাসায় শিক্ষা লাভ করে। সেখানে তাদেরকে ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ শিক্ষা দেওয়া হয়। হাফেজ শিশুদের সংখ্যাও যথেষ্ট। বারবাডোজে কোন মুসলমান এমন নেই, যে শিশুকালে এ সমস্ত মাদরাসায় পাঠ গ্রহণ করেনি। এখান থেকেই তারা পাকাপোক্ত ইসলামী আকীদা ও আমল শিখে একজন মুসলমানরূপে স্বীয় জীবনের সূচনা করে। আমি নিজেও একটি মাদরাসায় গিয়েছি। সেখানে তখন প্রায় আশি-নব্বইজন শিক্ষাগ্রহণকারী শিশু ছিল। শিশুরা আমাকে মনোমুগ্ধকর কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করে শোনায়। আমার প্রশ্নের উত্তরে বিভিন্ন সময়ে পঠিতব্য সুন্নাতী দু'আও তারা পড়ে শোনায়। কুরআনের আয়াত ও হাদীসের ইংরেজী তরজমা শোনায়। এমনকি তারা উর্দূতেও কবিতা আবৃত্তি করে শোনায়। তাদের ইংরেজী ভঙ্গিতে উর্দু উচ্চারণে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল

যে, তাদের এ সমস্ত উর্দূ শব্দ মুখস্ত করতে কত বেগ পেতে হয়েছে। ওস্তাদগণ বললেন, আমরা তাদেরকে প্রাথমিক উর্দূ অবশ্যই পড়িয়ে থাকি, যেন উর্দূ সাহিত্যের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অটুট থাকে।

সেখানকার মুসলমানদের ফরমায়েশে আমার অবস্থানকালে কয়েকটি ধর্মীয় সভার আয়োজন করা হয়। যদিও ক্রিসমাস ডে নিকটবর্তী হওয়ার কারণে তাদের ব্যবসায়িক ব্যস্ততা ছিল খুবই বেশী, তবুও ধর্মীয় মজলিসসমূহে তাদের উপস্থিতি ছিল অনেক বেশী, তা দ্বারা এখানকার মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগ–অনুরাগ অনুমিত হয়। নারীদের জন্যও দু'টি মজলিসের ব্যবস্থা করা হয়। নারীরা পর্দার পূর্ণ এহতেমাম করে তাতে বিরাট সংখ্যায় অংশগ্রহণ করে।

বারবাডোজে আমি পাঁচদিন অবস্থান করি। প্রতিদিন এখানকার মুসলমানদের ধর্মীয় তৎপরতা সম্পর্কে অত্যন্ত আনন্দ বর্ধক তথ্যসমূহ অবগত হতে থাকি। এটি প্রত্যক্ষ করে বড় আনন্দিত হই যে, সুদূরবর্তী এ দ্বীপে—যা পশ্চিমা পর্যটনের সমস্ত ফেতনায় পরিবেষ্টিত এবং যেখানকার ব্যাপারে এ কথাটি রেকর্ড পর্যায়ের যে, এখানে বিবাহের খুব বেশী প্রচলন নেই। বরং নারী পুরুষ নিয়মতান্ত্রিক কোন বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে একসঙ্গে বসবাস করে। এভাবে প্রায় সত্তর শতাংশ অমুসলিম অধিবাসী বিবাহ ছাড়া জন্ম হয়েছে। এমন এক পরিবেশে মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা কত পোক্ত এবং তাদের আকীদা ও আমল কত দৃঢ়। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি যে, দারুল উলূম দেওবন্দের তালিম ও ফয়েজপ্রাপ্ত কতিপয় আলেম প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা জাগরুক করেন। এখনও দারুল উলূম দেওবন্দ, ঢাবেল ও পাকিস্তানের মাদরাসাসমূহ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত উলামায়ে কেরাম এখানে মুসলমানদের ধর্মীয় দিকনির্দেশনা দানের দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁদের একনিষ্ঠ খেদমতের বরকত সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যায়।

আমার মেজবানগণ খুব করে দ্বীপের ভ্রমণ করান। বারবাডোজের উপকূল খুবই সুন্দর। এখানকার সমুদ্রের পানি খুবই স্বচ্ছ। বালি কাদামুক্ত। এই সমুদ্রের পানিকে উপভোগ করার জন্য সমস্ত পাশ্চাত্য জগতের পর্যটকরা এখানে এসে থাকে। সমুদ্র উপকূলে জাঁকজমকপূর্ণ

হোটেলের ছড়াছড়ি। এখানকার কতক হোটেল বিশ্বের সর্বাধিক ব্যয়বহুল হোটেলের মধ্যে গণ্য হয়। এর মধ্যে কিছু হোটেলের দৈনিক ভাড়া হাজার ডলার পর্যন্ত রয়েছে। বারবাডোজে অবস্থানকালে ডুবোজাহাজে ভ্রমণ করার নতুন অভিজ্ঞতা লাভ হয়। এখানে পর্যটকদেরকে ডুবোজাহাজে করে প্রায় দেড় ঘন্টা সময় মনোমুগ্ধকর ভ্রমণ করানো হয়। আমার মেজবানগণ বললেন, সমগ্র বিশ্বে এ ব্যবস্থা মাত্র অল্প কয়েক জায়গায় রয়েছে। তাই অবশ্যই এ সুযোগকে কাজে লাগানো দরকার। সুতরাং একদিন আমরা স্মরণীয় এই অভিজ্ঞতাকেও উপভোগ করি। এটি একটি ছোট ডুবোজাহাজ। এতে একসঙ্গে আটাশজন লোক উপবেশন করতে পারে। জাহাজটি আমাদেরকে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ১৫০ ফুট গভীরে নিয়ে যায়। সেখানে সমুদ্রের অভ্যন্তরীণ জগত পরিদর্শন করায়। ডুবোজাহাজটি সমুদ্রের তলদেশে যেতেই সেখানকার বিরল–বিস্ময়কর জগত পরিদৃষ্ট হয়। পর্যাপ্ত মাছ ও সামুদ্রিক জীব ছাড়া এখানে পরিপূর্ণ বনও রয়েছে। যেখানে বিরল–বিস্ময়কর বৃক্ষ ও লতাপাতা হাতছানি দিয়ে ডাকে। সবুজ–শ্যামল পাহাড় রয়েছে, যার রূপ–সৌন্দর্যের বিবরণ দেওয়া কঠিন। পাহাড়–পৃষ্ঠের পাথর সম্পর্কে গাইড বলে যে, এগুলো জীবন্ত পাথর। নির্দিষ্ট এক সময়কালের মধ্যে তার আকার বেড়ে যায়। তারপর ডুবোজাহাজের কাপ্তান আমাদেরকে এমন এক এলাকায় নিয়ে যায়, যেখানে সমুদ্রতলে সুদূর বিস্তৃত বৃক্ষলতাশূন্য পাথুরে মরুভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। পঁচিশ বছর পূর্বে ডুবে যাওয়া একটি জলজাহাজ পরিদর্শন করায়। জাহাজটি সমুদ্রের তলদেশে বসে আছে। তার কেবিনসমূহে মাছ ও অন্যান্য জীব নীড় রচনা করেছে। তার পাটাতনে সমুদ্র–চারা উৎপন্ন হয়েছে। মোটকথা, সমুদ্র গর্ভের প্রায় দেড় ঘন্টার এই সফর অত্যন্ত ব্যতিক্রমী, স্মরণীয় ও মনোমুগ্ধকর ছিল। সমুদ্রের নীচে জীবজন্তু, জড়বস্তু ও উদ্ভিদের যে জগত আবাদ রয়েছে, তা দেখে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে—

تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

‘অতি মহান অনুপম স্রষ্টা আল্লাহ।’

বারবাডোজের আরেকটি স্মৃতি এখানকার একটি গুহা, যাকে হ্যারিসন গুহা (Harison Cave) বলা হয়। উঁচু এক পাহাড়ের গোড়া থেকে বের হয়ে ১ মাইল দীর্ঘ এ গুহা সৃষ্টি হয়েছে। ক্রমশঃ ভূগর্ভে চলে গেছে গুহাটি। তার শেষপ্রান্ত গুহার মুখ থেকে ১৮০ ফুট নীচে। গুহাটির বৈশিষ্ট্য এই যে, তার ছাদ ও প্রাচীর থেকে অনবরত ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়তে থাকে। পানির ফোঁটা পড়ার কারণে এখানে অসংখ্য শ্বেত শিলা (Stalactites) ছাদে ঝুলতে দেখা যায়। নীচের দেয়ালে ওগুলোর মতই বহুসংখ্যক Stalagmites–ও রয়েছে। এ সমস্ত শ্বেত শিলা সময়ের গতির সাথে সাথে বেড়ে চলে। বলা হয় যে, দশ বছর পর তা এক সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পায়। পর্যটকদের সুবিধার্থে গুহার মুখ থেকে ছোট একটি ট্রেন চালু করা হয়েছে। মানুষ এই ট্রেনে বসে গুহার প্রাকৃতিক বিস্ময় দর্শন করে। ট্রেনটি এক মাইল পর্যন্ত ভিতরে যায় এবং পদে পদে ভূতলের বিরল–বিস্ময়কর নিত্য নতুন সৃষ্টি পরিদর্শন করায়।

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

‘তাই অতি মহান অনুপম স্রষ্টা আল্লাহ।’

ইস্তাম্বুল নগরীতে

Contents

ইস্তাম্বুল নগরীতে

ইস্তাম্বুল ওসমানী খেলাফতের রাজধানীরূপে প্রায় পাঁচ শতাব্দী পর্যন্ত সমগ্র আলমে ইসলামের উপর শাসন চালায়। সে ইউরোপের দিক থেকে ধেয়ে আসা বহু তুফানের অবিচলভাবে মোকাবিলা করে। জ্ঞান-গবেষণার ময়দানেও বহু অবিস্মরণীয় কীর্তি সম্পাদন করে। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসংখ্য নামকরা পণ্ডিতবর্গ ছাড়াও নির্মাণ শিল্পে 'জিনানের' ন্যায় দক্ষ প্রকৌশলীগণ এখানেই তাদের শিল্প-নৈপুণ্য ফুটিয়ে তোলেন। তার ৩৬০টি স্মৃতি আজও তুরস্কে বিদ্যমান রয়েছে। প্রেস আবিষ্কারক 'ইবরাহীম মুতাফাররিকা' এখানেই জন্মগ্রহণ করেন। যার বদৌলতে পৃথিবী প্রথমবার ছাপার হরফের কিতাবের সঙ্গে পরিচিত হয়। (আমি পৃথিবীর সর্বপ্রথম প্রেস থেকে ছাপানো কিতাবসমূহ মন্টারিয়ালের মেকাগাল ইউনিভার্সিটির গ্রন্থাগারে দেখেছি।) ইস্তাম্বুলেরই অধিবাসী 'খাদ্দাফিন আহমাদ' আকাশে ওড়ার সর্বপ্রথম সফল অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। (এটি সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুর দিকের ঘটনা।) তার নির্মিত চামড়ার পাখা আজও ইস্তাম্বুলের প্রসিদ্ধ 'গালাতা বুর্জে' ঝুলানো রয়েছে। যার মাধ্যমে তিনি ইতিহাসে প্রথমবার আট মাইল পর্যন্ত উড়েছিলেন। মোটকথা, ওসমানী খেলাফত বহুদিন পর্যন্ত রাজনৈতিক প্রতাপ-প্রতিপত্তি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। কিন্তু সময়ের গতির সাথে সাথে তার মধ্যে বহুবিধ দুর্বলতা প্রবেশ করতে আরম্ভ করে। এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে যখন সে আধামরা অবস্থায় উপনীত হয়, তখন তাকে সেই পাশ্চাত্য সভ্যতার মুখোমুখি হতে হয়, যা নব উদ্যমে ছিল পরিপূর্ণ। তার সঙ্গে শিল্প ও দর্শনের যে শক্তি ছিল, তাকে উত্তরণ করার জন্য চরম আস্থাশীলতা, পরম ভারসাম্যপূর্ণ চেতনা এবং মন-মানস ও আমলের শক্তি-সাহস প্রয়োজন ছিল। যা সে সময় উসমানী খেলাফতের হাতে ছিল না, যার পরিণতিতে তুরস্কের

নেতৃত্ব অতিরঞ্জন ও অতি শৈথিল্যের দুই প্রান্তে ঢলে পড়ে।

তবে এই আখেরী জামানাতেও খেলাফতে ওসমানীয়া নিজের সহস্র দুর্বলতা সত্ত্বেও আলমে ইসলামের কেন্দ্রের ভূমিকা পালন করে আসছিল। সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদেরকে কোন রকমে হলেও সে এক সুতোয় গেঁথে রেখেছিল। এখানকার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় যে সমস্ত ত্রুটি দেখা দিয়েছিল, প্রয়োজন ছিল সেগুলো সংশোধন করে এর কেন্দ্রীকতাকে টিকিয়ে রাখা। নতুন পরিস্থিতিকে সামলানোর জন্য একে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা মারাত্মকভাবে শংকাগ্রস্ত লোকেরা এ সমস্ত ত্রুটিকে দূর না করে বরং ওসমানী খেলাফতকেই বিলুপ্ত করা জরুরী মনে করে। অবশেষে কামাল আতাতুর্ক খেলাফত বিলুপ্ত করে দেশটিকে এক ধর্মহীন রাষ্ট্রে পরিণত করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ইকবাল মরহুম মন্তব্য করেন—

چاک کردی ترکِ ناداں نے خلافت کی قبا
سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ

'নির্বোধ তুর্কীরা খেলাফতের পরিধেয় ছিন্ন করে ফেলল।
নিজেদের সরলতাও প্রত্যক্ষ কর, শত্রুদের চতুরতাও লক্ষ্য কর।'

কামাল আতাতুর্কের বিপ্লবের পর দেশ থেকে ইসলামের আইন ও শরীয়তকে উৎখাত করে সুইজারল্যাণ্ডের দেওয়ানী, ইটালীর ফৌজদারী এবং জার্মানীর বাণিজ্য-বিধি চালু করা হয়। ধর্মীয় শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়। পর্দাকে আইন বিরোধী আখ্যা দেওয়া হয়। শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে নারী পুরুষের সম্মিলিত শিক্ষা ধারা চালু করা হয়। আরবী বর্ণমালার স্থলে তুর্কী ভাষার জন্য ল্যাটিন বর্ণলিপি আবশ্যকীয় করা হয়। আরবী ভাষায় আযান দেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। জাতির পোশাক পরিবর্তন করা হয়। হ্যাট ব্যবহারে বাধ্য করা হয়। (এজন্য এক রক্তাক্ত লড়াই সংঘটিত করা হয়, তাতে তুর্কীদের মাথায় হ্যাট বসানোর জন্য কতজনের মাথা যে নামিয়ে ফেলা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।)

কামাল আতাতুর্ক এ সমস্ত পরিবর্তন এ চিন্তায় করেছিল যে, তুরস্ক তার অতীতের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক ছিন্ন করে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে

সম্পর্ক গড়বে। তার ধারণা ছিল যে, এভাবে তুরস্ক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ধাপসমূহ দ্রুত অতিক্রম করতে পারবে। আতাতুর্কের ঘটানো বিপ্লব আজ সত্তর বছরাধিককাল হয়ে চলল, সেখানে (সংক্ষিপ্ত কিছু বিরতি ছাড়া) আতাতুর্কী মানসিকতাই শাসন চালিয়ে আসছে। সে মানসিকতা পাশ্চাত্য সভ্যতার সমস্ত প্রভাব প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিক্ষা ও প্রচার মাধ্যম থেকে আরম্ভ করে জোরজবরদস্তির সমস্ত পন্থাই পূর্ণ আবেগ ও উন্মত্ততার সঙ্গে প্রয়োগ করেছে। কিন্তু তুরস্কের সমাজের উপর এই বিপ্লবের প্রভাব কি হয়েছে তা অধ্যয়ন করা হলে স্পষ্টতই এর স্বরূপ পরিদৃষ্ট হয় যে, বড় বড় শহরসমূহে এ বিপ্লব নগ্নতা ও অশ্লীলতাকে ইউরোপের পর্যায়ে আনতে এবং মানুষের পোশাক ও বর্ণলিপি পরিবর্তন করতে তো নিঃসন্দেহে সফল হয়েছে। কিন্তু দেশের প্রকৃত সমস্যাগুলোতে আতাতুর্কী মন–মানসের এ দীর্ঘ শাসন তাকে উল্লেখযোগ্য কোন কল্যাণ পৌঁছাতে পারেনি।

তুরস্কের বহু সংখ্যক মুসলমান পূর্বেও কামাল আতাতুর্কের সেই পদ্ধতির সঙ্গে একমত ছিলেন না, যা সে ইসলামের ব্যাপারে গ্রহণ করেছিল। (কামাল আতাতুর্কের ডিক্টেটরশীপের অবসানের পর ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে প্রথম যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে কামাল আতাতুর্ক ও ইসমত আননূর রিপাবলিকান পার্টি পরাজিত হয়)। কিন্তু এই বিপ্লবের সত্তর বছরের ফলাফল প্রত্যক্ষ করার পর এখন সেখানে ইসলামকে পুনর্বহালের আন্দোলন বিশেষভাবে শক্তিশালী হচ্ছে। সেখানকার রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে রেফাহপার্টি এ উদ্দেশ্যে সর্বাধিক তৎপর। বহুবিধ তিক্ত অভিজ্ঞতার পর তুরস্কের বেশীর ভাগ ধর্মীয় গোষ্ঠী গত বছরের পৌর নির্বাচনে রেফাহপার্টির সমর্থনে একমত হয়েছিল। সুতরাং পৌর নির্বাচনে রেফাহ পার্টি বিপুলভাবে জয়লাভ করে। ইস্তাম্বুল সহ বেশ কয়েকটি বড় শহরের পৌরব্যবস্থা তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। বর্তমানে ইস্তাম্বুলের মেয়রও এ পার্টিরই। গত বছর আমি তুরস্কে গিয়েছিলাম। তার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে নির্বাচন হয়েছিল। তখন এই সরকার পরিবর্তনের প্রভাব দেখার সুযোগ হয়েছিল না। এবার যখন তুরস্কে যাই, তখন নতুন পৌর ব্যবস্থাপকদের কর্মকাল এক বছর

অতিক্রান্ত হয়েছে বিধায় তার কিছু প্রভাব দেখার সুযোগ লাভ হয়। যদিও তিনদিনের সামান্য সময়ে খুব গভীরভাবে ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা কঠিন ছিল, এ সময় কতিপয় আবেগপ্রবণ মানুষের নিকট এমন কথাও শুনতে পাই, যা অতিশয়োক্তি মনে হচ্ছিল। তবে যেসব বিষয় সাধারণ ও বিশেষ, নির্বিশেষে সবার মুখেই ছিল এবং যা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি তা সংক্ষেপে এই—

অনেকেই বলেন যে, পৌর প্রতিষ্ঠানে ঘুষের লেনদেন হ্রাস পেয়েছে। জনসাধারণের সমস্যার সমাধান পূর্বের তুলনায় সহজ হয়েছে। পানি স্বল্পতা ছিল ইস্তাম্বুলে বিরাট এক সমস্যা, যা এক কোটি অধিবাসীর এই শহরে জনসাধারণের জন্য বড় জটিলতা সৃষ্টি করত, কিন্তু এ বছর এ সমস্যা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রেফাহ পার্টির মেয়র ক্ষমতা হাতে নেওয়ার কিছুদিন পরেই সর্বপ্রথম 'এস্তেস্কা নামাযের' (বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য যে নামায পড়া হয়।) ব্যবস্থা করেন। যা ছিল সম্ভবতঃ দীর্ঘ সময় পর ইস্তাম্বুলের প্রথম এস্তেস্কা নামায। (কতিপয় ধর্মহীন গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এজন্য উপহাসও করা হয়) আল্লাহ পাকের অপার অনুগ্রহে তখন মধুময় বৃষ্টিপাত হয়। পৌরসভার পক্ষ থেকে পানি বন্টনের এমন সুব্যবস্থা করা হয়েছে যে, ইস্তাম্বুলের সমস্ত এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পাওয়া যায়। শহরে সড়ক নির্মাণ ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার মানও তাদের ভাষ্যমতে অনেক উন্নতি করেছে। নতুন পৌরশাসকের পক্ষ থেকে এমন অনেক নিয়মিত রেস্তোরাঁ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে দরিদ্র লোকেরা বিনামূল্যে খাবার খেতে পারে। এই সুযোগের অপব্যবহার যেন না হয়, সেজন্যও সুব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সময় তিনদিন করে সমগ্র শহরে যাতায়াত ব্যবস্থা ফ্রি করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ ঐ তিনদিন যে কোন ব্যক্তির শহরের যে কোন জায়গা যেতে গাড়ীর ভাড়া দেওয়া লাগেনি।

জনসাধারণের জন্য এ জাতীয় সুবিধাজনক পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়াও পৌরসভার তত্ত্বাবধানে জনসাধারণের জন্য মদই শুধু নয়, বরং সমস্ত বহির্দেশীয় পানীয় ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। পৌরসভার ভাষ্য হল, তুর্কীদের নিকট তাদের নিজেদেরই এত পানীয়

রয়েছে যে, তাদের বহির্দেশের পানীয়ের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া সেগুলো স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং তার জন্য মুদ্রাও ব্যয় হয়।

আতাতুর্কী মন-মানস ইসলামী অতীত থেকে তুরস্কের সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছিল। সুতরাং ইসলামী ইতিহাসের কোন ঘটনাকে সরকারী পর্যায়ে গুরুত্ব দেওয়ার কথা সেখানে অকল্পনীয় ছিল। কিন্তু রেফাহ পার্টির পৌর প্রতিনিধিরা তাদের সামর্থ্য অনুপাতে ইসলামী ইতিহাসের অনেক স্মৃতিকে উজ্জীবিত করে। সম্প্রতি ১৭ই মে তারিখে তারা ইস্তাম্বুলে প্রথমবার সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহের ইস্তাম্বুল বিজয়ের স্মৃতি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর আঙ্গিকে উদযাপন করে। তারা বসফরাস প্রণালীর পশ্চিম কূলের দোলাম্মা বাচা নামক স্থান থেকে সত্তরটি জাহাজের একটি মিছিল বের করে সেগুলোকে মুহাম্মাদ ফাতেহের জাহাজসমূহের ন্যায় স্থল পথে চালিয়ে নিয়ে যায়। এ সমস্ত জাহাজের চালকগণ উসমানী সেনাদের উর্দি পরিহিত ছিল। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এমন এক ব্যক্তি, যার রূপ-চেহারা মুহাম্মাদ ফাতেহের রূপ-চেহারার অনুরূপ ছিল। তিনি উসমানী খলীফাদের ন্যায় পরিধেয় পরিহিত ছিলেন। জাহাজের এই মিছিল দোলাম্মা বাচা থেকে আরম্ভ হয় এবং মধ্য শহরের ব্যস্ততম এলাকা তাকসীম ইত্যাদি হয়ে কাসিমপাশার সেই স্থানে গিয়ে শেষ হয়, যেখান থেকে সুলতান মুহাম্মাদ ফাতেহ তার জাহাজসমূহকে গোল্ডেন হর্নের পানিতে প্রবেশ করিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে জনসাধারণ বড় উষ্ণভাবে এ মিছিলকে স্বাগত জানায়। এতে করে মানুষের মধ্যে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়।

ইসলামের পুনর্জাগরণের আন্দোলনে দেশের সব মতাদর্শের লোক বিশেষ করে তরুণরা অত্যন্ত উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করছে। সুতরাং তরুণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ইসলামী প্রতীকসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ সুস্পষ্টভাবে উন্নতি করছে। যেখানে আতাতুর্ক (নাউযুবিল্লাহ) পবিত্র কুরআনের কপি শাইখুল ইসলামের মাথায় ছুড়ে মেরেছিল, সেখানে পবিত্র কুরআন শিক্ষার শত শত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে আরবীতে আযান নিষিদ্ধ ছিল, সেখানে সমগ্র শহর আযান ধ্বনিতে শুধু মুখরিতই হচ্ছে না, বরং মসজিদসমূহ নামাযীদের দ্বারা পরিপূর্ণ হচ্ছে।

যেখানে নারীদের জন্য পর্দাকে অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়েছিল, সেখানে তরুণী ছাত্রীরা পর্দার প্রতি যত্ন নিচ্ছে। তুরস্কের সীওয়াচ শহরের একটি মেডিকেল ইউনিভার্সিটিতে এ বছর যে ছাত্রী প্রথম স্থান অধিকার করেছেন, তিনি পর্দার অনুবর্তী। আমি তুরস্কে যাওয়ার কয়েকদিন পূর্বে সেই ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেট বিতরণ সভা (Convocation) অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিভার্সিটির ঐতিহ্য মতে প্রথম স্থান অধিকারিণী ছাত্রীর উপস্থিত সমাবেশে বক্তব্য দান করার কথা, কিন্তু ইউনিভার্সিটি প্রধান এই ছাত্রীকে পর্দা মেনে চলার কারণে Convocation–এ নিমন্ত্রণ করেনি। এতদসত্ত্বেও ঐ মেয়ে পর্দাবস্থায় স্বেচ্ছায় ষ্টেজে চলে আসেন। তিনি দাবী জানান যে, এখানকার ঐতিহ্যমত আমাকে ভাষণ দানের সুযোগ দেওয়া হোক। তখন ইউনিভার্সিটি–প্রধান ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর মাথা থেকে সেই বিশেষ মস্তকাবরণ নামিয়ে ফেলে, যা ঐ স্থলে পরা হয়। ঘটনাচক্রে এ দৃশ্য টিভিতে দেখানো হচ্ছিল। এ ঘটনা দেখে সমগ্র তুরস্কে আগুন লেগে যায়। সারাদেশ থেকে ইউনিভার্সিটির এই প্রধানকে বরখাস্ত করার দাবী উঠতে থাকে। সুতরাং এই ঘটনার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সে বরখাস্ত হয়। এর মতই আরেকটি ঘটনা আজমীরেও ঘটে।

আমার এক তুর্কী বন্ধু খায়রী দিমার্জী একদিন বিকেলে আমাকে একটি বিনোদন কেন্দ্রে নিয়ে যায়। এটি একটি পাহাড়, যা বসফরাসের এশীয় উপকূলে অবস্থিত। ঐ পাহাড়ে ইসলামাবাদের 'দামানে কোহের' বিনোদন কেন্দ্রের মত কিছু বিনোদন কেন্দ্র তৈরী করা হয়েছে। এখানে পশ্চিমে বসফরাস প্রণালী, তার পশ্চাতে বিস্তীর্ণ ইউরোপীয়ান ইস্তাম্বুল, পূর্বে এশিয়ান ইস্তাম্বুল এবং দক্ষিণে মরমরা উপসাগরের দৃশ্য এতই অপরূপ যে, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। মাগরিবের নামাযের সময় হলে জানতে পারি যে, অতি সম্প্রতি এখানে একটা নামাযের জায়গা বানানো হয়েছে। সেখানে গিয়ে দেখি জামাআত হচ্ছে। ভিতরে স্থান সংকুলান না হওয়ায় দলে দলে লোক অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষমানদের মধ্যে সব বয়সের নারীদেরও বিরাট একটি সংখ্যা ছিল। যাদের মধ্যে বেশীর ভাগ পর্দা সম্মত বা কমপক্ষে দেহাবরণ পরিমাণ পোশাক পরিহিত ছিল। নামাযের স্থানে অনেকক্ষণ পর্যন্ত একের পর এক

প্রথমে পুরুষদের, তারপর নারীদের নামায পড়ার ধারা চলতে থাকে।

তুরস্কের কোন নগর–বিনোদন কেন্দ্রে নামায আদায়কারীদের এত বেশী সংখ্যার কথা পূর্বে সাধারণতঃ কল্পনাও করা সম্ভব ছিল না। নামাযের জায়গার বাইরেও আশি শতাংশ লোক এমন দেখা যায়, যাদের ভাবভঙ্গিতে ইসলামী নিদর্শনের দীপ্তি বিদ্যমান। আমার বন্ধু বললেন, পূর্বে এ বিনোদন কেন্দ্রটিকে উচ্ছৃঙ্খলতা ও মদপানের আড্ডাখানা মনে করা হত। আমলধারী কোন মুসলমান এখানে এসে পড়লে তাকে কটাক্ষবানে বিদ্ধ করা হত। কিন্তু সেদিন এই সুদৃশ্য বিনোদন কেন্দ্রের উপর পুত–পবিত্রতার এক নির্মল পরিবেশ আচ্ছন্ন দেখতে পাই। এখানকার রেস্তোরাঁগুলো দেখে সত্যিই সত্যায়িত হল যে, এখানে মদ তো দূরের কথা পেপসি–কোলারও স্থান নেই। সম্পূর্ণ দেশীয় পানীয় ব্যবহৃত হচ্ছিল। লোকদের মুখমণ্ডলে শান্তি ও তৃপ্তি ভাস্বর ছিল।

আগামী বছর তুরস্কে সাধারণ নির্বাচন হবে। ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠার সমর্থক জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে আশা করা যায় যে, বাতাসের গতি এমনটি থাকলে ইনশাআল্লাহ তারা সেই নির্বাচনে বিশেষ সফলতা লাভ করবে। ইস্তাম্বুলে শুভ ভবিষ্যতের এই পরিবর্তন দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার রসনায় এ কবিতাটি আবৃত হয়—

اللہ خبر بجلی کو نہ، گلچیں کی نگاہ بد نہ پڑے
جس شاخ پہ تنکے رکھے ہیں وہ پھولتی پھلتی جاتی ہے

অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! বিদ্যুত যেন খবর না পায় এবং ফুল কুড়ানীর যেন অশুভ দৃষ্টি না পড়ে। যে ডালে এ নীড় রচিত, তা প্রবৃদ্ধি লাভ করছে।'

ভূ-পরিভ্রমণ

আমার মনে আছে, শিশুকালে যখন আমাদেরকে বুঝানো হত যে, পৃথিবী গোল, ফলে তুমি যে কোন একদিকে একাধারে চব্বিশ হাজার আটশ' মাইল চলতে থাকলে পুনরায় সেখানেই এসে পৌঁছাবে, যেখান থেকে চলতে আরম্ভ করেছিলে। শিশুকালে ব্যাপারটি বড়ই বিস্ময়কর মনে হতো। আরো মনে হতো যে, এর সত্যতা পরীক্ষা করে দেখা প্রায় অসম্ভব। আমাদের জন্য চব্বিশ হাজার আটশ' মাইল পরিভ্রমণ কী করে সম্ভব? তখন এ কথা কল্পনায়ও ছিল না যে, বড় হয়ে আমারও এ অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ হবে। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে আমার সে সুযোগই এসে গেল। পরিস্থিতি এমন সৃষ্টি হলো যে, আমাকে তেরদিন পৃথিবীর চতুর্দিকে এমনভাবে ভ্রমণ করতে হয় যে, প্রায় একদিকেই অর্থাৎ পশ্চিম দিকে অবিরাম সফর করতে করতে পুনরায় সেখানেই পৌঁছে যাই, যেখান থেকে চলতে আরম্ভ করেছিলাম। করাচী থেকে পহেলা জুন পশ্চিম দিকে সফর আরম্ভ করি। ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে কানাডার সর্ববৃহৎ শহর টরেন্টো পৌঁছি। সেখান থেকে পুনরায় পশ্চিমে সফর করে মেনাপোল্স হয়ে সানফ্রান্সিসকো, অতঃপর সেখান থেকে লসএঞ্জেলস পৌঁছি। সেখান থেকে পুনরায় পশ্চিমে সফর করে জাপানের রাজধানী টোকিও এবং সেখান থেকে ১২ই জুন রাতে করাচী এসে পৌঁছি। এভাবে পৃথিবী নামক গ্রহের চতুর্দিকে সত্যিই একটি পূর্ণ পরিভ্রমণ হয়।

ভৌগলিক দিক থেকে তো সফরটি মনোমুগ্ধকর ও ব্যতিক্রমধর্মী ছিলই উপরন্তু এ সফরে যে সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে এবং যে সমস্ত নতুন নতুন তথ্য অবগত হয়েছি, তাতে পাঠকদেরকেও অংশীদার করতে মন চাচ্ছে। তাই সংক্ষিপ্ত এ সফরনামা পাঠক সমীপে তুলে ধরছি।

টরেন্টোতে (কানাডা) বসবাসকারী আমার কিছু বন্ধু সেখানে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উপর দু'দিনব্যাপী একটি সেমিনারের ব্যবস্থা করেন।

সেমিনারের ব্যবস্থাপকদের মধ্যে কানাডিয়ান মুসলমানদের প্রাণপ্রিয় ব্যক্তিত্ব জনাব সাঈদ আয্ যাফর সাহেব, জনাব আবদুল হাই পেটেল এবং আমাদের শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান নওমুসলিম বন্ধু জনাব থমাস ষ্টিভেন--যার ইসলামী নাম আবদুল কাদির থমাস--বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরাই আমাকে সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য দাওয়াত করেন। এদিকে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের কতিপয় বন্ধু কিছুদিন তাঁদের সঙ্গে থাকার জন্য আমাকে বহুদিন ধরে পীড়াপীড়ি করছিলেন। ইতিপূর্বে যতবার আমেরিকা যাওয়া হয়েছে, সময় স্বল্পতার কারণে তাঁদের সে অনুরোধ আমি রক্ষা করতে পারিনি। গতবছর আমেরিকা থেকে ফেরার সময় ওয়াদা করেছিলাম যে, ইনশাআল্লাহ, আগামীতে যখনই উত্তর আমেরিকার সফর হবে তখন তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করবো। তাই আমি টরেন্টো থেকে ক্যালিফোর্নিয়ারও প্রোগ্রাম করি। যখন ক্যালিফোর্নিয়া অর্থাৎ পশ্চিমে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পৌছার সিদ্ধান্ত হল, তখন বেশ কিছু কারণে আটলান্টিকের পরিবর্তে প্রশান্ত মহাসাগর হয়ে ফিরে আসা আমার জন্য যথার্থ মনে হচ্ছিল। ফলে মধ্যখানে টোকিও–ও একটি মঞ্জিল হয়। যেখানে ইতিপূর্বে আমার কখনো যাওয়া হয়নি।

পহেলা জুনের সকাল আটটায় লিফট হানসার বিমানযোগে যাত্রা করি। কিছুক্ষণের জন্য দুবাইয়ে যাত্রাবিরতি হয়। তারপর অবিরাম সাত ঘন্টা ওড়ার পর জার্মানির ফ্রাংকফুর্ট শহরে পৌছি। এখানে অন্য একটি বিমানের অপেক্ষায় প্রায় তিন ঘন্টা অবস্থান করতে হয়। আসরের নামায পড়ে সেখান থেকে লিফট হানসারই অন্য একটি বিমানে বিকাল পাঁচটায় টরেন্টোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। এই আট ঘন্টার আকাশ পথের ভ্রমণ আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে হয়। বিমান সূর্যের সাথে সাথে পশ্চিম অভিমুখে ভ্রমণরত থাকে বিধায় পুরো আট ঘন্টা সময় আসরের সময় অব্যাহত থাকে। যখন টরেন্টোর স্থানীয় সময় বিকাল সাতটায় বিমানবন্দরে অবতরণ করি, তখনও মাগরিব নামাযের সময় হতে প্রায় দু' ঘন্টা বাকী। কারণ, সেখানে সন্ধ্যা ন'টায় মাগরিব হয়। বিমানবন্দরে বন্ধুদের বড় একটি দল স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন।

বিমানবন্দরের অদূরেই হোটেল রিগ্যাল কন্সটিলেশনে অবস্থান করি। হোটেলে পৌঁছতে পৌঁছতে আটটা বেজে যায়। পাকিস্তান থেকে রওয়ানা করার পর ২১ ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়েছে (এখন করাচীতে সকাল ৫টা বাজছে) এ সময় বিছানার চেয়ে অধিক সুস্বাদু আর কিছু ছিল না। কিন্তু মাগরিব নামাযের সময় হতে এক ঘন্টা এবং এশার নামাযের সময় হতে আড়াইঘন্টা বাকী ছিল। তাই শোয়ার সুযোগ ছিল না। এ সময়ে হোটেলে বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাত চলতে থাকে। বন্ধুরা নিমন্ত্রিতদের জামাআতে নামায আদায়ের জন্য হোটেলেরই একটি হলকক্ষে জায়গা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। রাত সাড়ে দশটায় সেখানে জামাআতের সাথে এশার নামায আদায় করি। এরপর শোয়ার সুযোগ হয়।

টরেন্টো কনফারেন্স

পরের দিনই অর্থাৎ ২রা জুন সকাল সাড়ে আটটা থেকে সেমিনার আরম্ভ হয়। সেমিনারের বিশেষ দিক ছিল এই যে, এতে উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু সংখ্যক মুসলমান যে শ্রোতারূপে অংশগ্রহণ করছিলেন শুধু তাই নয় বরং বহু অমুসলিম এবং কানাডা সরকারের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ব্যক্তিও তাতে অংশগ্রহণ করছিলেন। যেমন, কানাডার পার্লামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ মেম্বার মি. ডেরিক লী (Derek Lee, যিনি পার্লামেন্টে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কমিটির চেয়ারম্যানও (এ পদটি সেখানকার সরকারী ব্যবস্থাপনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক পদ), সাথে সাথে অন্টারিও প্রদেশের অর্থ মন্ত্রণালয়ের পার্লামেন্টারী মিসেস ইসাবেল ব্যাসেট (Isable Basset), ব্যাংক ও অর্থ অধিদপ্তরের সাবেক কোষাধ্যক্ষ মি. ডন ব্ল্যাংক্যারণ (Donblankeron)ও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সেমিনারে তাঁদেরকে নিমন্ত্রণ করার পিছনে ব্যবস্থাপকদের উদ্দেশ্য ছিল, কানাডা সরকার অবগত হোক যে, ইসলামী অর্থ–প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা মুসলমানদের জন্য কেন জরুরী এবং সরকারের এ ব্যাপারে তাদেরকে সহযোগিতা করা কেন প্রয়োজন?

সেমিনারের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি রাখা হয়েছিল মিঃ ডন ব্ল্যাংক্যারণকে। আমি তাঁর সঙ্গে পূর্বেও টরেন্টোতেই মিলিত হয়েছিলাম,

দু' বছর পূর্বে জনাব সাঈদ আয্‌ যাফর সাহেব একটি নাস্তার টেবিলে আমাদেরকে একত্রিত করে তাদের দেশে ইসলামী অর্থ–প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার কথা উঠিয়েছিলেন। সেমিনারের শুরুতে তিনি সংক্ষেপে আমার পরিচয় দানের পর প্রথম বক্তা হিসাবে আমাকে বক্তব্য দানের আহ্বান জানান। উপস্থিত সুধীজনদের মধ্যে স্থানীয় অমুসলিম অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যাও যথেষ্ট পরিমাণ ছিল, বিধায় এ ভাষণে আমি আমার আলোচ্য বিষয় রাখি—ইসলাম ও ইসলামী শরীয়ত মূলত কি? মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক (Socio-Economic) সমস্যার সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক কি? বিষয়টি পরিষ্কার করে বর্ণনা করার প্রয়োজন এজন্য দেখা দেয় যে, বর্তমান যুগে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে অত্যাধুনিক মতাদর্শরূপে এমনভাবে গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে যে, মানুষের সামগ্রিক সমস্যার সঙ্গে দ্বীন–ধর্মের কোন সম্পর্কই অবশিষ্ট রাখা হয়নি। ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। বিশেষতঃ অর্থনৈতিক ও নাগরিক সমস্যা থেকে সম্পূর্ণরূপে বহিস্কার করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যে সমস্ত লোক এ মতাদর্শের বিশ্বাসের উপর বড় হয়েছে, সাধারণতঃ তাদের এ কথা বুঝে আসে না যে, ব্যবসা ও অর্থনীতির সাথে ধর্মের কী সম্পর্ক? তাই আমি এ বিষয়টি পরিষ্কার করতে প্রয়াস পাই যে, ইসলাম নিছক ইবাদত ও আকীদার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা জীবনের প্রত্যেক শাখায় এমন দিক নির্দেশনা দান করে, যেখানে বুদ্ধির হোচট খাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আমি বুদ্ধির সীমারেখা (Limitation) এবং আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর প্রয়োজন ও গুরুত্বের উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সারাংশ তুলে ধরি। সাথে সাথে একথা তুলে ধরার চেষ্টা করি যে, সোশ্যালিজম বা কমিউনিজমের পরাজয়ের অর্থ এই নয় যে, বর্তমানের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে এমন একটি চূড়ান্ত সত্য (Absolute truth) রূপে মেনে নিতে হবে। যেমন পাশ্চাত্যের কতিপয় গোষ্ঠী বিশ্ববাসীকে বিশ্বাস করাতে চাচ্ছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার উপর মানব ইতিহাস তার সর্বোচ্চ মার্গে উপনীত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমি আমেরিকান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন

অফিসারের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ The End of the History and the I as Man এর উদ্ধৃতি দেই। তার মধ্যে অনেকটা এ কথাই প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি নিবেদন করি যে, সোশ্যালিজম বা কমিউনিজম পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থারই কিছু মারাত্মক অবিচারের প্রতিক্রিয়া ছিল।

আজ তার নিজের আভ্যন্তরীণ ত্রুটিসমূহের (Intrinsic faults) কারণে ভরাডুবি হয়ে থাকলে, তাতে একথা বোঝা আত্মপ্রবঞ্চনার শামিল হবে যে, পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার খারাপ দিকসমূহ বিদূরিত হয়েছে ; যতক্ষণ না সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে অবিচার ও অসামঞ্জস্যের বিলুপ্তি ঘটবে। আজকে এক কমিউনিজম পরাজিত হয়ে থাকলে কালকে অন্য ফিতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। ফলে মানবতা এই ডামাডোলের ঘূর্ণিপাকে নিপতিত থাকবে। আমরা মনে করি যে, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বর্তমান বিশ্বের সম্মুখে একটি তৃতীয় পথ (Third Option) তুলে ধরে। যা অতিরঞ্জন ও অতি শৈথিল্য থেকে মুক্ত। তবে শর্ত হলো, গুরুত্ব সহকারে তাকে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। বর্তমান যুগে তা বাস্তবায়নের উপযুক্ত মেশিনারী তৈরী করতে হবে। আজ এ শিক্ষাকে যথাযথভাবে অনুধাবন করা মুসলমানদেরই শুধু নয়, বরং সমগ্র মানবতার বিশেষ করে পাশ্চাত্যের সর্বাধিক প্রয়োজন। কিন্তু আফসোস, পাশ্চাত্য—যে কিনা এই শিক্ষার সর্বাধিক মুখাপেক্ষী—একে যথাযথভাবে বোঝার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে না। বরং যখনই এবং যারাই এ কথা বলে, তখনই এবং তাদেরই বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা আরম্ভ করা হয় যে, এরা ঘড়ির কাঁটাকে পিছনে নিয়ে যেতে চায়। এই ভূমিকার পর আমি ইসলামের মৌলিক অর্থনৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেই। আমি একথা স্পষ্ট করার চেষ্টা করি যে, সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যকে বিলুপ্ত করা বা হ্রাস করার ক্ষেত্রে বর্তমান যুগে ইসলামী অর্থনীতি দ্বারা কিভাবে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

ভাষণ শেষে প্রশ্নোত্তরের ধারাও চলে। তাতে মুসলিম ও অমুসলিম উভয় শ্রেণী সোৎসাহে অংশগ্রহণ করে। এতে করে আলোচ্য বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে যায়।

জনাব পারভেজ নাসিম সাহেব টরেন্টোতে এমন একটি সংস্থার

প্রধান, যা মুসলমানদেরকে বাড়ী বানানোর জন্য ইসলামী পন্থায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পুঁজির যোগান দিয়ে থাকে। (এ প্রতিষ্ঠানের কর্মপন্থাকে শরীয়তের মূলনীতির উপর সাজানোর কাজে আমারও কিছুটা অংশ রয়েছে)। তিনি তাঁর সংস্থার কর্মপন্থাকে সবিস্তারে বর্ণনা করেন এবং তা কি পরিমাণ সফল হয়েছে তাও তুলে ধরেন।

আমেরিকার নিউজার্সি রাজ্যে আমাদের এক আমেরিকান বংশোদ্ভূত নওমুসলিম বন্ধু রয়েছেন। তার নাম জনাব ওমর ফিশার (Umar Fisher) তিনি কিছুদিন ধরে আমেরিকায় একটি ইন্সুরেন্স কোম্পানী ইসলামী মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে তার সঙ্গে আমার ইতিপূর্বেও সাক্ষাত হয়েছে। চিঠিপত্রের মাধ্যমেও যোগাযোগ হয়েছে। সেমিনারে তিনি প্রচলিত ইন্সুরেন্সের এবং তাকাফুলের ইসলামী মূলনীতির মধ্যকার পার্থক্য স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। আমেরিকায় ইসলামী ইন্সুরেন্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাঁর বিস্তারিত পরিকল্পনা সবিস্তারে আলোচনা করেন।

মালয়েশিয়া ও ইরানের মেহমানগণ নিজ নিজ দেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ও তার বাস্তব কর্মপন্থা সম্পর্কে সবিস্তারে আলোকপাত করেন।

দ্বিতীয় দিনও কনফারেন্স চলতে থাকে। অর্থ বিনিয়োগের (Financing) ইসলামী পন্থাসমূহের উপর আলোকপাত, ইসলামী ব্যাংকসমূহের তত্ত্বাবধান এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকসমূহের সঙ্গে সেগুলোর সম্পর্কের বিষয়ে মতামত প্রকাশ করার জন্য আমাকে পুনর্বার ভাষণ দানের জন্য আহবান করা হয়। সুতরাং দ্বিতীয় দিনেও এ বিষয়ে আমি আলোচনা রাখি।

সেদিনই কনফারেন্স শেষ হওয়ার কিছু পূর্বে অন্টারিও প্রদেশের অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী মিঃ ইসাবেল ব্যাসেটও বড় মনোমুগ্ধকর ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। তাতে অনুমিত হয় যে, তিনি ইসলামী ব্যাংকিং, তার বাস্তব সমস্যাদি এবং সমগ্র বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত অর্থ-প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে এত অধিক অবগত যে, আমাদের অনেক উচ্চশিক্ষিত মুসলমানও এত অধিক অবগত নন। তার ভাষণে কানাডায়

মুসলমানদের ইতিহাস এবং কানাডা সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের বিষয়ে অনেক ভাল ভাল তথ্য ছিল। ভাষণটি ছিল লিখিত। কিন্তু তার নিকট কপি ছিল মাত্র একটি। আমি তাঁকে এর আরো কপি করার অনুরোধ করি। আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে তার একটি কপি সংগ্রহ করি। আমি মনে করি যে, তাঁর সম্পূর্ণ ভাষণটি পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য অনেক দিক থেকে মনোরঞ্জনের কারণ ও তথ্য বর্ধক হবে। তাই আমি তাঁর নিকট থেকে এটি প্রকাশ করার অনুমতিও গ্রহণ করি। নীচে তাঁর ভাষণের অনুবাদ তুলে ধরছি।

টরেন্টোর ইসলামী ব্যাংকিং কনফারেন্সে
মিসেস ইসাবেল ব্যাসেট-এর ভাষণ

আমি আনন্দিত যে, এমন এক মুহূর্তে আমি আপনাদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছি, যখন আপনারা ইসলামী ব্যাংকিং ও ফিন্যান্স এর সুবাদে সমগ্র বিশ্বের পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করছেন। সৌভাগ্যক্রমে কনফারেন্সটি অন্টারিও প্রদেশের টরেন্টো শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। টরেন্টো শহর বহু জাতি, বহু সভ্যতা ও নতুন চিন্তা-চেতনার একটি বিশ্বজনীন (Cosmopolitan) মিলন কেন্দ্র।

পৃথিবী নামক গ্রহটি বর্তমানে একটি জনপদের রূপ ধারণ করেছে। বর্তমানে এ জনপদে ভৌগলিক সীমারেখার তেমন কোন গুরুত্ব অবশিষ্ট নেই। তাই বর্তমানে সফলতম বাণিজ্য সেটিই হবে, যা এমন মেশিনারীসমূহ তৈরী করতে পারবে, যা তার কারবারকে বহুবিধ সভ্যতা ও বহুমহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত করতে পারবে। অধিকতর সফল দেশ ও প্রদেশ সেগুলোই হবে, যেগুলো এ জাতীয় বাণিজ্যকে উন্নতি দান করে তা দ্বারা সম্ভাব্য পর্যায়ের চূড়ান্ত উপকার হাতিয়ে নিতে পারবে।

এ কারণেই ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে আলোচনা এখন শুধুমাত্র মুসলিম বিশ্ব কিংবা মুসলিম জাতিসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়নি। বরং এখন তার পরিধি এত অধিক বিস্তৃত হচ্ছে যে, এর মধ্যে অমুসলিম দেশসমূহ এবং ঐ সমস্ত সরকারও অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, যারা অর্থনৈতিক ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ করে থাকে।

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উপর আলোচনা কানাডার ঐ সমস্ত মুসলমানের জন্য বিশেষ গুরুত্বের ধারক, যারা স্বীয় জীবনকে ইসলামী মূলনীতি অনুপাতে অতিবাহিত করতে চায়। অনেকে পবিত্র কুরআনের ঐ সমস্ত বিধান অনুপাতে আমল করতে চায়, যেগুলো সুদবিরোধী। পবিত্র এই কিতাবের দ্বিতীয় সূরায় বলা হয়েছে যে, 'আল্লাহ ব্যবসার অনুমতি দিয়েছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।' তারপর একথাও বলা হয়েছে যে, 'আল্লাহ সুদকে সর্বপ্রকার বরকত থেকে বঞ্চিত রাখবেন।'

ইসলামী ব্যাংকিং ও ফিন্যান্সের বিষয়টি সে সমস্ত লাখ লাখ মুসলমানের জন্য পরম মনোরঞ্জনের বিষয়, যারা বিগত ২৫ বছর সময় ধরে পাশ্চাত্যে এসে অধিবাস গ্রহণ করেছে এবং ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র এবং এই কানাডায় অর্থনৈতিকভাবে সফল সংখ্যালঘু হিসাবে জীবন যাপন করছে।

এখানে অর্থাৎ কানাডায় ঐ সময় থেকে মুসলমানদের বসবাস রয়েছে, যখন থেকে কানাডা অস্তিত্ব লাভ করেছে। ঐতিহাসিকভাবে এখানে মুসলমানদের অস্তিত্ব ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রমাণিত। অর্থাৎ কনফেডারেশনের প্রতিষ্ঠার মাত্র চার বছর পর থেকে। সে সময় মুসলমানদের সংখ্যা বলা হয় মোট ১৩ জন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে এখানকার মুসলমানদের সংখ্যা ৩০০ এর কাছাকাছি হয়েছিল। এটিই সেই বছর, যখন একজন মুসলমানের নেতৃত্বে দক্ষিণ এশিয়ার একটি দল কানাডায় এসে অধিবাস গ্রহণ করে।

বর্তমানে কানাডার ঘোষণাকৃত সংখ্যা অনুপাতে এখানে কমপক্ষে সাড়ে ৩ লাখ কানাডিয়ান মুসলমান রয়েছে (বেসরকারী হিসাব অনুপাতে এখানে মুসলমানদের সংখ্যা ৫ লাখ)। কানাডায় মুসলমানদের সংখ্যার রেকর্ড বড়ই আনন্দদায়ক। তারা কানাডার অখৃষ্টান অধিবাসীদের এক চতুর্থাংশ। তারা খৃষ্টান ও ইহুদীদের পর এখানকার তৃতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় গোষ্ঠী।

আর যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, তাদের সংখ্যা ইহুদীদের অধিক নয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই তাদের সংখ্যা ইহুদীদের থেকে অধিক হবে।

তাছাড়া বর্তমানে মুসলমানগণ কানাডার অন্যান্য অধিবাসীর তুলনায় স্বল্পতম বয়সের অধিকারী। কারণ তাদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ (৩০ শতাংশ) বিশ বছরের চেয়ে কম বয়সী। ভবিষ্যতে দেশের লেবার ফোর্সে তাদের অন্তর্ভুক্তির হার বহির্গামীদের তুলনায় অধিক হবে। কারণ, এখানে তাদের চাকরী লাভ করা ও উন্নতি করার ক্ষেত্রে তাদের মা–বাবাদের তুলনায় অনেক কম প্রতিবন্ধকতার শিকার হতে হবে।

হ্যালিফ্যাক্সের সেন্ট মেরী ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর আতহার আকবরী একটি ষ্টাডি করেছেন, সে অনুপাতে মুসলমানগণ এখানকার সংখ্যালঘুদের মধ্যে শিক্ষার মানের দিক থেকে একমাত্র ইহুদীদের পর দ্বিতীয় নম্বরে। এদের জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ এমন, যারা আঠার বছর বা ততোধিক সময়ে শিক্ষা সমাপন করেছে।

এ সমস্ত তথ্য থেকে পরিস্কার বোঝা যায় যে, মুসলমানগণ কানাডা ও অন্টারিওর অর্থনৈতিক সচ্ছলতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কানাডায় তাদের অবস্থানের কারণে এখানকার পর্যটন প্রসার লাভ করেছে। কারণ, তাদের আত্মীয়–স্বজন তাদের সাথে দেখা–সাক্ষাতের জন্য কানাডা এসে থাকে। তাছাড়া এখানকার মুসলমান ব্যবসায়ীগণ এ দেশকে বহির্দেশে ব্যবসা করার নতুন নতুন রাস্তা করে দিচ্ছে।

সাম্প্রতিককালেই দূর প্রাচ্যে কানাডার বাণিজ্যের প্রসার ঘটানোর জন্য যে মিশন গিয়েছিল, তার মধ্যে কিছু মুসলমান ব্যবসায়ীও প্রধানমন্ত্রী মাইক হ্যারিসের সঙ্গে এ ভ্রমণে গিয়েছিল।

এছাড়াও বিভিন্নভাবে মুসলমানগণ কানাডায় তাদের অস্তিত্বের অনুভূতিকে ব্যাপক করছে। মুসলমানগণ এখানে বহুসংখ্যক ও সচ্ছল, বিধায় তারা প্রত্যেক শহরে এবং জনপদে সরকারের কোন আর্থিক সহযোগিতা ছাড়া মসজিদ নির্মাণ করছেন। শুধুমাত্র টরেন্টোর মেট্রো এলাকায় ২ ডজনের অধিক এমন মসজিদ রয়েছে, যেগুলোর ডিজাইন ও নির্মাণ অতি সুন্দর করা হয়েছে। শহরের প্রায় ৪০/৫০টি স্থানে অত্যন্ত নিয়ম শৃঙ্খলার সাথে জুমুআর উদ্দেশ্যে বিরাট বিরাট সমাবেশ হয়ে থাকে। এখন এখানকার অফিসারগণ দিনে দিনে তাদের মুসলমান কর্মচারীদেরকে জুমুআর নামায পড়ার জন্য ছুটি দেওয়ার প্রতি অধিক

গুরুত্বারোপ করছে। তাদের মধ্যে রমাযান মাসে রোযাদারদেরকে অধিক থেকে অধিকতর সুবিধা দানেরও ঝোঁক সৃষ্টি হচ্ছে। এখন অন্টারিও প্রদেশের সরকার তার অখৃষ্টান কর্মচারীদেরকে বছরে দু'টি ধর্মীয় ছুটি দিয়ে থাকে। মুসলমানদেরকে এ দুই ছুটি দুই ঈদের সময় দেওয়া হয়ে থাকে।

সমগ্র বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা ১ বিলিয়নের অধিক। তাই, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নাই যে, ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রসারে প্রতিবছর সতের শতাংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরো অধিক উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইসলামী ব্যাংকিং ও ফিন্যান্স শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মুসলমান দেশসমূহেই গুরুত্ব লাভ করছে না, বরং পাশ্চাত্য জগত এবং আরো কিছু বাজার যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাংকার গোষ্ঠীদের মধ্যেও এটি গৃহীত হচ্ছে।

যদিও এমন দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে যে, যে সমস্ত দেশে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু, সেখানে ইসলামী অর্থ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। যেমন লুক্সেমবার্গ, ডেনমার্ক, অষ্ট্রেলিয়া। কিন্তু মাসিক 'আমেরিকান ব্যাংকার' পত্রিকা তার জানুয়ারী ১৯৯৭ এর সংখ্যায় লিখেছে যে, এখনও কানাডায় এমন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

যেহেতু ইসলামী ব্যাংকিং প্রচলিত ব্যাংকসমূহের নিরেট অর্থনৈতিক তৎপরতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আরো সম্মুখে অগ্রসর হয়ে থাকে, তাই কানাডার ব্যাংকিং মার্কেটে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অনুপ্রবেশ আইনগত কিছু প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হবে না। পাশ্চাত্য জগতের বাজারসমূহে ব্যাংকিং নতুন ধারণাসমূহ পরিচিত করার অর্থ এই হবে যে, তাকে এমন নিয়মসমূহের সম্মুখীন হতে হবে, যেগুলো ইসলামী অর্থনৈতিক ধারণার পরিপন্থীও হতে পারে।

পৃথিবীতে যখন থেকে ইন্টারনেট ব্যাংকিং আরম্ভ হয়েছে, তখন থেকে আমরা একটি বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হচ্ছি। এমন একটি সামগ্রিক বাজারের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, ভৌগলিক সীমারেখা যার নিকট অপরিচিত। কাজেই, পাশ্চাত্যের অর্থপ্রতিষ্ঠানসমূহকে দৈনন্দিন এমন সমস্ত নতুন নতুন পন্থা তালাশ করতে হবে, যা ইসলামী

ব্যাংকিংয়ের ঊর্ধ্বমুখী বাজার ও তার সম্ভাব্য উন্নতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে।

তারপরও কানাডায় ব্যাংকিংয়ের ব্যাপারসমূহ যৌথ সরকারের দায়িত্ব। আমার বন্ধু মিঃ ডন ব্ল্যাংকারেন এসব ব্যাপারে এক্সপার্ট, তাই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা তার জন্য আমি রেখে দিচ্ছি।

তবে এখানে আমি অবশ্যই একথাটি বলব যে, অনেক মুসলমান কানাডার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধীনে কাজ করেও এমন নতুন পন্থাসমূহ অন্বেষণ করেছেন, যেগুলোর অধীনে তারা ইসলামের সুদমুক্ত ব্যাংকিং বিধানের উপর আমল করে অন্যান্য পন্থার সঙ্গে কারবার করবেন। যেমন, টরেন্টোতে ইসলামী হাউজিং কোঅপারেটিভ তার সদস্যদেরকে সুদী ঋণ ছাড়া বাড়ী করার সুযোগ করে দিয়েছে। এ জাতীয় প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত ঋণ এবং ব্যবসায়িক কারবারের মধ্যেও করা হচ্ছে।

কিন্তু ইসলামী ফিন্যান্সের অঙ্গনে অতি দ্রুত যে প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহল ইসলামী ইক্যোয়িটি ফাণ্ডের প্রবণতা। 'মাসিক ব্যাংকারের' ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ সংখ্যার রিপোর্ট অনুপাতে বাজারে তার সাইজ দেড় বিলিয়ন ডলারেরও অধিক অনুমান করা হয়েছে। ইসলামী ইক্যোয়িটি ফাণ্ড পাশ্চাত্য ধাঁচের মিউচুয়াল ফাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যার মধ্যে কোম্পানীসমূহের শেয়ারের একটি যৌথ খাত বের করা হয় এবং কোন বিজ্ঞ পেশাজীবী তা চালানোর প্রতি যত্ন নেয়। ওয়াশিংটন ডিসিতে বসবাসকারী বিশ্বব্যাংকের জমির ইকবালের ভাষ্য এই যে, ইসলামী ইক্যোয়িটি ফাণ্ড পাশ্চাত্যের মিউচুয়াল ফাণ্ড থেকে একটি মাত্র মৌলিক বিষয়ে ভিন্ন রকম যে, এর মধ্যে শেয়ার নির্বাচনের জন্য একটি কঠিন স্ক্রিনিং করতে হয়, যার ফলে কেবলমাত্র ঐ সমস্ত শেয়ারই খরিদ করা সম্ভব হয়, যেগুলো বিনিয়োগের ইসলামী মূলনীতি অনুপাতে সঠিক।

ইক্যোয়িটি ফাণ্ড ইসলামী ধারায় পুঁজি বিনিয়োগের জন্য স্বভাবতই সর্বাধিক উপযুক্ত পন্থা। কারণ, ইসলামের অর্থনৈতিক মূলনীতি, অর্থনৈতিক উপকরণের উৎপাদনমুখী প্রয়োগ, সুষ্ঠু অংশীদারিত্ব এবং ঝুঁকিসমূহে অংশীদারিত্বের সাহস বৃদ্ধি করে।

সমগ্র বিশ্বে বেসরকারীকরণ–এর যে কাজ হচ্ছে, তার কারণে

ইসলামী ইক্যোয়িটি ফাণ্ডের বহু সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সমগ্র বিশ্ব ছাড়াও খোদ অন্টারিয়োতে বেসরকারীকরণ–এর এই সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে যে, তারা কোন প্রাইভেট ব্যবসায়ী কারবারের মালিকানায় অংশীদার হবে। আর এ কাজ ইসলামী ইক্যোয়িটি ফাণ্ডস এর রূপায়নের মাধ্যম হতে পারে। তারপরও ইসলামের দিক থেকে শেয়ার নির্বাচনে যে সমস্ত কড়া শর্তারোপ করা হয়েছে, তার কারণে ফাণ্ডকে বহুমুখী করার ক্ষেত্রে কিছুটা জটিলতা রয়েছে। এজন্য ইসলামী ফাণ্ডের ব্যবস্থাপকগণ সমগ্র বিশ্বে বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টি হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।

আজকের এই কনফারেন্সে এ জাতীয় ফাণ্ডের ব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত থাকলে আমি তাদেরকে বলতে পারি যে, অন্টারিও কেন বিনিয়োগের জন্য উৎকৃষ্টতম ক্ষেত্র। আমাদের এখানে ট্যাক্সের পরিবেশ প্রতিযোগিতামূলক (Competitive)। আমাদের এখানে এমন অনেক কারবার রয়েছে, যেগুলো পুঁজির প্রতীক্ষায় রয়েছে। আমাদের নিকট রাজনৈতিক দৃঢ়তা রয়েছে। আমাদের ষ্টক মার্কেটে উপরে উঠার ঝোঁক (Bullish Trend) বিদ্যমান। আমাদের সরকার আমাদের বাজেটের ঘাটতি এবং ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

ইসলামী ইক্যোয়িটি ফাণ্ডের মতো অত্যাধুনিক উৎপাদনকে পরিচিত করানো কানাডায় ইসলামী ব্যাংকিংএর জন্য একটি সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের সফলভাবে মোকাবিলা করা হলে এর মাধ্যমে কানাডায় ইসলামী অর্থ বাজার প্রতিষ্ঠা ও তার স্থায়িত্বের সঠিক নির্ধারণ হবে।

মুসলমানগণ কানাডার সঙ্গে যেভাবে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে, এবং কানাডা যেভাবে নিজেকে মুসলমানদের সঙ্গে খাপ খাওয়াচ্ছে তা ইসলাম ও কানাডা উভয়ের জন্য প্রশংসনীয়। কানাডার নতুন ধর্মীয় সংখ্যালঘুদেরকে স্বাগত জানানোর এক সম্মানজনক ইতিহাস রয়েছে। আর এজন্যই আমরা বর্তমানে বিশ্বের সর্বাধিক প্রকারের মানুষের সমন্বয়ে গঠিত (Interogenous) জাতি।

এমনিভাবে ইসলাম একটি সার্বজনীন ধর্ম। একইভাবে মুসলমানগণ বিভিন্ন সভ্যতা, বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন বংশের সমন্বয়ের জাতি, যেমন কিনা কানাডা। তাই, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, কানাডার

মুসলমানগণ কানাডায় থেকেই একটি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠায় চরম সফল হয়েছে। বিভিন্ন দিক থেকে আমরা পরস্পরের জন্য সৃষ্ট। যেমন কিনা নব আগন্তুকদের অবিরাম ঢেউ আমাদের জাতিকে বিশ্বের বুকে স্বতন্ত্র এক জাতির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করছে।

কনফারেন্সের পর

৩রা জুন সেমিনার সমাপ্তির পর আরো একদিন টরেন্টোতে অবস্থান করি। এ দিনটিও বড় ব্যস্ততায় কাটে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে পশু জবাইয়ের যে সমস্ত পন্থা প্রচলিত রয়েছে, সে সম্পর্কে জুনের শেষে 'ইসলামী ফেকাহ একাডেমী জেদ্দার' বার্ষিক অধিবেশনে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে আমাকেও একটি প্রবন্ধ পেশ করতে হবে। এজন্য আমি নিজেও এসব পন্থাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করে আসছি। ইতিপূর্বের সফরে এর কিছু কাজ পূর্ণ হয়েছিল। এবার টরেন্টো থেকে দূরে গিয়ে কিছু জবাইখানা দেখি। তাছাড়া 'টরেন্টো ষ্টার' কানাডার প্রথম শ্রেণীর একটি পত্রিকা। খুশীর ব্যাপার হল, পাকিস্তানী মুসলমান জনাব হেলাল সিদ্দীকী সাহেব এর সম্পাদক। তিনি দুপুরের খানার জন্য আমাকে দাওয়াত করেছিলেন। বর্তমানে জনসাধারণের মানস গড়ার জন্য পত্রিকার যে ভূমিকা তা সচেতন কোন মানুষেরই অজানা থাকতে পারে না। জনাব সিদ্দিকীর 'টরেন্টো ষ্টারের' সম্পাদকীয় বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মুসলমানদের অনেক স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে।

এতদব্যতীত মিঃ ডেরিক লী (Derek Lee) ও মিসেস ইসাবেল ব্যাসেট অন্টারিও প্রদেশের এসেম্বলীর কার্যক্রম দেখার জন্য দাওয়াত করেছিলেন। ঘটনাক্রমে এর মাত্র একদিন পূর্বে কানাডায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কনজার্ভেটিভ পার্টি ক্ষমতায় এসেছে। মিঃ লী–ও সে পার্টিরই একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। স্থানীয় মুসলমানগণ মতপ্রকাশ করেন যে, তাঁর দাওয়াত কবুল করা দরকার। সুতরাং দুপুরের আহারান্তে অন্টারিওর প্রাদেশিক এসেম্বলীর এজলাসে যাই। সেখানকার কার্যক্রম দেখি। সে সময় প্রশ্নোত্তরের বিরতি চলছিল। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে সরকারের উপর প্রশ্নের ঝড় উঠছিল। কোন একটি বিতর্কের

সমাধানের জন্য সরকার একটি বিচার বিভাগীয় ট্রাইবুনাল গঠন করেছে। বিরোধী দল এই ট্রাইবুনালের গঠন পদ্ধতি ও তার কর্মপন্থাকে অগণতান্ত্রিক আখ্যা দিচ্ছিল, তাদের পক্ষ থেকে সরকারের এই পদক্ষেপকে 'বর্বরতা' বলা হচ্ছিল।

আমরা পাকিস্তানে এসেম্বলীর কার্যক্রমের ধরন এবং সেখানকার হৈহুল্লোড়কে খারাপ ভেবে থাকি এবং সে কারণে আমরা হীনমন্যতার শিকার হয়ে থাকি। এখানকার কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করে আমার সে অনুভূতি লোপ পায়। কারণ, এখানকার কার্যক্রমের যে অংশ আমরা দেখি, তাতে হৈহুল্লোড়, পরস্পরের কথা না শোনা, বিপক্ষের কথা সহ্য না করা এবং একজনের কথার মধ্যে আরেকজন কথা বলার সেই অবস্থাই দেখতে পাই, যাকে বর্তমানের সাংবাদিকতার ভাষায় 'মাছের বাজার' বলা হয়। হৈহুল্লোড়ের এ পুরো সময়টিতে স্পীকারকে প্রায় অসহায় দেখা যাচ্ছিল।

মদীনা মসজিদ টরেন্টোর সর্ববৃহৎ মসজিদ। মাশাআল্লাহ, এটি বহু সংখ্যক মুসলমানের একটি কেন্দ্র। সেখানকার ইমাম ও খতীব মাওলানা মুহাম্মাদ খলীল সাহেবের পীড়াপীড়িতে মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত সেখানে ভাষণ দান করি। দূর দূরান্ত থেকে মুহব্বতকারীগণ সেখানে সমবেত হন। সম্পূর্ণ মসজিদটি লোকে পরিপূর্ণ ছিল। এই ভাষণ দানের উছিলায় এমন অনেক বন্ধুর সাথে সাক্ষাত হয়, সংক্ষিপ্ত এ অবস্থানকালে যাঁদের সঙ্গে পূর্বে সাক্ষাত হয়নি। টরেন্টো উত্তর আমেরিকার ঐ সমস্ত শহরের অন্যতম, যেখানে বহু সংখ্যক মুসলমানের অধিবাস রয়েছে। মসজিদ, মাদরাসা ও স্কুল থেকে নিয়ে মুসলমানদের নিজেদের সব ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রত্যেকবার সেগুলোকে উন্নতিমুখী দেখে মন আনন্দে ভরে যায়। এবার টরেন্টোতে আমি মাত্র তিনদিন অবস্থান করি। তার মধ্যে দু'দিন সেমিনারের কাজে ব্যস্ত থাকি। আর এঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অতি কষ্টে একদিন মাত্র সময় পাই।

ক্যালিফোর্নিয়ায়

৫ই জুন সকাল নটায় টরেন্টো থেকে স্যানফ্রান্সিসকোর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। প্রথমে নর্থ ওয়েষ্ট এয়ারলাইন্সের বিমানে আমেরিকার

মেনাপোলিস শহরে পৌঁছি। সেখানে দু' ঘন্টা অপেক্ষার পর বিমান পরিবর্তন করতে হয়। স্যানফ্রান্সিসকো ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন শহর। শহরটি আমেরিকার দক্ষিণ–পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত। নিউইয়র্ক থেকে এখানে বিমানে ছয় ঘন্টার পথ। নিউইয়র্ক থেকে এখানকার সময়ও তিন ঘন্টা আগানো। অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে পাকিস্তান ও ক্যালিফোর্নিয়ার মাঝে পূর্ণ ১২ ঘন্টার পার্থক্য হয়ে থাকে। পাকিস্তানে যখন রাত আটটা, তখন এখানে সকাল আটটা। স্যানফ্রান্সিসকো বিমান বন্দরে স্বাগত জানানোর জন্য বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন। টরেন্টোতে আমি একদিন বেশী কাটানোর কারণে এখানে আসল প্রোগ্রাম থেকে ১ দিন পরে এসে পৌঁছি। এদিনই আমার স্যানফ্রান্সিসকো থেকে প্রায় একশ' মাইল দূরে এ্যাডলে নামক স্থানে ভাষণ দানের প্রোগ্রাম ছিল। তাই বিমান থেকে নেমে আমাকে কারযোগে সোজা ষ্টকটান, তারপর সেখান থেকে এ্যাডলে যেতে হয়। এ্যাডলেতে আছর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে মুসলমানদের বিশাল সমাবেশ ছিল। সেখানে উর্দুতে ভাষণ প্রদান করি। মাগরিবের পর নৈশভোজের ব্যবস্থা ছিল। তারপর রাতেই ফিরে এসে ষ্টকটনের ইসলামী সেন্টারে নিশি যাপন করি। সেন্টারটি জনাব মাওলানা উবায়দুর রহমানের নেতৃত্বে বহু কল্যাণকর সেবামূলক কাজ করছে। ক্যালিফোর্নিয়ার বিভিন্ন আলিম এখানকার সমস্যাদি সম্মিলিতভাবে সমাধানের জন্য 'শরীয়া কাউন্সিল অফ ক্যালিফোর্নিয়া' নামে একটি দল গঠন করেছেন। মাওলানা উবায়দুর রহমান সাহেব দলের প্রধান। তিনি অত্যন্ত যোগ্য আলিম। তাঁর সম্মিলিত তৎপরতা দেখে আনন্দিত হই।

৬ই জুন জুমাবার ছিল। এদিন আমার ক্যালিফোর্নিয়ার প্রাদেশিক রাজধানী সেক্রামেন্টো (Secramento)তে জুমআর সমাবেশে ভাষণ দানের প্রোগ্রাম ছিল।

শহরটি ষ্টকটান থেকে প্রায় ৪০/৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। সেক্রামেন্টো সম্পর্কে বলা হয় যে, আমেরিকা মহাদেশে সর্বপ্রথম মসজিদ এখানেই নির্মিত হয়। ঐতিহাসিক এ মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা মুমতাজুল হক সাহেব। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা সমাপণ

করেন। তিনি এ অঞ্চলের উদ্যমী ও তৎপর আলিমদের অন্যতম। অতি দ্রুত ইংরেজী বলেন। এলাকার লোকেরা তাঁর ঘনিষ্ঠ।

তাঁর সঙ্গে সেক্রামেন্টোর সফর হয়। এ অঞ্চলে মুসলমানগণ বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে অধিবাস গ্রহণ করেছে, বিধায় কোন একটি ভাষাও এমন ছিল না, যা সবাই ভালভাবে বুঝতে পারে। ফলে এখানকার নিয়ম হল, প্রথমে উর্দু তারপর ইংরেজীতে ভাষণ দেওয়া হয়।

এই নিয়মমাফিক আমাকেও পরপর উভয় ভাষায় বক্তব্য দান করতে হয়। মসজিদটি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে (প্রায় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত। এখন তৎসংলগ্ন একটি মাদরাসা, পাঠাগার এবং মুসলমানদের একটি মিলনায়তনও রয়েছে। জুমুআর পর খাওয়ার বৈঠকে এখানকার মুসলমানদের সঙ্গে স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে বাক–বিনিময় হয়। আমেরিকায় বিশ্বের সর্বত্র থেকে আগত বিভিন্ন মুসলমানদেরকে এক জায়গায় দেখতে পেয়ে সবসময় ইসলামী ঐক্যের মধুময় প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয়। কিছু বিতর্কিত সমস্যা না হলে এটি ইসলামের সার্বজনীনতার বড় ঈমান–উদ্দীপক দৃশ্য হয়।

চারটার সময় আমাকে ক্যালিফোর্নিয়ার অপর একটি শহর শান্তা কারালায় যেতে হয়। শহরটি এখান থেকে প্রায় দেড়শ' মাইল দূরে।

শহর থেকে বের হওয়ার পূর্বে আমাদের পথ–প্রদর্শক মাওলানা মুমতাজুল হক সাহেব সেক্রামেন্টোর গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ঘুরে দেখান। এটি ছোট একটি শহর। প্রাদেশিক সরকারের দপ্তর ও পার্লামেন্ট ইত্যাদির সুদৃশ্য ভবনসমূহ এখানেই অবস্থিত। যদিও ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে লসএঞ্জেলস ও স্যানফ্রান্সিসকোর ন্যায় বড় বড় শহর রয়েছে। কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার রাজধানীর জন্য এ সমস্ত বড় বড় শহরের পরিবর্তে সেক্রামেন্টোকে সম্ভবতঃ এজন্য নির্বাচন করা হয়েছে যে, শহরটি ক্যালিফোর্নিয়ার অনেকটা মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। চতুর্দিকের লোকদের জন্য এখানে আসা তুলনামূলক সহজ।

সেক্রামেন্টোতে বেশ গরম ছিল। কিন্তু আমরা সড়কপথে যতই পশ্চিম দিকে এগুলিচ্ছলাম গরম ততই কম হয়ে আসছিল। এমনকি প্রায় অর্ধেক পথ অতিক্রম করার পর পাহাড়ী এলাকা আরম্ভ হলে ঋতু

সম্পূর্ণরূপে পাল্টে যায়। এই পাহাড় সারি থেকে আরম্ভ করে সমুদ্র উপকূলের অঞ্চলকে—যার মধ্যে স্যানফ্রান্সিসকোও রয়েছে—সাধারণতঃ শীতল বাতাসের কারণে 'এয়ার কণ্ডিশান' এলাকা মনে করা হয় এবং বলা হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের মুক্ত এলাকা থেকে বয়ে আসা বাতাস এ সমস্ত পাহাড়ের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে সমগ্র এলাকাকে শীতল করে দেয়। অনেক সময় কয়েক মাইলের ব্যবধানে তাপমাত্রায় দশ পনের ডিগ্রী পর্যন্ত কম বেশী হয়ে থাকে।

তিন ঘন্টার সফরের পর আমরা সাতটার কাছাকাছি সময় শান্তা কারালায় প্রবেশ করি। এটি উচ্চ শিক্ষিত ও বিত্তশালী ব্যবসায়ীদের শহর। বহুসংখ্যক মুসলমানেরও এখানে বসবাস রয়েছে। তারা সবাই উচ্চ শিক্ষিত। মুসলমানগণ এখানে নিজেদের একটি সুদৃশ্য কমিউনিটি সেন্টার বানিয়েছেন। তাতে মসজিদও রয়েছে, মিলনায়তনও রয়েছে এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের আরো কিছু কেন্দ্রও রয়েছে। মাগরিব নামাযের পর এখানকার অডিটরিয়ামে সমাবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমি যখন ষ্টেজে পৌঁছি, তখন শ্রোতাদের সমস্ত আসন পরিপূর্ণ ছিল। ব্যবস্থাপকগণ আমার আলোচ্য বিষয় নির্ধারণ করেছিলেন 'ইসলামের ন্যায়বিচার ব্যবস্থা' (Islamic Judicial System)। উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর মধ্যে পাকিস্তান ও ভারতের মুসলমানগণ ছাড়া বহু সংখ্যক আরব ও আমেরিকান মুসলমানও ছিলেন। তাই সবাই বুঝতে পারে এমন ভাষা কেবলমাত্র ইংরেজীই ছিল। তাই ইংরেজীতেই আমি ভাষণ দান করি। প্রায় এক ঘন্টা সময় ভাষণ চলতে থাকে। আমি পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটিকে আমার আলোচনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করি।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন—

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِيْنَ خَصِيْمًا

অর্থ ঃ নিশ্চয় আমি আপনার নিকট সত্যসহ এই কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আপনি ঐ প্রজ্ঞার সাথে যা আল্লাহ পাক আপনাকে দিয়েছেন তদানুযায়ী আপনি মানুষের মধ্যে ফায়সালা করেন। আপনি

বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষপাত করবেন না। (নিসা ঃ ১০৫)

আমি নিবেদন করি যে, পবিত্র এ আয়াত ন্যায়বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থাৎ আইন প্রণয়নকারী পরিষদ (Legislature), বিচার বিভাগ ও ওকালতী তিনটার জন্যই মৌলিক দিকনির্দেশনা দান করেছে। এ প্রসঙ্গে এ বিষয়টিও সবিস্তারে আলোচনায় আসে যে, আইন সব সময় পরিবর্তনশীল (Dynamic) হওয়া উচিত, নাকি কিছু আইন এমনও থাকা উচিত, যা সর্বাবস্থায় এবং সর্বযুগে একরকম থাকবে? যদি কিছু আইন এমন হওয়া উচিত হয়, তাহলে কিসের ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করা হবে? আলহামদুলিল্লাহ, আমার আলোচনা খুব মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে শ্রবণ করা হয়। আলোচনা শেষের প্রশ্নোত্তর পর্বে উপস্থিত সুধীজন খুব উদ্যমের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। প্রশ্নোত্তরের এ ধারাও অনেকক্ষণ চলতে থাকে। এই সেন্টারের প্রধান এক আরব ভদ্রলোক। আমি ষ্টেজ থেকে অবতরণ করলে তিনি আমার ললাটে চুম্বন করেন এবং বলেন ঃ

نحن فخورون بك

'আমরা আপনাকে নিয়ে গর্বিত।'

রাত দশটার দিকে এশার নামায হয়। নামাযের পর লোকদের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতে অনেক সময় লেগে যায়। আমেরিকার প্রায় সব জায়গায়ই এ বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় যে, মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের দ্বীনের সংরক্ষণ এবং নিজেদের ইসলামী স্বকীয়তা অক্ষুন্ন রাখার ফিকির মাশাআল্লাহ এত দ্রুত উন্নতি করছে যে, নিখাঁদ মুসলিম দেশসমূহেও অনেক সময় তা পরিলক্ষিত হয় না।

এটি আমার আমেরিকার সপ্তম ভ্রমণ। প্রতিবারই আমার অনুভূত হয়েছে যে, মুসলমানদের এই আবেগ আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং ইসলামী বিষয়ের আলোচনা–সভায় অংশগ্রহণের জন্য মানুষ দু'শ তিনশ মাইল দূর থেকে সফর করে আসে। আজও সেন্টারের চতুর্দিকে গাড়ীর লম্বা লম্বা সারি ছিল। মানুষ অনেক দূর থেকে সফর করে এখানে এসেছিল।

এদের ভালবাসা, মূল্যায়ন ও নিষ্ঠা মন–মগজে গভীর রেখাপাত করে।

ভাষণশেষে আমাকে সানফ্রান্সিসকো ফিরে গিয়ে সেখানে রাত কাটাতে হবে। আমার মেজবান মাওলানা উবায়দুর রহমান সাহেব এবং মাওলানা আমজাদ সাহেব বিমানবন্দরের অদূরে হোটেল হলিডে ইন–এ আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। সুতরাং রাত বারটার পর হোটেলে পৌঁছে রাতে সেখানেই অবস্থান করি।

সকাল ৭টায় আমার মেজবানগণ হোটেলেই স্থানীয় আলিম, খতীব ও মসজিদের ইমামদের এক সমাবেশের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁরা এখানকার সমস্যাদির পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সমাধান করার জন্য একটি শরীয়া কাউন্সিল বানিয়েছেন। তার আমীর হলেন মাওলানা উবায়দুর রহমান সাহেব। মূলত ঐ কাউন্সিলর পক্ষ থেকেই এ অধিবেশন ছিল এবং আমার উপস্থিতিতে তা এজন্য আহবান করা হয়েছিল, যেন কিছু সমস্যার ব্যাপারে আমার উপস্থিতিতে মত বিনিময় করে অধমের মতামত জানা যায় এবং এ সমস্ত সমস্যার ব্যাপারে ভবিষ্যতে কোন সম্মিলিত অবস্থান গ্রহণ করা যায়। এ অধিবেশন সকাল সাতটা থেকে প্রায় সাড়ে দশটা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আমি খুবই আনন্দিত হই যে, আলহামদুলিল্লাহ, কাউন্সিলের সকল সদস্য পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে মুসলমানদের কল্যাণ ও সাফল্যের জন্য প্রশংসনীয় কাজ করছেন। সমস্যাদি সম্পর্কে সম্মিলিত চিন্তা–ভাবনার কাজে তাঁদের ভাবধারা ও কর্মপন্থা গঠনমূলক। এ মজলিসে অনেক মাসআলা আলোচনায় আসে। তন্মধ্যে কতিপয় মাসআলা সম্পর্কে কাউন্সিলের সদস্যদের মতামত বিভিন্ন রকমও ছিল। কিন্তু সবার ফিকির ছিল এক। মতে ভিন্নতা সত্ত্বেও পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহার্দে কোন ছেদ পড়েনি। আলহামদুলিল্লাহ, উদার মনের সঙ্গেই সব সমস্যার নিরসন হয়।

লসএঞ্জেলসের অধিবাসী আমার বন্ধু আমের আখতার আমার এখানে আসার সংবাদ পেয়ে তাঁর বন্ধু যাফর সাহেবকে নিয়ে দু'দিন ধরে এখানে এসেছেন। তাঁরা সর্বদাই আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি পীড়াপীড়ি করে বলছিলেন যে, অনবরত সফর ও বিরামহীন প্রোগ্রামের পর কিছু সময়

ভ্রমণের জন্যও বের করা উচিত। আমার এখন সাড়ে দশটা থেকে দু'টা পর্যন্ত সময় খালি ছিল। তাই তিনি স্থানীয় একজন বন্ধুকে ডেকে নিয়ে সানফ্রান্সিসকো শহর ঘুরে দেখার প্রোগ্রাম তৈরী করেন। শহরটি আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত। পশ্চিম দিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের পানি একটি উপসাগরের রূপ ধরে শহরের ভিতরে চলে এসেছে, ফলে স্থলভাগ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। সানফ্রান্সিসকো শহরের বেশী অংশ এ উপসাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার অভ্যন্তরীণ এলাকা উপসাগরের উত্তর তীরে অবস্থিত। তাই স্যানফ্রান্সিসকোকে উত্তরের এলাকার সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য উপসাগরের উপর দিয়ে অনেকগুলো পুল নির্মাণ করা হয়েছে। পুলগুলো বিশ্বব্যাপী প্রসিদ্ধ। গোল্ডেন ব্রীজ (Golden Bridge) সেগুলোর অন্যতম। ব্রীজটিকে এদিক থেকে ব্যতিক্রমধর্মী মনে করা হয় যে, তার উভয়দিকে শুধুমাত্র দু'টি স্তম্ভ রয়েছে। মাঝখানে কোন স্তম্ভ নেই। বরং প্রায় দেড় কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের পুরো পুলটি শূন্যে ঝুলে আছে। পরবর্তীতে অবশ্য এ ধরনের পুল ইস্তাম্বুল ও টোকিও ইত্যাদি শহরেও নির্মিত হয়েছে। যেগুলো এর চেয়েও অধিক লম্বা। কিন্তু যেহেতু সমগ্র বিশ্বে এ জাতীয় পুল এখানেই প্রথমবার নির্মিত হয়েছিল, তাই সানফ্রান্সিসকোর গোল্ডেন ব্রীজ অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। এমনিতেও যে স্থানটিতে এ পুল নির্মাণ করা হয়েছে, তা অসাধারণ নৈসর্গিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। ফলে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন পয়েন্টে পরিণত হয়েছে। এখান থেকে পশ্চিমে ছয় হাজার মাইল দূর পর্যন্ত শুধুই সমুদ্র। একে পশ্চিমে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত বলা হলে ভুল হবে না। সমুদ্রের দিক থেকে প্রবাহিত শীতল বায়ুর আয়ত্বে এ এলাকা। দ্বিতীয়তঃ, এর দক্ষিণে স্যানফ্রান্সিসকোর সুউচ্চ ভবনসমূহ, উত্তরে সবুজ শ্যামল পাহাড় এবং পূর্বে বিস্তীর্ণ উপসাগর বড় মনোরম দৃশ্যের অবতারণা করে। এখানে সমুদ্রের পানি অত্যন্ত ঠাণ্ডা এবং খুব ধারালো। সেজন্য বিশেষ পোশাক পরিধান করা ছাড়া এখানে গোসল করাও সম্ভব হয় না। স্থানীয় লোকেরাও বললেন যে, সাধারণতঃ এ পুল ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা তীব্র মেঘের আবর্তে থাকে। তাই এ দৃশ্য উপভোগ করা কঠিন হয়ে

থাকে। কিন্তু সেদিন খুব নির্মল রোদ উঠেছিল, বাতাস তুলনামূলক মৃদুমন্দ এবং শীতভাব উপভোগ্য পর্যায়ের ছিল। সুদূর বিস্তৃত দৃশ্য কোনরূপ বাধা বিঘ্ন ছাড়া পরিস্কার দেখা যাচ্ছিল। তাই ক্লান্ত শ্রান্ত দেহ-মনের জন্য মনমুগ্ধকর পরিবেশের এ কয়টি মুহূর্ত বড়ই আনন্দদায়ক হয়।

অপর একটি পুল উপসাগরের ঐ জায়গায় নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে উপসাগরের প্রস্থ সাত মাইল ব্যাপী বিস্তৃত। এ সাত মাইল দীর্ঘ পুলটি সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে মাত্র কয়েক ফুট উঁচু দিয়ে সড়কের আকারে বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এর উপর দিয়ে সবসময় গাড়ীর বহর ঢলের মত ধাবমান দেখা যায়। সমুদ্রের মাঝখানের দীর্ঘ এ সড়ক বিমান থেকেও চোখে পড়ে। আমার এ সফরে এর উপর দিয়ে কয়েকবার আসা-যাওয়া হয়েছে। ধারালো সমুদ্রের মাঝখানের এই সড়কের উপর দিয়ে এ ভ্রমণটিও অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ও আনন্দদায়ক হয়।

সানফ্রান্সিসকো শহরের মধ্যেও বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান রয়েছে। এখানে এমন একটি সড়ক রয়েছে, যেটি বিশ্বের সর্বাধিক বাঁকা সড়ক (The most crooked street of the world) হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। অনাবাদী পাহাড়ী অঞ্চলসমূহে তো এমন মোড় খাওয়া সড়ক অনেকই থাকে, কিন্তু ঝলমলে শহরের ঠিক মাঝখানে এমন সড়ক সত্যিই আর কোথাও দেখিনি। তাই এ জায়গাটি পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বহু দূর থেকে মানুষ সড়কটি দেখার জন্য এসে থাকে। ঘটনাচক্রে এই সড়কটির অদূরেই মানবতার দুশমন কুরুচিসম্পন্ন সেই লোকদের বহু মহল্লা আবাদ রয়েছে, যারা নিজেদেরকে 'Gay' বলে। সমকামীতার উপর তারা শুধু গর্বই করে না, বরং সমকামীদের সঙ্গে বিবাহ করে জীবন যাপন করে থাকে। তাই 'বিশ্বের সর্বাধিক বাঁকা সড়কের' নিকট এসে আমার মুখ থেকে আপনাআপনি এ বাক্যটি বের হয় যে, Their crookednees has been symbolized here, অর্থাৎ তাদের এই বক্র প্রকৃতিকে এখানে একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতীকের রূপ দান করা হয়েছে।

এরপর আমার বন্ধু আমাকে একটি দু' পাহাড়ের সঙ্গমস্থলে (Twin Mountains) নিয়ে যান। এটি সবুজ-শ্যামল দু'টি পাহাড়ের সম্মিলিত

চূড়া। এখান থেকে স্যানফ্রান্সিসকো শহরের সম্পূর্ণ দৃশ্য এমনভাবে দেখা যায়, যেন আমরা উড়ন্ত নিচু বিমান থেকে তা দেখছি। এরপর শহরের উপকূলীয় সড়কেও (Drive Marine) যাওয়া হয়। উপকূলীয় এ সড়কটি শত শত মাইল দীর্ঘ। সমুদ্রের তীর ধরে এটি লসএঞ্জেলস পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

এদিন সন্ধ্যায় মাগরিবের পর স্যানফ্রান্সিসকো শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় অবস্থিত একটি ইসলামী সেন্টারে আমার ভাষণের প্রোগ্রাম ছিল। সেন্টারটি শহরের বাণিজ্য কেন্দ্রে অবস্থিত। এতে একটি সুপ্রশস্ত মসজিদ রয়েছে। পাঠাগার এবং শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে। এ সেন্টারটিও উচ্চ শিক্ষিত মুসলমানদের একটি কেন্দ্র। এতে পাকিস্তানী, হিন্দুস্তানী, বাংলাদেশী, আরব ও স্থানীয় আমেরিকান মুসলমানগণ একাত্ম হয়ে আছেন। তাদের অনুরোধে এখানে আমার বক্তব্য 'ইসলামের অর্থনৈতিক শিক্ষা' বিষয়ে ইংরেজীতে হয়। এশা পর্যন্ত প্রায় দেড় ঘন্টা সময় তা অব্যাহত থাকে। তাদের অভ্যাস মাফিক এখানেও বেশ বড় সমাবেশ হয়েছিল। বহু দূর থেকে মানুষ এতে অংশগ্রহণ করতে এসেছিল।

এ রাতটিও সানফ্রান্সিসকোতে অতিবাহিত করি। পরদিন (৮ই জুন) ১০টায় আমাদের ষ্টকটনের ইসলামী সেন্টারে যোহরের পর পুনরায় একটি সমাবেশ রাখা হয়েছিল। উপস্থিতদের প্রায় সবাই ছিল পাকিস্তানী বা ভারতীয়। তাই উর্দূতে ভাষণ দান করি। প্রায় ১ ঘন্টা তা চালু থাকে। ভাষণ দান শেষে অবিলম্বে আমাকে লসএঞ্জেলস রওয়ানা হতে হয়। এখান থেকে স্যানফ্রান্সিসকোর তুলনায় সেক্রামেন্টো অধিক নিকটে (প্রায় ৫০ মাইল) ছিল। তাই সেক্রামেন্টো বিমানবন্দর হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিকাল সাড়ে চারটার দিকে আমি ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের বিমানে আরোহণ করি। বিমানটি ৫টায় উড়াল দিয়ে সোয়া ছয়টায় লসএঞ্জেলস বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

গত আটদিনের বিরামহীন সফর আর সমাবেশের পর লসএঞ্জেলসে একদিনের অবস্থান আমি প্রথমতঃ আমার বন্ধু আমের আখতার সাহেবের মন রক্ষার জন্য রেখেছিলাম। তিনি বহুদিন ধরে এর জন্য পীড়াপীড়ি

করছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, সম্মুখের দীর্ঘ সফর আরম্ভ করার পূর্বে আমি একদিন মানসিক বিশ্রাম চাচ্ছিলাম। তাই আমি আমের আখতার সাহেবের নিকট দরখাস্ত করেছিলাম, তিনি যেন লসএঞ্জেলসে আমার আসার কথা অন্য কাউকে না জানান। তিনি এব্যাপারে নিজের থেকে যত্নশীলও ছিলেন। কিন্তু আমার বন্ধুরা যে কোনভাবে আমার আসার বিষয়টি অবগত হয়ে যান। সুতরাং যখন বিমানবন্দরে অবতরণ করি, তখন অনেকেই স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন এবং আরো অনেকে আসবেন বলে জানতে পারি। অবশেষে বিমানবন্দরের অদূরের মাওলানা আসেফ সাহেবের মসজিদে আসর নামায পড়ার এবং সেখানে সবার সঙ্গে সাক্ষাত করার সিদ্ধান্ত হয়। সে অনুপাতে আসরের নামায সেখানেই আদায় করি। কিছু সময় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা–সাক্ষাত ও কথাবার্তায় অতিবাহিত হয়। সবাই লসএঞ্জেলসে অবস্থানের সময় বৃদ্ধির জন্য পীড়াপীড়ি করছিলেন। কিন্তু আমি পূর্ব গৃহীত প্রোগ্রামের কারণে অপারগ ছিলাম। তাই অক্ষমতা জানানো ছাড়া উপায় ছিল না। যে মসজিদটিতে আসর নামায আদায় করলাম, সেটি তাবলীগ জামাতের মারকায। জানতে পারলাম যে, আলহামদুলিল্লাহ, এ মারকাযের মধ্যস্থতায় এলাকায় তাবলীগের কাজের প্রতিদিন উন্নতি হচ্ছে।

এখান থেকে আমের আখতার সাহেব আমাকে তাঁর বাড়ী নিয়ে যান। সারাদিনের সফরের পর কিছু সময় বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল, যা এখানে পরিপূর্ণ রূপে লাভ হয়। রাতের আহার ও এশার নামাযের পর বেড়ানোর উদ্দেশ্যে কিছু সময়ের জন্য বাইরে বের হই। আমের সাহেব গাড়ীতে করে লসএঞ্জেলসের মধ্য শহর (Down Town)এর পুরোটা ঘুরে দেখান। লসএঞ্জেলস আমেরিকারই শুধু নয়, বরং সমগ্র পৃথিবীর প্রসিদ্ধ, জাঁকজমকপূর্ণ ও বৃহৎ শহরসমূহের অন্যতম। কিন্তু রাতের বেলা এখানের সড়কসমূহ ছিল সম্পূর্ণ নির্জন। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে, এখানে অপরাধের হার এত বেশী যে, রাতের বেলা মানুষ ঘরের বাইরে বের হয় না। কারণ, কারো জান–মালের নিরাপত্তা নেই। তাই দিনের বেলা যে শহর সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতার জাঁকজমকপূর্ণ কেন্দ্র থাকে, দিন গড়িয়ে রাত এলেই তা এক বিরানভূমিতে পরিণত হয়।

আমেরিকায় এ সমস্যাটি দিন দিন জটিল আকার ধারণ করছে যে, সেখানকার জাঁকজমকপূর্ণ শহরসমূহ অপরাধের আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। পুলিশ এত অধিক চৌকস ও তৎপর যে, তিন মিনিটের নোটিশে যে কোন জায়গায় পৌঁছে যায়। অপরাধীদেরকে ধরার জন্য নিত্য নতুন উপকরণসমূহও আবিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু কোনভাবেই অপরাধ হ্রাস পাচ্ছে না।

সানফ্রান্সিসকোর যে হোটেলে আমি অবস্থান করছিলাম, সেখানে হোটেলের ব্যবস্থাপকদের পক্ষ থেকে দীর্ঘ একটি নির্দেশিকা আমাদেরকে দেওয়া হয়। তাতে এ সমস্ত নির্দেশ দান করা হয়েছিল যে, কক্ষের দরজার ভিতর যতগুলো তালা রয়েছে সবগুলো লাগিয়ে কক্ষ বন্ধ করবেন। রাতে ঘুমানোর সময় কোন জানালা বন্ধ না করে ঘুমাবেন না। দরজায় করাঘাত করলে আগত ব্যক্তির পরিচয় না জেনে দরজা খুলবেন না। আগত ব্যক্তি হোটেলের ব্যবস্থাপনার লোক বলে পরিচয় দিলে প্রথমে অভ্যর্থনা কক্ষে ফোন করে নিশ্চিত হন যে, তারা আপনার নিকট আসলেই কোন লোক পাঠিয়েছে কিনা। লিখিত এ সমস্ত নির্দেশিকা দ্বারা আপনি অনুমান করুন যে, সেখানে প্রত্যেকটি মানুষ অপরাধ কার্যের ভয়ে কি পরিমাণ সন্ত্রস্ত থাকে। গত বছর আমি আমেরিকার মিশিগান রাজ্যের ডেট্রয়েট শহরে যাই। সেখানেও এই একই দৃশ্য দেখতে পাই যে, মধ্য শহরের (Down Town) আবাসিক এলাকা বিরান পড়ে আছে। অপরাধ কার্যের ভয়ে মানুষ নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে শহরতলীর বস্তিসমূহে (Suburbs) স্থানান্তরিত হয়েছে। এ সমস্ত বিরান বাড়ী কৃষ্ণাঙ্গরা দখল করে নিয়েছে। লসএঞ্জেলস শহরের প্রাণকেন্দ্রেও একই দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল।

হলিউড ও বেভারলী হিলস (Beverly Hills) এর মত এলাকা—যা সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধ—প্রায় সুনসান পড়েছিল। কিছু পর্যটক আর কয়েকজন ভিখারী ছাড়া বাইরে কাউকে দেখা যাচ্ছিল না। নগরায়নিক এমন বিশাল উন্নতির সাথে সাথে নিরাপত্তাহীনতা ও অপরাধ কার্যের আশংকাজনক এ অবস্থা আমেরিকান সমাজের এমন এক বৈপরিত্য—যার ব্যাখ্যা দানে সমস্ত যুক্তিই ব্যর্থ হচ্ছে।

جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

'যে সূর্যের কিরণ বন্দী করল,
সে জীবনের অন্ধকার রাতকে আলোকিত করতে পারল না।'

আমেরিকান সমাজের আরেকটি বৈপরিত্যও এ রাতেই পরিষ্কার দেখতে পাই। বেভারলী হিলস (Beverly Hills) লসএঞ্জেলসের সেই মহল্লা, যাতে পৃথিবীর ধনাঢ্যতম ব্যক্তিরা বসবাস করে। এ মহল্লারই একটি সড়ককে বিশ্বের সর্বাধিক ব্যয়বহুল মার্কেট বলা হয়। আমের সাহেব এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ এখানকার প্রত্যেকটি জিনিসের মূল্য অস্বাভাবিক রকম বেশী। যেমন একটি টাইয়ের মূল্য দু'শ ডলার। এক জোড়া মোজার মূল্য দেড়শ' ডলার। একটি স্যুটের মুল্য হাজার হাজার ডলার। দোকানের মালিক গ্রাহকদেরকে স্যুট নির্বাচন এবং তার রং ও ডিজাইন নির্বাচনের ব্যাপারেও পরামর্শ দিয়ে থাকে। এ পরামর্শ দানের জন্যও হাজার হাজার ডলার চার্জ করে থাকে (ক্রয়কৃত মালের মূল্য এর অতিরিক্ত)। এ জাতীয় পরামর্শ গ্রহণের জন্য পরামর্শদাতা থেকে পূর্বে সময় নিয়ে রাখতে হয়। সহজে সে সময় পাওয়া যায় না, বরং অনেক সময় কয়েক মাস পর তার সাক্ষাত লাভের পালা আসে। সারকথা হল, এ সড়কটি অঢেল সম্পদের অধিবাসীদের জন্য সম্পদ প্রদর্শনের ও তা ব্যয়ের বাহানা খোঁজার এমন এক মাধ্যম, যার জন্য নির্বুদ্ধিতার সর্বোচ্চ স্তর ছাড়া অন্য কোন ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এই সড়কে এসে এবং এর দোকানসমূহ দেখে অনুভূত হয় যে, এখানে ঐ সমস্ত লোক বাস করে, যারা মুখে স্বর্ণের চামচ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে।

কিন্তু এখান থেকে মাত্র কয়েক ফার্লং দূরে আকাশচুম্বী ভবনসমূহের নীচে ফুটপাতের উপর এমন বহুসংখ্যক লোক দেখা যাবে, যারা সড়কের ডাষ্টবিন থেকে কোকাকোলা, সেভেনআপ ইত্যাদির খালি ডিব্বা একত্রিত করছে। সারারাত এগুলো একত্রিত করে সকালে তা কোন ফেরীওয়ালার নিকট বিক্রি করে। আর এর আয় দিয়ে তারা জীবন যাপন করে। ফুটপাতে এমন কিছু লোকও দেখতে পাই, যারা একটি ট্রলিতে পুরাতন

ও ফাটা–ছেঁড়া কিছু সামানা রেখে যাচ্ছিল। জানতে পারলাম যে, এ ট্রলিই তাদের ঘর। এতে রাখা সামানা তাদের গৃহস্থালীর মোট আসবাবপত্র। ঘুমানোর সময় হলে তারা এ ট্রলিকে কোথাও দাঁড় করিয়ে তার ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। ঐ ফুটপাতেই অনেককে ভিক্ষা চাইতে দেখা যায়। আমের সাহেব একটি পেট্রোল পাম্পে গাড়ী খাড়া করলে একজন শ্বেতাঙ্গ ভিখারী তার নিকট ভিক্ষা চায়। সে সময় তার নিকট ডলারের ছোট নোট ছিল না, তাই তিনি অপারগতা জানালে লোকটি বলল (I take penees), 'আমি পয়সাও নিয়ে থাকি।'

তখন তিনি কয়েকটি কয়েন তাকে দিলেন। সে খুশী হয়ে চলে গেল।

'সচ্ছলতার মধ্যখানে দরিদ্রতা' Proverty in the middest of plenty–এর এই সেই পরিবেশ, যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। এরই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমাজতন্ত্র জন্ম নিয়েছিল। আজ যদি সমাজতন্ত্র নিজস্ব দুর্বলতার কারণে পরাজয় বরণ করে থাকে, তার অর্থ এই নয় যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এ সমস্ত খারাপ দিক শেষ হয়ে গেছে। মূলতঃ তার খারাপ দিকসমূহ আজও পূর্ববৎ রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবদর্শিতার সঙ্গে তা বিলুপ্ত করা না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানবতা এই ডামাডোলের চূড়ান্তে দিকভ্রান্তভাবে ঘুরতে থাকবে।

ফিরতি সফর

পরদিন দুপ্‌র বারোটায় আমার ফেরার প্রোগ্রাম ছিল। আমেরিকার পশ্চিমপ্রান্তে পৌঁছার পর দেশে ফেরার সম্ভাব্য পথ ছিল দু'টি। একটি হল, যে পথে এসেছি ঐ পথ ধরেই আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে ইউরোপ, তারপর সেখান থেকে পাকিস্তান ফিরে আসা। দ্বিতীয় পথ ছিল পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে দূর প্রাচ্যের পথে পাকিস্তান পৌঁছা। কয়েকটি কারণে আমি এই দ্বিতীয় পথটি গ্রহণ করি। এ পথে তুলনামূলক টিকিট সস্তা, তাছাড়া ফেরার পথে জাপান অবস্থানেরও সুযোগ রয়েছে। যেখানে আমি ইতিপূর্বে কখনও যাইনি। সুতরাং ৯ই জুন সোমবার সাড়ে বারোটায় আমি নর্থওয়েষ্ট এয়ার লাইন্সের বিমানে আরোহণ করি। আমার এ পর্যন্তকার অসংখ্য সফরের মধ্যে এটি ছিল

সর্বাধিক দীর্ঘ আকাশ পথের সফর। বিমানকে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে অবিরাম ১১ ঘন্টা উড়ে টোকিও পৌছতে হয়। আমেরিকার এই পশ্চিম তীর থেকে জাপানের পূর্ব উপকূল পর্যন্ত প্রায় ছয় হাজার মাইলের দূরত্ব। এ পথটি সম্পূর্ণই সমুদ্রের উপর দিয়ে। সোমবার দিন দুপুর একটার দিকে বিমান দীর্ঘ এ সফর আরম্ভ করে। যখন টোকিওর নারিতা বিমানবন্দরে বিমানটি অবতরণ করে, তখন ১০ই জুন মঙ্গলবারের বিকাল চারটা বাজতে চলছিল। দিন ও তারিখ পাল্টে গিয়েছে। কিন্তু আমাদের সফরের মাঝে রাত আসেনি। এই সফর যেহেতু অবিরাম পশ্চিম দিকে হচ্ছিল তাই আমরা সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে পথ চলছিলাম। সুতরাং পুরো এ এগারো ঘন্টাই ছিল বিকাল বেলা। লসএঞ্জেলস থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রায় পাঁচ ঘন্টা পর বিমান ইন্টারন্যাশনাল ডেট লাইন (International Date Line) অতিক্রম করে। ফলে তারিখ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এতক্ষণ পর্যন্ত বিমানের মানচিত্রে পশ্চিমের বিষুবরেখা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে দেখা যাচ্ছিল। অবশেষে আশি ডিগ্রী বিষুবরেখায় পৌছার পর পূর্ব দিকের বিষুবরেখা কমতে আরম্ভ করে। আমরা পশ্চিমে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পৌছার পর পূর্বের শেষ প্রান্তের দিকে স্থানান্তরিত হই।

টোকিওতে

আমি বিকাল চারটায় যখন টোকিও বিমানবন্দরে অবতরণ করি, তখন পাকিস্তানী দূতাবাসের থার্ড সেক্রেটারী মিঃ আসগর ছাহেব স্বাগত জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন। বিমানবন্দরের কাজ দ্রুত শেষ করে আমরা শহর অভিমুখে রওয়ানা করি। নারিতা বিমানবন্দর টোকিও শহর থেকে প্রায় আশি মাইল দূরে। টোকিওর শহরতলীতে হাইওয়ে ব্যবস্থা খুব মজবুত, যারফলে দূর–দূরান্তের পথ সহজে অতিক্রম করা যায়। কিন্তু এই হাইওয়ে ব্যবহারের টোলট্যাক্স খুব বেশী। আসগর সাহেব আমাকে বললেন, কারযোগে বিমানবন্দরে আসা–যাওয়ার শুধুমাত্র টোলট্যাক্স আদায় করতে প্রায় দু'শ ডলারের সমপরিমাণ টাকা ব্যয় হয়। টোলট্যাক্স হিসাবে এ অর্থ এত অধিক যে, আমাদের মত পাকিস্তানীদের জ্ঞান

হারানোর জন্য তা যথেষ্ট।

আমি যখন হোটেলে পৌঁছি, তখন মাগরিবের সময় হতে এক ঘন্টারও অধিক সময় বাকী। এখানে পৌঁছে আমি আসর নামায পড়ি। অথচ যোহর নামায আমি আমেরিকায় পড়ে রওয়ানা করেছিলাম। এই বার-তের ঘন্টা সময়ে অন্য কোন নামাযের সময় আসেনি। আমার আজকের দিনটি ৩০ ঘন্টা লম্বা হয়। ফলে পানাহারের সময় ও দিন-রাতের অন্যান্য কাজ এমন গড়বড় হয়ে যায় যে, আমি বুঝতেই পারছিলাম না যে, মানুষ কখন খেল এবং কখন ঘুমাল। আমার হোটেলটি একটি উপসাগরের তীরে অবস্থিত। এখান থেকে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রশান্ত মহাসাগরের নীলাভ তরঙ্গসমূহ ঢেউ খেলতে দেখা যাচ্ছিল। এদিক থেকেই ছয় হাজার মাইল দীর্ঘ আকাশ পথ উড়ে কয়েক ঘন্টা সময়ে এখানে এসে পৌঁছি। আমি ভাবছিলাম, যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত গতি সমগ্র বিশ্বকে কিভাবে সংকুচিত করে দিয়েছে।

পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত টোকিওর একজন ব্যবসায়ী জনাব শায়েখ কায়সার সাহেব এখানকার পাকিস্তানী লোকদের মধ্যে সবার প্রাণপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। সামাজিক ও সেবামূলক বিভিন্ন কাজে তিনি খুব বেশী অংশ নিয়ে থাকেন। রাতে তিনি আমাকে জানান যে, টোকিওতে আমার অবস্থানকালে তিনি তাঁর দু'জন বন্ধুকে আমার পথ-প্রদর্শনের জন্য সকালবেলা আমার নিকট পাঠিয়ে দিবেন। রাতে তিনি এক নৈশভোজের ব্যবস্থা করেন। সেখানে শহরের বিশিষ্ট বিশিষ্ট পাকিস্তানী ব্যক্তিবর্গকেও দাওয়াত করেন। সুতরাং পরদিন সকাল (১১ই জুন) আটটায় ইলিয়াছ জাভেদ সাহেব আমার নিকট চলে আসেন।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে তারা প্রথমে শায়েখ কায়সার সাহেবের অফিসে পৌঁছেন। আমার খুব আনন্দ হল যে, তিনি টোকিওর ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। তিনি এখানে পাকিস্তানের সুনাম বৃদ্ধি করছেন। এখান থেকে শায়েখ সাহেবের অপর একজন বন্ধু মুহাম্মাদ নাঈম সাহেবও আমাদের সাথী হন। আমি টোকিওর বিশেষ বিশেষ স্থান ছাড়া এখানকার ইসলামী সেন্টারেও যেতে চাচ্ছিলাম। ইলিয়াছ জাভেদ সাহেব এবং নাঈম সাহেব শ্রেষ্ঠতম পথপ্রদর্শক ও সফরসঙ্গী প্রমাণিত

হন। তাঁরা সংক্ষিপ্ত সময়ে টোকিওর মত শহরের বহুলাংশ ঘুরে দেখান।

জাপান বিগত চল্লিশ বছরে শিল্প ও বিজ্ঞানের অঙ্গনে যে বিস্ময়কর উন্নতি করেছে, টোকিও সত্যিকার অর্থেই তার জীবন্ত প্রমাণ। আধুনিক নগর ব্যবস্থার অসংখ্য বিস্ময়কর বস্তু সমন্বিত এ শহর ঘনবসতিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিস্তৃতি, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সুউচ্চ ভবনসমূহ, জাঁকজমকপূর্ণ সড়কসমূহ, সুদৃশ্য বাজার ও পদে পদে নির্মিত ফ্লাইওভার-এর দিক থেকে বিশ্বের হাতে গোনা কয়েকটি শহরের মধ্যে গণ্য হয়। বরং এদিক থেকে শহরটি স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী যে, সাধারণতঃ ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় শহরের শুধুমাত্র মধ্যবর্তী এলাকা (Down Town) জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে থাকে। যা সাধারণতঃ চারপাঁচ মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়। কিন্তু টোকিও প্রায় পুরোটাই এই মানের। আধুনিক ধাঁচের আকাশচুম্বী ভবনসমূহও টোকিওতে প্রচুর। কিছুদিন পূর্বে গভর্নমেন্ট সেক্রেটারিয়েট এর ৬৫ তলা ভবন (টুচু বিল্ডিং) এমনভাবে নির্মাণ করা হয় যে, তার তিন অংশ পৃথক তিনটি সড়কের উপর অবস্থিত। কিন্তু মধ্যবর্তী পুলের মাধ্যমে সেগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। জমকালো ও সুবিস্তৃত এ ভবনটিকে—যা সাধারণ একজন মানুষের জন্য স্বপ্ন বৈ নয়—আধুনিক নির্মাণ শিল্পের রাজকর্ম গণ্য করা হয়।

শহরের মধ্যখানের টোকিও টাওয়ারও পর্যটকদের মনোরঞ্জনের বিশেষ কেন্দ্রস্থল। এ টাওয়ারটিকে প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের ধাঁচে নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু আইফেল টাওয়ার ৩২০ মিটার উঁচু ; আর এর উচ্চতা ৩৩৩ মিটার করে একে বিশ্বের সর্ববৃহৎ লোহার টাওয়ারের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আইফেল টাওয়ারের ওজন সাত হাজার টন, আর এর ওজন মাত্র চার হাজার টন। কারণ, এতে লোহার এমন আধুনিক টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে, যা কম ওজন দ্বারা অধিক কাজ নিয়েছে। এছাড়া আইফেল টাওয়ার নিছক একটি বিনোদনমূলক ও প্রতীকি টাওয়ার, কিন্তু টোকিও টাওয়ার দ্বারা তার নির্মাতাগণ বহুবিধ শৈল্পিক টেকনিক্যাল কাজ নিয়েছে। তারা এতে একটি মমি মিউজিয়ামও করেছে, যা লণ্ডনের মাদার তেরেসা মিউজিয়ামের সাথে

সাদৃশ্যপূর্ণ। এ টাওয়ারে ১৬৪টি ফ্লাডলাইট বসানো রয়েছে। যেগুলোর ফলে রাতের বেলা একে একটি মনোরম আলোর মিনাররূপে প্রতিভাত হয়, যা পরিবেশের সৌন্দর্যকে চতুর্গুণে বৃদ্ধি করে।

যদিও ব্যয়বহুলতার দিক থেকে টোকিও সম্ভবতঃ বিশ্বের অধিকতর ব্যয়বহুল শহর, কিন্তু মানুষের আমদানীও সে হারে সর্বাধিক। সাধারণতঃ এখানকার লোকেরা সচ্ছল। এখানকার লোকদের মধ্যে কোমল প্রকৃতি ও সন্ধিপরায়ণতার গুণ উপচে পড়ে। আমাদের যে সমস্ত পাকিস্তানী ভাই বছর বছর ধরে এখানে বাস করছেন, তারা বললেন, এ সম্পূর্ণ সময়ে তারা কখনও কোন দুই ব্যক্তিকে মারামারি করতে বা উঁচু আওয়াজে ঝগড়া করতে দেখেনি। অপরাধের হারও খুব কম। লোকেরা সাধারণতঃ দায়িত্ব সচেতন, পরিশ্রমী ও নিজ নিজ কর্ম সম্পাদনে নিষ্ঠাপরায়ণ। এই পরিশ্রম ও দায়িত্ব সচেতনতারই ফল যে, তারা স্বল্প সময়ে একটি পশ্চাৎপদ দেশকে এত উপরে নিয়ে গিয়েছে যে, আজ এ দেশ আমেরিকার মত শক্তির জন্যও একটি শক্তিশালী বাণিজ্যিক ও শৈল্পিক প্রতিপক্ষ হয়ে আছে।

সড়কসমূহে সাধারণত পুলিশ দেখা যায় না। এতদসত্ত্বেও মানুষ ট্রাফিক ও অন্যান্য আইনসমূহ পুরোপুরি মেনে চলে। জানতে পারলাম যে, পুলিশ সাধারণ পথে দাঁড়িয়ে না থেকে হেড কোয়ার্টার থেকে স্ক্রীনের সাহায্যে বিভিন্ন এলাকার তত্ত্বাবধান করে থাকে। যেখানে প্রয়োজন হয় কয়েক মিনিটের নোটিশে সেখানে পৌঁছে যায়। যদিও পশ্চিমা প্রভাবসমূহ জাপানের উপর দ্রুতগতিতে আক্রমণাত্মক হচ্ছে, তবুও প্রাচ্যের কিছু না কিছু নিদর্শন এখানে এখনও পাওয়া যায়। নগ্নতা ও অশ্লীলতা এত অধিক পরিমাণ নয়, যত অধিক পরিমাণ পশ্চিমা দেশসমূহে দেখা যায়। পারিবারিক ব্যবস্থাও এখনও অনেকটা রক্ষিত আছে। যে সমস্ত পাকিস্তানী বন্ধুর সাথে সাক্ষাত হল, তাদের বেশীর ভাগ জাপানী মহিলাদেরকে মুসলমান বানিয়ে বিবাহ করেছে। তারা সবাই এ কথায় একমত যে জাপানী নারীরা খুবই বিশ্বস্ত, কষ্টসহিষ্ণু ও আত্মত্যাগী।

জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদ সম্ভবতঃ তত অধিক নয়, কিন্তু এখানকার লোকেরা পরিশ্রম, কষ্টসহিষ্ণুতা, স্বদেশ ও স্বজাতির মর্যাদা

দান, দেশপ্রেম, নিষ্ঠা ও সাধুতার মাধ্যমে স্বদেশকে নির্মাণ করেছে।

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (রহঃ) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বলতেন। তিনি বলতেন, বাতিলের মধ্যে আল্লাহ তাআলা উন্নতির যোগ্যতাই রাখেননি। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে—

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই মিথ্যা অপসৃয়মান।

বিধায় কোন বাতিল আকিদার জাতিকে যদি কখনও উন্নতি করতে ও প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়, তাহলে মনে করবে যে, তাকে উন্নতিদানকারী বস্তু তার বাতিল আকিদা বা মতাদর্শ নয়, বরং নিশ্চয় সে কোন সত্যকে অবলম্বন করেছে, যে সত্যের ফলে তার উন্নতি লাভ হয়েছে। তাই যত মিথ্যাশক্তি আজ উন্নতি করছে, তাদের উন্নতির কারণ পরিশ্রম, কষ্ট সহিষ্ণুতা, আমানতদারী, সততা এবং নিজের মিশনের জন্য একনিষ্ঠতা। এগুলো এমন সব গুণ, যা বিভিন্ন জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে উন্নতির পথে প্রতিষ্ঠিত করে।

অন্যান্য দেশে এসব দেখে সত্যিই মন আক্ষেপে ভরে যায়। এগুণগুলো একসময় আমাদের ছিল। আমরা এগুলো পরিত্যাগ করে শুধু নিজেদের ক্ষতিই করিনি, বরং নিজেদের দ্বীন, নিজেদের দেশ ও জাতির ও সমগ্র বিশ্বের বদনাম করেছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে উৎকৃষ্টতম প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধশালী করেছেন। মানবীয় যোগ্যতার দিক থেকেও আমরা আল্লাহর অনুগ্রহে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী, কিন্তু সততা ও সাধুতার অভাব, দূর্নীতি, স্বার্থপরতা ও বিনা পরিশ্রমে আয় করার ঝোঁক আমাদেরকে কোন কাজের যোগ্য রাখেনি। আল্লাহ জানেন, জাতীয়ভাবে আমাদের মধ্যে নিজেদের এ সমস্ত ধ্বংসাত্মক অপরাধের অনুভূতি কবে জন্মাবে?

টোকিওতে একটি ইসলামী সেন্টারও রয়েছে। আমরা যোহর নামায সেখানে আদায় করি। সেন্টার প্রধান জনাব সালেহ সামুরাই একজন ইরাকী মুসলমান। তিনি প্রথমে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে জাপানে

এসেছিলেন। তারপর জাপানে ইসলামের দাওয়াতের কাজ করার উদ্দেশ্যে এখানেই বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি ছাড়া জনাব আবদুর রহমান সিদ্দীকী সাহেবও পাকিস্তানের অধিবাসী। তিনিও এই সেন্টারের সচিবরূপে কর্মসম্পাদন করছেন।

জাপানে ইসলাম

জাপানে ইসলামের ইতিহাস বেশী প্রাচীন নয়। ইসলামী ইতিহাসের প্রথম ও মধ্য যুগে এখানে কোন মুসলমানের আগমন বা কোন দাওয়াতী তৎপরতার উল্লেখ পাওয়া যায় না। জানা ইতিহাস মতে সম্ভবতঃ ইসলামী খেলাফতের সুলতান আবদুল হামিদ সর্বপ্রথম ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে নৌপথে তাঁর নৌজাহাজ 'আর্তগর্ল'-এ এক সৌজন্যমূলক মিশন জাপানে পাঠিয়েছিলেন। বাহ্যত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, এ অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াতের সম্ভাবনা সম্পর্কে সমীক্ষা চালানো। প্রতিনিধি দলটি জাপানে খুব ভাল প্রভাব প্রতিষ্ঠা করেন। মূলতঃ, তাঁরা এ ভূখণ্ডে ইসলাম কবুলের বীজ বপন করে যান। কিন্তু এটি একটি ট্রাজেডী যে, এ প্রতিনিধি দল যখন তুরস্কে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন জাপানেরই সমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড়ের আঘাতে জাহাজটি ডুবে যায়। তার ছয়শ' নয়জন আরোহীর মধ্য থেকে মাত্র ৬৯ জন জীবিত ছিলেন। অবশিষ্ট সবাই শহীদ হয়ে যান। দূর্ঘটনাটি ঘটেছিল রাতের অন্ধকারে। নিকটবর্তী দ্বীপের জাপানী অধিবাসীরা দূর্ঘটনা কবলিত লোকদেরকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে সাহায্য করেন। জাপানের বাদশাহ মেইজি আহতদের চিকিৎসা ও জীবিতদের তুরস্কে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। দুর্ঘটনায় শহীদদের স্মৃতিসৌধ 'আর্তোগার্ল' নামে নির্মাণ করেন। সে সময় থেকে প্রতিবছর এ দুর্ঘটনার স্মৃতি উদযাপনের উদ্দেশ্যে জাপানে একটি অনুষ্ঠান করা হয়।

সৌজন্যমূলক মিশনের অধিকাংশ সদস্য যদিও শহীদ হন, কিন্তু তাঁদের কুরবানী কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। জাপানের লোকদের উপর এ দুর্ঘটনার গভীর প্রভাব পড়ে। চব্বিশ বছর বয়সী এক তরুণ যুবক তুরাজিরুবিমা--যিনি একজন উচ্চ শিক্ষিত সাংবাদিক ছিলেন--এ দুর্ঘটনায় এত বেশী প্রভাবিত হন যে, তিনি দুর্ঘটনা কবলিত শহীদদের

পরিবারের লোকদের সাহায্যের জন্য সারাদেশে চাঁদা সংগ্রহের অভিযান চালান। ৫৪০ জন শহীদের পরিবারের লোকদের সাহায্যের জন্য বিরাট একটি অংক সংগ্রহ করে তিনি তাঁদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাবর দরখাস্ত করে এ অর্থ তুরস্কে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাঁর এ আবেগের মূল্যায়ন করে তাঁকেই সে অর্থ সহকারে তুরস্কে পাঠিয়ে দেয়। তুরাজিরু ইস্তাম্বুল পৌঁছে তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিশাল ও জাঁকজমকপূর্ণ এক অনুষ্ঠানে এ অর্থ তুরস্কের নৌ মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তর করা হয়, যাতে করে মন্ত্রণালয় এ অর্থ দুর্ঘটনা কবলিত লোকদের মধ্যে বন্টন করতে পারে।

এ সময় সুলতান আবদুল হামিদ স্বয়ং তুরাজিরুকে ডেকে নিয়ে দু' বছর তুরস্কে অবস্থান করে এখানকার সেনা অফিসারদেরকে জাপানী ভাষা শেখানোর প্রস্তাব রাখেন। তুরাজিরু তাঁর এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তুর্কি অফিসারদেরকে জাপানী ভাষা শিখানোর সাথে সাথে তিনি নিজেও তুর্কি ভাষা শিক্ষা করেন। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন আরম্ভ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মুসলমান হয়ে তাঁর নামের সঙ্গে 'সিঙ্গিতসু (Shingtsu) শব্দ যোগ করেন। জাপানী ভাষায় এর অর্থ 'চাঁদ'। অন্য কিছু সূত্রে জানা যায় যে, তিনি তাঁর ইসলামী নাম রেখেছিলেন 'আবদুল খলীল'। তুরস্কে অবস্থানকালে তিনি যখন বাড়ীর লোকদের নিকট পত্র লিখতেন, তখন তাঁর ইসলামী নামও সাথে লিখে দিতেন। যদিও জাপানে ইসলামের অনুপ্রবেশের ইতিহাসের উপর অনেক কিছু রিসার্চ করা বাকী রয়েছে, তবে এখন পর্যন্তের জানা তথ্যানুপাতে তুরাজিরু ছিলেন জাপান ভূখণ্ডের প্রথম ব্যক্তি, যিনি ইসলাম কবুল করেন। তিনি ৯১ বছর বয়স পান। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

বলা হয় যে, এই ঘটনার পর অপর এক জাপানী ব্যক্তি ইয়ামাওকা ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ইসলাম কবুল করে নিজের নাম রাখেন 'ওমর ইয়ামাওকা।' তিনি হজ্জ করার সৌভাগ্যও লাভ করেন। প্রায় এ সময়েই অপর এক জাপানী ব্যক্তি বামপাচিরু আরিগা বোম্বে সফর করেন। স্থানীয় মুসলমানদের তাবলীগে প্রভাবিত হয়ে তিনিও ইসলাম কবুল করেন। নিজের নাম রাখেন 'আহমাদ আরিগা'। তাঁরা দু'জন জাপান

ফিরে এসে ইসলামের তাবলীগ আরম্ভ করেন। তারপর আরো অনেক জাপানী লোক মুসলমান হন।

অপর দিকে তুর্কিস্তানে বলসেভিক বিপ্লবের সময় রাশিয়ানদের নির্যাতনে অসহ্য হয়ে উজবেকিস্তান, তাজাকিস্তান, কাজাকিস্তান ও কিরগিজীস্তান থেকে বহু সংখ্যক মুসলমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক জাপানেও পৌঁছে। তারা এখানে এসে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করে। তাদের জাপানে বসবাস গ্রহণ করায় মুসলমানদের সম্মিলিত তৎপরতা আরম্ভ হয়। তাদের প্রচেষ্টার ফলেও বহু জাপানী অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করেন। সাথে সাথে ভারত, চীন ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকেও অনেক মুসলমান জাপানে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। তাদের প্রচেষ্টায় প্রথমবার ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কোবেতে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে টোকিওতে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই মসজিদ প্রতিষ্ঠায় জাপানের প্রভাবশালী কিছু অমুসলিম ব্যক্তিও আর্থিক সহযোগিতা করেন। তারপর ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দেই জাপানের অপর একটি শহর নাগোয়াতে একটি মসজিদ নির্মিত হয়। ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে ওসাকাতেও একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে জাপানকে অনেক মুসলিম দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। যুদ্ধ শেষে শিল্পের উন্নতির জন্য তেল উৎপাদনকারী মুসলিম দেশসমূহের সাথে তার সম্পর্ক আরও স্বাভাবিক হয়। এর ফলে জাপানে মুসলমানদের যাতায়াত বৃদ্ধি পায়। জাপানী অধিবাসীরাও মুসলিম দেশসমূহে আসে। এমনি করে দু' তরফাভাবে জাপানে ইসলামের প্রসার দ্রুত হয়। এ সময় জাপানী মুসলমানগণ কিছু সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করেন। জাপানী ভাষায় পবিত্র কুরআনের কয়েকটি অনুবাদ প্রকাশ পায়। ইসলামী তথ্য সমন্বিত কিতাব তৈরী হয়। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে একটি ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়। যা ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে সেই 'ইসলামিক সেন্টার জাপানের' সঙ্গে সংযুক্ত হয়, যেখানে আমরা এখন অবস্থান করছি।[১]

১. জাপানে ইসলামের অনুপ্রবেশের এই ইতিহাস জাপানী মুসলমান আবু বকর মরিমোটোর লিখিত 'ইসলাম ইন জাপান' গ্রন্থ থেকে গৃহীত। যা টোকিওর ইসলামিক সেন্টার প্রকাশ করেছে।

সেন্টারটি একটি বোর্ড অব ডাইরেক্টর এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। তার সদস্যদের মধ্যে আরবী, পাকিস্তানী, তুর্কী ও খোদ জাপানী মুসলমানগণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। সেন্টারের ব্যয় বেশীর ভাগ সৌদী সরকার, রাবেতায়ে আলমে ইসলামী, উপসাগরীয় রাজ্যসমূহের মধ্য থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার সরকার এবং ও.আই.সি মিলে বহন করে থাকে। সেন্টারের পক্ষ থেকে প্রায় ৪০টি বই জাপানী ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। যার মধ্যে পবিত্র কুরআনের একটি জাপানী তরজমাও অন্তর্ভুক্ত। 'আস্সালাম' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকাও প্রকাশ পায়। শিশুদের প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থাও খুব সীমিত পর্যায়ে সম্প্রতি আরম্ভ করা হয়েছে। সেন্টারের পক্ষ থেকে প্রতিবছর জাপানী হজ্জ ইচ্ছুকদেরকে হজ্জে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। সময় সময় এখানে আলোচনা অনুষ্ঠান ও ভাষণ দানেরও ব্যবস্থা করা হয়। যেগুলোর মাধ্যমে জাপানবাসীকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করা হয়।

এই সেন্টারটি ছাড়া তাবলীগ জামাতও ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ থেকে জাপানে তাদের দাওয়াতী কাজ আরম্ভ করেছে, যা আল্লাহর মেহেরবানীতে খুবই সফল হয়েছে। তাবলীগ জামাতের লোকেরা টোকিওর শহরতলী এলাকা সাইতামার (Saitama) একটি ভবন ক্রয় করে সেখানে একটি মসজিদও প্রতিষ্ঠা করেছে। যা এখন তাবলীগের মারকাযের কাজও করছে। তাদের তৎপরতা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এ সমস্ত তৎপরতার ফল এই হয়েছে যে, ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপানে মুসলমানদের সংখ্যা ৩ হাজার বলা হতো, এখন সরকারী হিসাব মতে সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা ৫০ হাজার। তাছাড়া যে সমস্ত মুসলমান অন্যান্য দেশ থেকে এসে এখানে অধিবাস গ্রহণ করেছেন, তাদের সংখ্যা দু' লাখে পৌঁছেছে। এর অর্থ এই যে, জাপানে সর্বমোট প্রায় আড়াই লাখ মুসলমান রয়েছে। [১]

১. ডঃ সালেহ সামুরাই কৃত 'আল ইসলাম ফিল ইয়াবান' (জাপানে ইসলাম) পৃঃ ২।

জাপানী মুসলমানদের প্রয়োজনসমূহ

যদিও গত কয়েক বছরে জাপানে মুসলমানদের সংখ্যা বেশ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু তাদের ধর্মীয় প্রয়োজনাদি পুরা করার কাজ চলছে তার তুলনায় খুবই মন্থরগতিতে। এখনও এখানে ধর্মীয় তৎপরতার সেই পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি, যা ইউরোপ ও আমেরিকার কতক দেশে আল্লাহর মেহেরবানীতে সৃষ্টি হয়েছে।

যে কোন মুসলিম সমাজের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় প্রয়োজন মসজিদের। মসজিদই সেই কেন্দ্র, যেখানে মুসলমানগণ ধর্মীয় দিকনির্দেশনা লাভ করে থাকে। যেখান থেকে ধর্মীয় চেতনার আলোকরেখা জীবনের অন্যান্য শাখার দিকে বিকীর্ণ হয়। বর্তমানে টোকিও শহরের অবস্থা এই যে, যদিও শহরের মধ্যে মুসলমানগণ নামায পড়ার জন্য বেশ কিছু নামাযের জায়গা বানিয়েছে, কিন্তু এখনও শহরের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক মসজিদ একটিও নেই। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে টোকিওর যেই মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল এবং পূর্বে যার উল্লেখ করা হয়েছে, দীর্ঘদিন পর্যন্ত তা টিকে থাকে। তার মাধ্যমে হাজার হাজার লোকের ঈমান নসীব হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে যখন আশ–পাশের অন্যান্য ভবনসমূহ বোমা বর্ষণে বিধ্বস্ত হয়, তখন মসজিদটি যথাস্থানেই বহাল থাকে। কিন্তু কয়েক বছর পূর্বে ভূমিকম্প ও প্লাবনের কারণে তার পুরান ভবনটি ধসে পড়ে। এখন সে জায়গাটি খালি পড়ে আছে। জাপানে নির্মাণ কাজ এতই ব্যয়বহুল যে, তা নতুন করে নির্মাণ করার জন্য প্রায় ১ কোটি আমেরিকান ডলার ব্যয় হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ইসলামিক সেন্টার তার নকশা তৈরী করিয়েছে। মসজিদ নির্মাণের জন্য তারা ফাণ্ড সংগ্রহের চেষ্টা করছে। এ বছর ডিসেম্বরের মধ্যে নির্মাণ কাজ আরম্ভ করার ইচ্ছা রয়েছে। ইসলামিক সেন্টার সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের নিকট দরখাস্ত করেছে, যেন তারা টোকিওর একমাত্র বড় মসজিদটির নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেন। ইসলামিক সেন্টারের ঠিকানা এই—

Tokyo Mosque
C/o, Islamic Center-Japan
1-16-H Ohari-Setagayaku
Tokyo, Japan-T156
Phone 03-3460-6169, Fax 03-3460-6105

মসজিদের একাউন্ট নম্বর এই—

Islamic Center-Japan, Mosque Fund Account
The Sumitomo Bank Limited, Shinjuku Nishiguchi Branch,
Tokyo, Japan.
Current Account Number 204129

জাপানের মুসলমানদের দ্বিতীয় প্রধান সমস্যা এই যে, এখনও পর্যন্ত জাপানে পবিত্র কুরআন ও ধর্মীয় শিক্ষার জন্য নিয়মতান্ত্রিক কোন মাদরাসা নেই। অন্যান্য দেশ থেকে যে সমস্ত মুসলমান জাপানে এসে বসবাস করছেন, তারা বেশীর ভাগ জাপানী মহিলাদেরকে মুসলমান বানিয়ে তাদেরকে বিবাহ করছেন। কিন্তু এ সমস্ত মহিলাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা ও পরিচর্যাদানের বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই এবং তাদের সন্তানদের শিক্ষা–দীক্ষারও বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই। তাই সেখানকার মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় প্রয়োজন হল, এ জাতীয় মক্তব–মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা যা এই অভাব মোচন করতে পারবে।

তৃতীয় সমস্যা, জাপানী ভাষায় ধর্মীয় বিষয় সম্বলিত গ্রন্থের স্বল্পতা। যদিও ইসলামিক সেন্টার এ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশটি গ্রন্থ জাপানী ভাষায় প্রকাশ করেছে, কিন্তু এই লিটেরেচার আরো অধিক সমৃদ্ধ করার প্রয়োজন রয়েছে।

জাপানী অধিবাসীরা দ্বীন–ধর্মের ব্যাপারে বেশ মুক্ত মনের অধিকারী। তাই তাদের পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত প্রভাবশালী আঙ্গিকে পৌছানোর প্রয়োজন রয়েছে। যদিও কিছু অপরিণামদর্শী মুসলমান সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে পশ্চিমা মিডিয়াকে এ মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা করার সুযোগ করে দিয়েছে যে, 'মুসলমানরা সন্ত্রাসী'। পাশ্চাত্যের মিডিয়ার এ প্রপাগাণ্ডার প্রভাব জাপানের লোকদের উপরেও পড়েছে। এ কারণে ইসলামের দাওয়াতের পথে বেশ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু যদি প্রজ্ঞা ও সততার সাথে জাপানীদের নিকট ইসলামের পয়গাম পৌছানো যায় তাহলে এ ভূখণ্ড এখনও উর্বর প্রমাণিত হতে পারে।

ইসলামিক সেন্টারকে আমার আসার সংবাদ পূর্বেই ফোনযোগে অবহিত করা হয়েছিল। সেন্টারের প্রধান জনাব সালেহ সামুরাই এবং সেক্রেটারী জনাব আবদুর রহমান সিদ্দীকী সাহেব অত্যন্ত ভালবাসা ও

উষ্ণতার সাথে আমাকে অভ্যর্থনা জানান। সেন্টারের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখান। এ পর্যন্তের কার্যকলাপ সবিস্তারে জানান। সমস্যাদি সম্পর্কে অবহিত করেন।

সেন্টারের লোকদের মধ্যে সম্প্রতি একজন দরবেশ প্রকৃতির বুযুর্গ মাওলানা নেয়ামত উল্লাহ খলীল সাহেবের যোগ হয়েছে। তিনি মূলতঃ উজবেকিস্তানের অধিবাসী। রাশিয়ানদের নির্যাতনকালে তিনি হিজরত করে আরবে গিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত পবিত্র মক্কার আন্ নূর মসজিদে ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। বহুবার পাকিস্তানেও এসেছেন। সৌদী আরবেও তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। একবার তাসখন্দেও দেখা হয়েছে। কোন একসময় সালেহ সামুরাই সাহেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। তিনি তাঁকে জাপানে এসে তাবলীগ করার দাওয়াত দেন। তিনি সে দাওয়াত কবুল করেন। এখন তিনি এখানে এসে একমনে একধ্যানে বিস্ময়করভাবে তাবলীগের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। ডঃ সামুরাই সাহেব আমাকে বলেন যে, এই বুযুর্গের আগমনের পূর্বে যখন জাপানের অধিবাসীরা সেন্টারে ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য আসত, তখন আমরা তাকে তার কাঙ্খিত তথ্য জানিয়ে বিদায় করতাম। কিন্তু যখন থেকে মাওলানা নেয়ামতউল্লাহ সাহেব এসেছেন, তিনি সেন্টারে আগমনকারী লোকদেরকে শুধুমাত্র তার প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে চলে যেতে দেন না। তিনি তাদেরকে ইসলাম কবুল করার দাওয়াত দেন। তার দাওয়াত পেয়ে অনেক লোক ইসলাম কবুল করেছে।

এতদ্ব্যতীত তাঁর এক বিরল কর্মপদ্ধতি এই যে, তিনি 'ইসলাম কি?' শিরোনামে জাপানী ভাষায় চার পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা ছেপেছেন। অপরদিকে তিনি জাপানী ভাষার কয়েকটি কথা শিখে নিয়েছেন। তার মধ্য থেকে কয়েকটি কথা এই, 'জাপানের লোক খুব ভাল।' 'আমি তাদেরকে ভালবাসি'। 'আমার পক্ষ থেকে এ উপহারটি গ্রহণ করুন।' যখন তাঁর নতুন কোন জাপানী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হয়, তখন তিনি প্রথমে তার সঙ্গে এ কথাগুলো বলেন। তারপর তিনি ঐ পুস্তিকাটি উপহারস্বরূপ তাকে দেন। তারপর বলেন যে, 'আমি যা বলি আপনিও তা বলুন।' তারপর তিনি তার সামনে কালিমা তায়্যিবা পাঠ করেন। তার

দ্বারাও কয়েকবার তা পড়িয়ে নেন। তারপর তার নাম জিজ্ঞাসা করেন। সে ব্যক্তি তার যে জাপানী নাম বলে, তিনি তার সঙ্গে ইসলামী কোন নাম যেমন, আহমাদ, উমর, আলী ইত্যাদি যোগ করে তাকে বলেন যে, 'আজ থেকে আপনার নাম এই।' তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এখন আপনার নাম কি?' সে তার রাখা নামটি বলে, তখন তিনি বলেন, 'এখন আপনি নিশ্চিন্তে এ পুস্তিকাটি পাঠ করুন।

আমি তাঁর এ পদ্ধতির কথা শুনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে, 'এভাবে কি সে ব্যক্তি ইসলামকে বুঝতে পারে?' ডঃ সালেহ সামুরাই তাঁর পক্ষ থেকে উত্তর দিয়ে বলেন যে, 'প্রথমে আমিও তাঁর এই পদ্ধতিকে ঠাট্টা মনে করতাম। কিন্তু তাঁর নিকট এ ব্যাপারে এক বিস্ময়কর দর্শন রয়েছে। তাঁর সেই দর্শনের বিস্ময়কর ফলাফল আমি নিজে দেখেছি। সে দর্শনটি আপনি তাঁর থেকেই শুনুন।' তখন মাওলানা নেয়ামত উল্লাহ সাহেব বললেন, 'মূলতঃ কালিমা তায়্যিবা একটি নূর। তা না বুঝে পড়া হলেও তার নূর মানুষের উপর কিছু না কিছু প্রভাব ফেলে। লক্ষ্য করুন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উকাযের মেলায় এ দাওয়াতই দিতেন যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল, সফলতা লাভ করবে।' তাই আমি চাই যে, আমার সম্বোধিত ব্যক্তি একবার এ নূরানী কালিমা তার মুখ দিয়ে বলুক। তাহলে এই কালিমার নূর একসময় তার উপর প্রভাব ফেলবে।'

তারপর ডঃ সালেহ সামুরাই বললেন যে, তিনি এখানে আসার পর একদিন টোকিও ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর তার ক্লাসের প্রয়োজনে ইসলাম সম্পর্কে কিছু তথ্য জানার জন্য সেন্টারে আসেন। যখন তিনি চলে যেতে লাগলেন, তখন মাওলানা নেয়ামত উল্লাহ সাহেব তাঁর সেই কর্মপন্থা অনুসারে তাকে বললেন যে, আপনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ুন। তিনি কালিমা পড়লেন। তিনি মাওলানার এ ভঙ্গিতে এতই প্রভাবিত হলেন যে, সে সময়ই তিনি সত্যিকার অর্থেই ইসলাম কবুল করলেন এবং বললেন যে, আমি ইউনিভার্সিটির অন্যান্য প্রফেসরদেরকে একত্রিত করে তাদেরকেও এ নেয়ামতের অংশীদার করবো। সুতরাং কয়েকদিন পর তার ফোন এল যে, আমি আজ অমুক সময় অনেক

প্রফেসরকে একত্রিত করেছি এবং তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে বলেছি। সাথে সাথে তিনি মাওলানা নেয়ামত উল্লাহ সাহেবকে অনুরোধ করেন যে, আপনি এখন ইউনিভার্সিটিতে চলে আসুন। মাওলানার ইউনিভার্সিটির ঠিকানা জানা ছিল না। কিন্তু তিনি ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে করতে সেখানে পৌঁছে যান। সেখানে সত্যিই ইউনিভার্সিটির ১৫/২০জন প্রফেসর সমবেত ছিলেন। মাওলানা নেয়ামত উল্লাহ সাহেব তাঁর সেই 'ব্যবস্থাপত্র' তাদের উপরও ব্যবহার করেন। তারা সবাই মুসলমান হন। এখন মুসলমান হিসাবে সেন্টারের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রয়েছে। ডঃ সালেহ আমাকে ঘটনা শোনাচ্ছিলেন আর আমার কবিতার এ পংক্তিটি স্মরণ হচ্ছিল—

لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف

'লক্ষ পণ্ডিত আত্মগোপন করল, কিন্তু এক বুযুর্গ মস্তক হাতে ময়দানে অবতরণ করল।'

সেন্টার থেকে বিদায় হওয়ার কালে মাওলানা নেয়ামত উল্লাহ সাহেব আমার সঙ্গী হন। তাঁর সঙ্গে তাঁর পুস্তিকার একটি গাট্টিও ছিল। আমি দেখলাম, তাঁর উপর তাবলীগের এক চিন্তা সওয়ার হয়ে আছে। আমরা যেখানে যেখানে গেলাম, তিনি তাঁর সে পুস্তিকা বিতরণের ধারা অব্যাহত রাখলেন। তাঁর বক্তব্য হলো, যাদেরকে এ পুস্তিকা দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে থেকে কিছু লোক হলেও পরবর্তীতে অবশ্যই যোগাযোগ করবে। এভাবে আমি আমার কাজ করার সুযোগ পেয়ে যাবো। আমি ভাবছিলাম এটি অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাআলা জাপানবাসীর হেদায়াতের জন্য মাওলানা নেয়ামতউল্লাহ সাহেবের রূপে একটি 'গায়েবী লতিফা' পাঠিয়েছেন। যাঁর কর্মপদ্ধতির কিছু অংশ আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির ঊর্ধ্বের।

মাগরিবের পর শায়েখ কায়সার সাহেব আমার সঙ্গে মোলাকাত করার জন্য কিছু পাকিস্তানী বন্ধুকে নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। শায়েখ কায়সার সাহেব জাপানে মুসলিম লীগের সভাপতিও। তিনি একটি ভবনে মুসলিম লীগের অফিসও করেছেন। প্রথমে তিনি আমাদেরকে ঐ অফিসে নিয়ে যান এবং বলেন যে, মূলতঃ অফিসটি আমরা এজন্য করেছি যে,

পাকিস্তানী ও অন্যান্য মুসলিম ভাইদের জন্য যোগাযোগের একটি ব্যবস্থা হবে। সুতরাং এখানে সম্মিলিতভাবে বসার ফলে কমিউনিটির বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে মতবিনিময় ও সেগুলো সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা চালানোর একটি সুযোগ হয়। টোকিওর মত শহরে—যেখানে ছোট একটি কক্ষ পেতে হলে লক্ষ টাকার প্রয়োজন পড়ে—সম্মিলিত একটি কাজের জন্য এ ভবনটি দিয়ে দেওয়া নিশ্চয়ই শায়েখ কায়সার সাহেবের প্রশংসনীয় কীর্তি। সেদিনও ঐ অফিসে পাকিস্তানী বন্ধুরা সমবেত হয়েছিলেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সবাইকে পাকিস্তানের জন্য চিন্তাশীল দেখতে পাই। সবার শেষে আমি তাদের সমীপে কিছু নিবেদন পেশ করি। তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল এই যে, যদিও জাপানে শুধুমাত্র পাকিস্তানী লোকের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। অন্যান্য মুসলিম দেশের লোক এর অতিরিক্ত। কিন্তু এ সমস্ত মুসলমান পরিবারের ধর্মীয় শিক্ষা–দীক্ষার এখনও কোন ব্যবস্থা নেই, যার ফল এই যে, এখানে জন্মগ্রহণকারী মুসলিম সন্তানেরা দ্বীনের মৌলিক বিধানাবলী সম্পর্কেও অজ্ঞ। মারাত্মক এ ঘাটতির প্রতিকার অবিলম্বে জরুরী। আমি নিবেদন করলাম যে, ইউরোপ ও আমেরিকায় এখন মুসলমানগণ ধীরে ধীরে এই প্রয়োজনের দিকে মনোযোগী হয়েছেন। যার ফলে শিশুদের শিক্ষা–দীক্ষার কিছু না কিছু ব্যবস্থা সেখানকার প্রায় সর্বত্রই হচ্ছে। কিছু কিছূ শহরে তো অনেক উঁচুমানের ব্যবস্থাও রয়েছে। জাপানেও এ জাতীয় ব্যবস্থাকে নিজেদের সমস্ত যৌথ কাজের উপর প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

উপস্থিত সুধীজনেরা এ প্রয়োজনের ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, আমাদের মনেও এ কাজটির অনেক বেশী গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের মধ্যে একতার যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি। এখন আমাদের ইচ্ছা হল, এই প্লাটফর্ম থেকে মানুষদেরকে একত্রিত করে এ জাতীয় যৌথ সমস্যার সমাধানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করবো। শায়েখ কায়সার সাহেব বললেন, এই অফিস করার পিছনে আমার লক্ষ্য হল, আমরা একত্রিত হয়ে ক্রমে ক্রমে আমাদের সামাজিক সমস্যাদির জন্য কাজ করবো। ইনশাআল্লাহ, এখন আরো অধিক গুরুত্ব সহকারে এদিকে মনোযোগ দিবো।

শায়খ কায়সার সাহেব সেন্টারের সন্নিকটেই একটি পাকিস্তানী রেস্তোরাঁ করেছেন। সেখানে হালাল গোশত এবং পাকিস্তানী ধাঁচের খাবারের ব্যবস্থা আছে। সেখানেই তিনি সবাইকে খাওয়ার জন্য দাওয়াত করেছিলেন। জাপানে বসে পাকিস্তানী ধাঁচের টিকা, কাবাব, তন্দুর রুটি ও দেশী ধাঁচের অন্যান্য খাবার নিশ্চয়ই একটি নেয়ামত ছিল। অনেক রাত পর্যন্ত এ মাহফিল চলতে থাকে। আমি তাঁদের নিষ্ঠা ও ভালবাসার গভীর চিত্র অন্তরে ধারণ করে রাত বারটায় হোটেলে ফিরে আসি।

পরদিন সকালে (১২ই জুন) সাড়ে আটটায় পুনরায় বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। দুপুর ১২টার দিকে থাই এয়ারওয়েজযোগে রওয়ানা করি। ব্যাংকক হয়ে পাকিস্তানী সময় রাত সাড়ে দশটায় করাচী ফিরে আসি। এভাবে পুরো ১২ দিনে পৃথিবী নামক গ্রহের পরিভ্রমণ পূর্ণ হয়। আদি–অন্তের সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য।

সমাপ্ত

Contents

দুনিয়াজোড়া বিস্ময়কর সফর

মূল : শাইখুল ইসলাম মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১-১৪১৭৬৪
০১৭২-৮৯৫৭৮৫

প্রকাশকাল
মুহাররম ১৪২৭ হিজরী
ফেব্রুয়ারী ২০০৬ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ নাজমুল হায়দার
দি লাইট, ঢাকা

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN : 984-8291-38-5

মূল্য ঃ একশত দশ টাকা মাত্র

DUNIAJURA BISHMAIKAR SAFAR
By : Shaikhul Islam Maulana Muhammad Taqi Usmani
Translated by : Maulana Muhammad Jalaluddin
Price Tk. 110.00 US $ 5.00 only

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭২-৮৯৫৭৮৫, ০১৭১-১৪১৭৬৪

The Light
HLY QUALITY DESIGN